অর্থনীতি

১ম পত্র

এইচ এস সি প্রোগ্রাম

কোর্স কোড ঃ HSC 1803

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অর্থনীতি

১ম পত্র

এইচ এস সি প্রোগ্রাম

কোর্স কোড ঃ HSC 1803

ওপেন স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অর্থনীতি

১ম পত্র

এইচ এস সি প্রোগ্রাম

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ কাল

ডিসেম্বর ২০০৩

পুনঃ মুদ্রণ ঃ জুন-২০০৪

পুনঃ মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি-২০০৫

পুনঃ মুদ্রণ ঃ মার্চ-২০০৬

প্রচ্ছদ

কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

ডেস্কটপ প্রসেসিং

মোঃ একরামুল হক ভূঁঞা

মোঃ সিদ্দিকুল ইসলাম

প্রচ্ছদ গ্রফিক্স

আবদুল মালেক

প্রকাশনায়

প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গাজীপুর - ১৭০৫।

Ó ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রণ

মেসার্স মানিক প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স

২৪, লালমনি স্ট্রিট, ওয়ারী, ঢাকা।

ISBN 984-34-3074-3

এ বইটি কিভাবে পড়বেন

এ বইটি দূরশিক্ষণের উপযোগী করে এক বিশেষ পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। এটি 'মড্যুলার পদ্ধতি' নামে পরিচিত। যখন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর সামনে শিক্ষক উপস্থিত থাকেন না, তখন বইটি 'মড্যুলার পদ্ধতি'-তে রচনা করা একটি রীতিসিদ্ধ ব্যাপার। এ পদ্ধতি আমাদের দেশে নতুন হলেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, তা ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট হল, সহজভাবে পাঠ উপস্থাপন।

এ বইটি পাঠ করতে গেলে আপনি দেখবেন, বইটিতে কতিপয় ইউনিট আছে। প্রতিটি ইউনিট আবার কতিপয় পাঠে বিভক্ত। প্রতিটি ইউনিটের শুরুতেই ভূমিকা আছে। ভূমিকা পড়ে আপনি বুঝতে পারবেন ইউনিটটিতে কি বিষয়ে জানতে যাচ্ছেন। এর পর পাঠ বিভাজন। প্রতিটি পাঠের শুরুতে এক বা একাধিক উদ্দেশ্যের উল্লেখ আছে। পাঠ শেষে আপনি কি লিখতে, বলতে বা বর্ণনা করতে পারবেন তা উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। 'মডিউলার পদ্ধতি'-তে এটি একটি অত্যাবশ্যক অংশ। যা আপনাকে মানসিকভাবে (পাঠ জানার জন্য) তৈরি করে তুলবে।

পাঠের শুরুতে বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রতি কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি কতিপয় আইকন (icon) যেমন, , ইত্যাদি। পাঠের শুরুতে বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খোলা বইয়ের প্রত্যেকটি দেখলে আপনি বুঝবেন আপনাকে পড়তে বলা হচ্ছে।

প্রতীক চিহ্নের ডান পাশে মূলপাঠটি দেওয়া আছে। মূলপাঠটি হচ্ছে প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু। কোন ক্ষেত্রে হাতের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। হাতের ছবি দেখলেই আপনি বুঝবেন – এটি একটি নির্দেশ। নির্দেশে যা উল্লেখ রয়েছে তা যত্ন-সহকারে করবেন।

প্রতিটি পাঠ শেষে দেখবেন পাঠোত্তর মূল্যায়ন। এটিও মডিউলার পদ্ধতির অংশ, যা আপনাকে পাঠটির স্বমূল্যায়নের সুযোগ দিবে। পাঠোত্তর মূল্যায়ন যদি সন্তোষজনক হয় তবে বুঝতে হবে পাঠটি আপনার আয়ত্তে এসেছে। প্রতিটি ইউনিটের শেষে চাবি প্রতীক দ্বারা বুঝতে হবে পাঠোত্তর মূল্যায়নের উত্তরমালা। যেখানে পাঠোত্তর মূল্যায়নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে। সেগুলো মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন – আপনার উত্তর কতটুকু সঠিক হয়েছে। যদি অধিকাংশ উত্তর ভুল হয় – তবে পাঠটি পুনরায় পড়ুন ও আয়ত্তে আনার চেষ্টা করুন।

প্রতিটি ইউনিটের সকল পাঠ ও পাঠোত্তর মূল্যায়ন শেষে পাবেন রচনামূলক প্রশ্নমালা। এটিকে চূড়ান্ত মূল্যায়নও বলা হয়। রচনামূলক প্রশ্নমালায় সংক্ষিপ্ত প্রশ্নও আছে। প্রতিটি প্রশ্ন শেষে উত্তরের নির্দেশনা আছে। প্রশ্নগুলো ভাল করে ভেবে দেখবেন – উত্তর কি হওয়া উচিত। আপনার ভাবনার সহিত প্রশ্নের শেষে নির্দেশিত উত্তরের সহিত মিলছে কিনা দেখুন। আপনার ভাবনার সহিত উত্তর না মিললে পুনরায় পাঠগুলো অধ্যয়ন করুন। আশা করব আপনি পাঠে কৃতকার্য হবেন।

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা নং
ইউনিট - ১	**অর্থনীতি পরিচিতি**		১
	পাঠ-১	ব্যাষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতি	১
	পাঠ-২	মৌলিক অর্থনীতি সমস্যা : কি উৎপাদিত হবে? কিভাবে উৎপাদিত হবে? কার জন্য উৎপাদিত হবে?	৪
	পাঠ-৩	অসীম অভাব ও দুস্প্রাপ্য সম্পদ	৬
	পাঠ-৪	দুস্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন	৮
	পাঠ-৫	সুযোগ ব্যয় ও উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা	১০
ইউনিট - ২	**অর্থনৈতিক ব্যবস্থা**		১৪
	পাঠ-১	অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে বিকল্প ব্যবস্থাসমূহ : ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র ও ইসলামী অর্থনীতি	১৪
	পাঠ-২	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	২০
ইউনিট - ৩	**গাণিতিক অর্থনীতির মৌলিক ধারণা**		২১
	পাঠ-১	চলক ও ধ্রুবক	২১
	পাঠ-২	অপেক্ষক	২৩
	পাঠ-৩	লেখচিত্র অংকন	২৫
	পাঠ-৪	ঢাল ও ছেদাংশ	২৬
	পাঠ-৫	বিভিন্ন রেখার সমীকরণ : চাহিদা ও যোগান রেখা	২৮
ইউনিট - ৪	**ভোক্তার আচরণ : উপযোগ**		৩১
	পাঠ-১	উপযোগ : মোট, গড় ও প্রান্তিক উপযোগ	৩১
	পাঠ-২	ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি	৩৫
	পাঠ-৩	ভোক্তার উদ্বৃত্ত	৩৮
	পাঠ-৪	ভোক্তার ভারসাম্য	৪১
	পাঠ-৫	নিরপেক্ষ রেখা বিশ্লেষণ	৪৪
	পাঠ-৬	নিরপেক্ষ রেখা বিশ্লেষণ ও ভোক্তার ভারসাম্য	৪৭
ইউনিট - ৫	**চাহিদা**		৫০
	পাঠ-১	চাহিদা	৫০
	পাঠ-২	চাহিদার নির্ধারকসমূহ	৫২
	পাঠ-৩	চাহিদার সংকোচন প্রসারণ	৫৪
	পাঠ-৪	চাহিদার প্রকারভেদ	৫৭
	পাঠ-৫	চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা	৬১
ইউনিট - ৬	**যোগান**		৬৭
	পাঠ-১	যোগান	৬৭
	পাঠ-২	যোগানের পরিবর্তন ও যোগান রেখার স্থানান্তর	৭০
	পাঠ-৩	যোগানের স্থিতিস্থাপকতা	৭২
	পাঠ-৪	যোগান ও সময়	৭৪
ইউনিট - ৭	**দাম নির্ধারণ**		৭৫
	পাঠ-১	চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ	৭৫
	পাঠ-২	ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের পরিবর্তন	৭৮
	পাঠ-৩	দাম নির্ধারণের গাণিতিক বিশ্লেষণ	৮১
	পাঠ-৭	সরস্বতী	৮৩
ইউনিট - ৮	**উৎপাদন ও উৎপাদনের উপকরণ**		৮৩
	পাঠ-১	উৎপাদন : উপকরণ ও শ্রেণীবিভাগ	৮৩
	পাঠ-২	ভূমির বৈশিষ্ট্য	৮৬
	পাঠ-৩	শ্রম : শ্রমের দক্ষতা ও গতিশীলতা	৮৮
	পাঠ-৪	পুঁজি বা মূলধন : সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা	৯৩
	পাঠ-৫	সংগঠন – একক, অংশীদারী ও যৌথমূলধনী মালিকানা	১০০
	পাঠ-৬	উৎপাদনে অপেক্ষক	১০৯
	পাঠ-৭	একটি পরিবর্তনীয় উপকরণ : ক্রমহ্রাসমান, ক্রমবর্ধমান ও সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি	১১১

ইউনিট - ৯	**উৎপাদন ব্যয়**		১১৭
	পাঠ-১	উৎপাদন ব্যয় –স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন	১১৭
	পাঠ-২	মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়	১২০
	পাঠ-৩	অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ ব্যয় সংকোচ	১২২
ইউনিট - ১০	**বাজার**		১২৫
	পাঠ-১	বাজারের সংজ্ঞা ও প্রকরণ	১২৫
	পাঠ-২	বিক্রয়লব্ধ আয় বা রেভেনিউ	১২৯
	পাঠ-৩	মুনাফা সর্বোচ্চকরণের শর্তাবলী	১৩৩
	পাঠ-৪	পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার	১৩৬
	পাঠ-৫	একচেটিয়া বাজার	১৪০
	পাঠ-৬	একচেটিয়া বাজারে ফার্মের ভারসাম্য	১৪৩
ইউনিট - ১১	**খাজনা**		১৪৫
	পাঠ-১	খাজনার সংজ্ঞা, খাজনা কেন দেওয়া হয়?	১৪৭
	পাঠ-২	মোট খাজনা ও নীট খাজনা	১৫১
	পাঠ-৩	অনুপার্জিত আয়	১৫৩
	পাঠ-৪	নিম খাজনা	১৫৫
	পাঠ-৫	রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব	১৫৮
	পাঠ-৬	খাজনা ও দাম	১৬৩
	পাঠ-৭	খাজনা ও জনসংখ্যার সম্পর্ক	১৬৫
ইউনিট - ১২	**মজুরি**		১৬৭
	পাঠ-১	সংজ্ঞা – আর্থিক ও প্রকৃত মজুরি	১৬৭
	পাঠ-২	প্রকৃত মজুরি কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল	১৬৯
	পাঠ-৩	মজুরির পার্থক্য (একই ও বিভিন্ন পেশায়)	১৭১
	পাঠ-৪	বাংলাদেশের স্বল্প মজুরি হারের কারণ	১৭৫
	পাঠ-৫	শ্রমিক সংঘ-এর সংজ্ঞা ও কার্যাবলী	১৭৭
	পাঠ-৬	বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠন – বর্তমান অবস্থা	১৭৯
ইউনিট - ১৩	**সুদ**		১৮১
	পাঠ-১	সুদের সংজ্ঞা – মোট ও নীট সুদ	১৮১
	পাঠ-২	সুদ কেন দেওয়া হয়?	১৮৫
	পাঠ-৩	সুদের হারের তারতম্যের কারণ	১৮৭
	পাঠ-৪	সুদ কি কখনো শূন্য হতে পারে?	১৯০
ইউনিট - ১৪	**মুনাফা**		১৯৩
	পাঠ-১	মুনাফার সংজ্ঞা – মোট ও নীট মুনাফা	১৯৩
	পাঠ-২	ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক	১৯৭
	পাঠ-৩	স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মুনাফা	১৯৯
ইউনিট - ১৫	**আন্তর্জাতিক বাণিজ্য**		২০১
	পাঠ-১	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব	২০১
	পাঠ-২	অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য	২০৪
	পাঠ-৩	তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব	২০৬
	পাঠ-৪	লেনদেনের ভারসাম্য	২১০
	পাঠ-৫	অবাধ বাণিজ্যের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি	২১৪
	পাঠ-৬	সংরক্ষিত বাণিজ্যের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি	২১৬
ইউনিট - ১৬	**বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক লেনদেন**		২১৯
	পাঠ-১	বাংলাদেশের বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তনে ধারা	২১৯
	পাঠ-২	বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানি	২২২
	পাঠ-৩	বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের বৈশিষ্ট্য : মুলধনী খাত, রিজার্ভ	২২৫
	পাঠ-৪	বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়ন নীতি	২২৭

অর্থনীতি পরিচিতি

ইউনিট ১

ভূমিকা

অর্থনীতির সংজ্ঞা দিয়ে সাধারণত অর্থনীতির আলোচনা শুরু করা হয়, তাই ইউনিটের শুরুতেই অর্থনীতির অনেক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। অর্থনীতির যে সকল প্রশ্ন বিবেচনা করা হয় এবং এই প্রশ্নসমূহের উত্তর পাওয়ার জন্য যে বিশ্লেষণ পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করা হয় এই উভয় দিক বিবেচনায় অর্থনীতি একটি বিশাল বিষয়। তাই অর্থনীতি বলতে কি বুঝায় তা একটি বাক্যে বা অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হবে না। অর্থনীতিতে যে সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হয় সেসবের মূল বৈশিষ্ট্য এবং সমস্যাসমূহের সমাধানের অর্থনৈতিক পদ্ধতি সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

পাঠ ১ : ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতি বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে কি পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

১.১. ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতি

পূর্বে অর্থনীতি একটিই বিষয় ছিল। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দার পর অর্থনীতি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়- ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও সমষ্টিক অর্থনীতি। ব্যষ্টিক অর্থনীতি "ক্ষুদ্র" বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে ভোক্তা ফার্ম এবং বাজারের আচরণ আলোচিত হয়। সমষ্টিক অর্থনীতিতে "বৃহৎ" বা "সমগ্র" সম্পর্কিত অর্থনীতি বিষয় আলোচনা করা হয়। সমগ্র অর্থনীতি সম্পর্কিত আচরণ সমষ্টিক অর্থনীতির বিষয়বস্তু। অর্থনীতি কিভাবে এবং কেন প্রবৃদ্ধি অর্জন করে এবং উঠানামা করে সেসব বিষয়াদি সম্পর্কে সমষ্টিক অর্থনীতিতে আলোচিত হয়। সমষ্টিক অর্থনীতি মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্বের হার, সুদের হার, লেনদেন ভারসাম্য এবং বিনিময় হার সম্পর্কেও আলোচনা করে।

১.১.১ ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য

ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে যে প্রধান পার্থক্যগুলো দেখতে পাওয়া যায় তা নিচে আলোচনা করা হল:

ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি ব্যষ্টি পরিবার ও ব্যষ্টি ফার্মের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে। সমষ্টিক অর্থনীতি অর্থনৈতিক সমষ্টি। যেমন – মোট ভোগ, মোট বিনিয়োগ, মোট উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করে। তবে এ পার্থক্য কিছু শর্ত সাপেক্ষ। প্রথমতঃ, ব্যষ্টিক অর্থনীতিও অনেক ক্ষেত্রে কিছু অর্থনৈতিক সমষ্টি যেমন – চালের মোট চাহিদা, শ্রমের মোট চাহিদা, চিনির

মোট যোগান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। তবে এ দুধরনের সমষ্টির মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক সমষ্টি নিরূপণ করা হয় ব্যষ্টি নির্বাচন থেকে। যেমন– তৃপ্তি সর্বোচ্চায়নকারী ব্যষ্টি ভোক্তার চায়ের চাহিদা সমূহ যোগ করে চায়ের বাজার চাহিদা নিরূপণ করা হয়। কিন্তু সমষ্টিক অর্থনীতিতে ব্যষ্টি নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করা হয় না। দ্বিতীয়তঃ, ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে সমজাতীয় বা সদৃশ দ্রব্যের সমষ্টি আলোচনা করা হয়। যেমন– চা-এর বাজার চাহিদা আলোচনা করা হয় কিন্তু চায়ের ও তরমুজের চাহিদা যোগ করা হয় না। কিন্তু সমষ্টিক অর্থনীতিতে বিভিন্ন প্রকার পণ্যের সমষ্টি বিবেচনা করা হয়। যেমন, মোট জাতীয় উৎপাদন বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য ও সেবাকার্যের আর্থিক মূল্যের সমষ্টি।

খ. ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে আপেক্ষিক দাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমষ্টিক অর্থনীতিতে আপেক্ষিক দাম গৌণ ভূমিকা পালন করে। ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে চা ও কফি বা দেশী বস্ত্র বা আমদানিকৃত বস্ত্রের আপেক্ষিক দামের পরিবর্তনের প্রতি ভোক্তা ও উৎপাদকের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা হয়। সমষ্টিক অর্থনীতিতে মূল্যস্তর, সুদের হার, বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আপেক্ষিক দাম বিবেচিত হলেও তা হয় কোন বড় দ্রব্য গুচ্ছের আপেক্ষিক যেমন, উৎপাদক ও ভোক্তার আপেক্ষিক দাম।

গ. সমষ্টিক অর্থনীতিতে জাতীয় আয়, মূল্যস্তর, সুদের হার ইত্যাদি চলকের নির্ধারণ প্রক্রিয়া আলোচনা করা হয়। কিন্তু ব্যষ্টিক অর্থনীতির আলোচনায় এসব চলক প্রদত্ত ধরে নেয়া হয়।

কোন কোন অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, সমষ্টিক অর্থনীতিতে সাধারণ মূল্যস্তর, মোট জাতীয় উৎপাদন, সুদের হার, বিনিয়োগ সম্পর্কে আলোচনা ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে অর্থাৎ ব্যষ্টি সিদ্ধান্তগ্রহণকারী এককের অর্থনৈতিক নির্বাচন থেকে হওয়া উচিত। সমষ্টিক অর্থনীতি বিশ্লেষণের এই দৃষ্টিভঙ্গী “সমষ্টিক অর্থনীতির ব্যষ্টিক ভিত্তি” হিসেবে পরিচিত।

সারসংক্ষেপ

ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি “ক্ষুদ্র” বিষয় এবং সমষ্টিক অর্থনীতি “বৃহৎ” বা “সমগ্র” সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করে।

খ. ব্যষ্টিক অর্থনীতি ব্যষ্টি ভোক্তার এবং উৎপাদকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ আলোচনা করে এবং সমজাতীয় পণ্যের আলোচনায় জোর দেয়। সমষ্টিক অর্থনীতি সমষ্টিক অর্থনীতিক চলকের নির্ধারণ আলোচনা করে- ব্যষ্টি ভোক্তা ও ফার্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণ আলোচনা করে না।

অনুশীলনী ১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. অর্থনীতি ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক এই দুটি শাখায় বিভক্ত হয়
   ক. এ্যাডাম স্মীথের সময়ে
   খ. ১৯৩০-এর দশকের পূর্বে
   গ. ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দার পরে
   ঘ. ১৯৯০-এর দশকে

২. ব্যষ্টিক অর্থনীতি আলোচনা করে
   ক. ব্যষ্টিভোক্তা ও ফার্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

খ. ব্যষ্টিভোক্তার নির্বাচন ও বিনিয়োগ
গ. মোট ভোগ ও মোট উৎপাদন
ঘ. উপরের কোনটাই নয়

৩. সমষ্টিক অর্থনীতিতে আলোচনা করা হয়
ক. সমজাতীয় বা সদৃশ পণ্যের সমষ্টি
খ. বিভিন্ন প্রকার পণ্যের সমষ্টি
গ. সমজাতীয় এবং বিভিন্ন প্রকার পণ্যের সমষ্টি
ঘ. উপরের কোনটাই নয়

৪. ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে কোন দাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?
ক. পরম বা অনপেক্ষ দাম
খ. আপেক্ষিক দাম
গ. অনপেক্ষ ও আপেক্ষিক দাম
ঘ. ব্যষ্টি দাম

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতি বলতে কি বুঝায়?

খ) ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য কি?

পাঠ ২ : মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা : কি উৎপাদিত হবে? কিভাবে উৎপাদিত হবে? কার জন্য উৎপাদিত হবে?

মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

যে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তিনটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হয়। এই সমস্যাগুলো হচ্ছে: কি উৎপাদিত হবে? কিভাবে উৎপাদিত হবে? এবং কার জন্য উৎপাদিত হবে? এই সমস্যাগুলো সমাধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এজন্য যে সমাজে প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের পরিমাণ সীমিত। সুতরাং সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের বস্তুগত অভাবের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি সাধনের জন্য এই সমস্যাগুলো সমাধান করা দরকার।

২.১ কি উৎপাদিত হবে?

অর্থনীতিতে সম্পদের পরিমাণ সীমিত বলে সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। তাই সিদ্ধান্ত নিতে হয় অর্থনীতিতে কোন কোন দ্রব্য উৎপাদিত হবে এবং কোন কোন দ্রব্য উৎপাদিত হবে না। কোন কোন দ্রব্য উৎপাদিত হবে এই সিদ্ধান্ত নেয়ার পর সিদ্ধান্ত নিতে হয় এই দ্রব্যগুলোর কোনটি কি পরিমাণে উৎপাদিত হবে। অর্থনীতিতে সিদ্ধান্তগুলো সাধারণতঃ "সবখানি অথবা একটিও নয়"- এই প্রকৃতির হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোন দ্রব্য একটু বেশি উৎপাদন করলে অপর একটি দ্রব্য একটু কম পরিমাণে উৎপাদন করতে হয়। যে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে অর্থনীতির সকল ব্যক্তির অভাবে সর্বোত্তমভাবে পূরণের জন্য কি কি দ্রব্য ও কি পরিমাণে উৎপাদিত হবে তা স্থির করা। এই প্রসঙ্গে আরো একটি সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে সময় অনুযায়ী উৎপাদন সমাহার নির্ধারণ। যেমন, বর্তমানকালে চাল ও দুধ উৎপাদন করা যেতে পারে অথবা বর্তমানকালে চাল ও আখ এবং ভবিষ্যৎ কালে চাল ও চিনি উৎপাদন করা যেতে পারে।

২.২ কিভাবে উৎপাদিত হবে?

অর্থনীতিতে মোট যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হবে তা বিভিন্নভাবে উৎপাদন করা যায়। অর্থনীতিতে প্রাপ্তব্য সম্পদ ব্যবহার করে পূর্ণ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তাই সিদ্ধান্ত নিতে হয় কি ভাবে দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদিত হবে। অর্থাৎ কার দ্বারা, কোন সম্পদ ব্যবহার করে এবং কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে উৎপাদিত হবে? অর্থনীতিতে কে চালের যোগান দেবে এবং কে বিমান চালক হবে? বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে কোন সম্পদ ব্যবহার করে- তেল এবং কয়লা অথবা পানি এবং পরমানু অথবা সূর্যকিরণ নাকি বায়ু ব্যবহার করে? চাল উৎপাদন করা হবে স্বল্প মূলধন ও প্রচুর শ্রম অর্থাৎ শ্রম নিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাকি প্রচুর মূলধন ও স্বল্প সংখ্যক শ্রম অর্থাৎ মূলধন নিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহার করে? অর্থনীতিতে মোট উৎপাদনের পরিমাণ শুধু প্রপ্তব্য সম্পদের উপর নির্ভর করে না, সম্পদ কিভাবে মিশ্রিত করা হয় তার উপরও নির্ভর করে।

২.৩ কার জন্য উৎপাদিত হবে?

এটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তৃতীয় মৌলিক সমস্যা। অর্থনীতির মোট উৎপাদন অর্থনীতির সকল সদস্যের মধ্যে বন্টিত হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নির্ধারণ করতে হয় কিভাবে মোট উৎপাদন-এর সদস্যদের মধ্যে অর্থাৎ বিভিন্ন পরিবার বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও সরকারের মধ্যে বন্টিত হবে। প্রত্যেক পরিবার কি উৎপাদের সমান অংশ পাবে? প্রত্যেক সদস্যের অংশ কি উৎপাদনে তার অবদানের দ্বারা নির্ধারিত হবে? প্রত্যেক সদস্যের অংশ কি তার দাম প্রদানের ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত হবে? না কি ঐতিহ্য এবং প্রথা দ্বারা নির্ধারিত হবে? জাতীয় আয়ের কত অংশ সরকার ব্যবহার করবে? স্পষ্টতঃ এসব প্রশ্নের উত্তর শুধু অর্থনীতি নয় বরং রাজনীতি ও নীতিবিদ্যার সঙ্গে জড়িত।

সারসংক্ষেপ

ক. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা তিনটি: (১) কি উৎপাদিত হবে? (২) কি ভাবে উৎপাদিত হবে? এবং (৩) কার জন্য উৎপাদিত হবে?

খ. প্রথম মৌলিক সমস্যা হচ্ছে কোন কোন দ্রব্য ও সেবাকার্য কি পরিমাণে এবং কোন সময়ে উৎপাদিত হবে। দ্বিতীয় মৌলিক সমস্যা হচ্ছে দ্রব্য ও সেবাকার্য কার দ্বারা, কোন সম্পদ ব্যবহার করে এবং কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত হবে। তৃতীয় মৌলিক সমস্যা হচ্ছে অর্থনীতির সদস্যদের মধ্যে মোট উৎপাদন কিভাবে বন্টিত হবে।

অনুশীলনী ১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কয়টি?

ক. দুটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

২. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয় কারণ-

ক. সমাজে প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের পরিমাণ বেশি
খ. সমাজে প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের পরিমাণ সীমিত
গ. সমাজে প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদ সঠিক পরিমাণ আছে
ঘ. সমাজে প্রচুর অব্যবহৃত সম্পদ আছে

৩. অর্থনীতির মোট উৎপাদ বন্টিত হবে কাদের মধ্যে?

ক. সকল সদস্যের মধ্যে
খ. কিছু সদস্যের মধ্যে
গ. শুধু ধনীদের মধ্যে
ঘ. শুধু সরকার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা ক'টি ও কি কি?

খ) অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর?

পাঠ ৩ : অসীম অভাব ও দুষ্প্রাপ্য সম্পদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- অসীম অভাব বলতে কি বুঝায় বলতে পারবেন।
- দুষ্প্রাপ্য সম্পদ বলতে কি বুঝায় বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১ অসীম অভাব

সমাজে বস্তুগত অভাব অসীম। বস্তুগত অভাব বলতে মানুষকে আনন্দ বা তৃপ্তি দেয় এরূপ দ্রব্য ও সেবাকার্য পাওয়া ও ব্যবহারের আকাঙ্ক্ষাকে বুঝায়। মানুষকে আনন্দ বা তৃপ্তি দেয় এরূপ দ্রব্য ও সেবাকার্যের তালিকা অতি দীর্ঘ। যেমন- খাদ্য, বাসস্থান, কাপড়, গাড়ী, জুতা, টিভি, চুল কাটা, সিনেমা, এখন কিডনীর পাথর অপসারণের জন্য অস্ত্রোপচার, দেশরক্ষা ইত্যাদি। বস্তুগত অভাব অসীম। অর্থাৎ দ্রব্য ও সেবাকার্যের বস্তুগত অভাব সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা সম্ভব নয়। মানুষের কিছু অভাব পূরণ হলে আবার নতুন দ্রব্য ও সেবাকার্যের অভাব দেখা দেয়। একজন বিশেষ ব্যক্তির সবকিছু থাকা সম্ভব তবে মানুষের পুরাতন অভাব পূরণের সাথে সাথে নুতন অভাব সৃষ্টির ক্ষমতা অসাধারণ। এছাড়া সময়ের সাথে নতুন দ্রব্য প্রবর্তিত হওয়ার ফলে অভাবের পরিবর্তন হয় ও অভাব বৃদ্ধি পায়। যেমন- কিছুদিন পূর্বে স্যাটেলাইট টিভি ও স্যালুলার টেলিফোন অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এ সবের ব্যবহারের প্রসার ঘটছে।

৩.২ দুষ্প্রাপ্য সম্পদ

অর্থনৈতিক সম্পদ সীমিত বা দুষ্প্রাপ্য। অর্থনৈতিক সম্পদ বলতে দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক, মানব ও মানুষ নির্মিত সম্পদকে বুঝায়। যেমন- ভূমি ও খনিজ সম্পদ নানা শ্রেণীর শ্রম, যন্ত্রপাতি, দালান কোঠা ইত্যাদি। এসব সম্পদ সীমিত বা দুষ্প্রাপ্য। কোন কোন অর্থনীতিতে কোন কোন সম্পদ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যেমন- আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভূমি, সৌদি আরবে তেল ইত্যাদি। কিন্তু এসকল সম্পদ অসীম নয়, মোট প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। দুষ্প্রাপ্য সম্পদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি ব্যবহার বা উৎপাদনের জন্য মূল্যবান সম্পদ যেমন- শ্রম, যন্ত্রপাতি, জ্বালানী ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। ফলে এই সম্পদ পাওয়ার জন্য অন্য কোন সম্পদ ত্যাগ করতে হয়। তাছাড়া এ সম্পদ অসীম পরিমাণে প্রাপ্তব্য নয়।

দুষ্প্রাপ্য সম্পদ ব্যবহার করে মানুষের বস্তুগত অভাব পূরণের জন্য দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদন করা হয়। মানুষের অভাব অসীম। সম্পদের পরিমাণ প্রচুর হলেও অসীম অভাবের তুলনায় তা সীমিত বা দুষ্প্রাপ্য।

সারসংক্ষেপ

ক. সমাজে বস্তুগত অভাব অসীম। অর্থাৎ সমাজে দ্রব্য ও সেবাকার্যের অভাব সম্পুর্ণভাবে পূরণ করা সম্ভব নয়।

খ. অর্থনৈতিক সম্পদ সীমিত বা দুষ্প্রাপ্য। মানুষ যে সব দ্রব্য ও সেবাকার্য ভোগ করতে চায় তা উৎপাদন করার মত পর্যাপ্ত সম্পদ প্রাপ্তব্য নয়।

অনুশীলনী ১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. বস্তুগত অভাব?
   ক. সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা যায়
   খ. সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা যায় না
   গ. সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা যায় যদি সম্পদ উত্তমরূপে ব্যবহার করা যায়
   ঘ. সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা যায় না কারণ মানুষের আয় সমান নয়।

২. বস্তুগত অভাব বলতে কি বুঝায়?
   ক. মানুষকে পীড়া দেয় এরূপ দ্রব্য ও সেবাকার্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা
   খ. মানুষকে পীড়া দেয় কিন্তু অন্য ব্যক্তিকে আনন্দ দেয় এরূপ দ্রব্য ও সেবাকার্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা
   গ. মানুষকে তৃপ্তি দেয় এরূপ দ্রব্য ও সেবাকার্য পাওয়া ও ব্যবহারের আকাঙ্ক্ষা
   ঘ. উপরের সব কটি

৩. অর্থনৈতির সম্পদ দুষ্প্রাপ্য কেন?
   ক. মোট প্রয়োজনের তুলনায় এর যোগান সীমিত
   খ. এর উৎপাদনে মূল্যবান সম্পদ ব্যবহৃত হয়
   গ. এর উৎপাদনের জন্য অন্য সম্পদ ত্যাগ করতে হয়
   ঘ. উপরের সব কটি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) বস্তুগত অভাব অসীম বলতে কি বুঝায়?

খ) অর্থনৈতিক সম্পদ দুষ্প্রাপ্য বলতে কি বুঝায়?

পাঠ-৪ : দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- দুষ্প্রাপ্যতা বলতে কি বুঝায় বলতে পারবেন ।
- অর্থনীতিতে নির্বাচন কেন প্রয়োজনীয় বলতে পারবেন ।

৪.১ দুষ্প্রাপ্যতা

অর্থনৈতিক সম্পদ দুষ্প্রাপ্য অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় সম্পদের যোগান সীমিত। সম্পদের পরিমাণ অসীম হলে কোন অর্থনৈতিক সমস্যা থাকত না। ফলে কি, কিভাবে এবং কার জন্য উৎপাদিত হবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থাকত না। মানুষ যে দ্রব্য ও সেবাকার্য চাইত তাই অসীম পরিমাণে পেত অর্থাৎ তাদের বস্তুগত অভাব সম্পূর্ণভাবে পূরণ হয়। সুতরাং কি উৎপাদিত হবে এ সমস্যা দেখা দিত না। যেহেতু সকল সম্পদ অসীম পরিমাণে পাওয়া যায় সেজন্য কোন দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদনে সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়িতার দরকার হত না। অর্থাৎ কিভাবে উৎপাদিত হবে এ সমস্যা দেখা দিত না। পরিশেষে যেহেতু প্রত্যেকে যা খুশী এবং যত পরিমাণে খুশী তাই পেত সেজন্য দ্রব্য ও আয় কিভাবে বন্টিত হয় তার কোন গুরুত্ব থাকত না।

এরূপ অবস্থায় কোন অর্থনৈতিক দ্রব্য থাকত না অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় যোগান সীমিত বা দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য থাকত না। এ অবস্থায় অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজন হত না বা সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়িতার প্রয়োজন হত না। সকল দ্রব্য অবাধলভ্য দ্রব্য হত – বায়ু বা দক্ষিণ মেরুতে বরফ বা মরুভূমিতে বালুর মত।

কিন্তু সকল দ্রব্য অবাধলভ্য নয়। কারণ দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত ভূমি, কারখানা, যন্ত্রপাতি, শ্রম ও অন্যান্য সম্পদের যোগান অসীম নয়। এটা ঠিক যে সময়ের সাথে অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সেসংগে মানুষের বস্তুগত অভাবও বৃদ্ধি পায়। ফলে চাহিদার তুলনায় সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা সকল অর্থনীতিতে সব সময় বিদ্যমান থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত ধনী দেশ অথবা নেপাল, বাংলাদেশ ইত্যাদির মত দরিদ্র দেশ উভয় ক্ষেত্রে এটি সত্য।

৪.২ নির্বাচন

আমরা যে সব দ্রব্য ও সেবাকার্য চাই তার সবকিছু পেতে পারি না। আমাদের অভাব পূরণের জন্য প্রাপ্তব্য সম্পদ সীমিত। কিন্তু আমাদের বস্তুগত অভাব অসীম। এ অবস্থায় নির্বাচনের প্রশ্ন দেখা দেয়। মনে করি অর্থনীতিতে দুটি দ্রব্য ক ও খ উৎপাদিত হয়। সম্পদের পরিমাণ সীমিত বলে এ দুটি দ্রব্য অসীম পরিমাণে উৎপাদন করা যায় না। ফলে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কোন দ্রব্য কি পরিমানে উৎপাদন করা হবে। একটি দ্রব্য বেশি উৎপাদন করলে অপর দ্রব্যটির উৎপাদন কমাতে হয়। কেননা সম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য ক এর উৎপাদন বাড়াতে হলে খ এর উৎপাদন কমিয়েই বাড়তি সম্পদের ব্যবস্থা করতে হয়।

সারসংক্ষেপ

ক. দুষ্প্রাপ্যতা সকল অর্থনীতির জন্য একটি মৌলিক সমস্যা। মানুষ যে সকল দ্রব্য ও সেবাকার্য ভোগ করতে চায় তা উৎপাদনের জন্য পর্যপ্ত পরিমাণে সম্পদ প্রাপ্তব্য নয়।

খ. দুষ্প্রাপ্যতর জন্য নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রত্যেক সমাজে নির্ধারণ করতে হয় কোন দ্রব্য ও সেবাকার্য কি পরিমাণে উৎপাদন করা হবে। একটি দ্রব্য বেশি উৎপাদন করলে অন্য কোন দ্রব্যের উৎপাদন কমাতে হয়।

অনুশীলনী ১.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. অর্থনৈতিক সম্পদ –
   ক. দুষ্প্রাপ্য
   খ. দুষ্প্রাপ্য নয়
   গ. অসীম
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়

২. নির্বাচন প্রয়োজন হয়, কারণ –
   ক. প্রাপ্তব্য সম্পদ অসীম
   খ. প্রাপ্তব্য সম্পদ সীমিত
   গ. প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ পাওয়া যায়
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) দুষ্প্রাপ্যতা বলতে কি বুঝায়?

খ) অর্থনীতিতে নির্বাচন কেন প্রয়োজনীয় তা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৫ : সুযোগ ব্যয় ও উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- সুযোগ ব্যয় বলতে কি বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কি তা বলতে পারবেন।

সুযোগ ব্যয়

দুষ্প্রাপ্যতার জন্য মানুষকে নির্বাচন বা পছন্দ করতে হবে। নির্বাচনের সঙ্গে ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত থাকে। কারণ সীমিত সম্পদের সাহায্যে কোন একটি দ্রব্য বেশি পরিমাণে উৎপাদন করা হলে অপর কোন দ্রব্যের উৎপাদন কমাতে হয়। অর্থাৎ একটি দ্রব্য বেশি উৎপাদনের জন্য অপর একটি দ্রব্যের উৎপাদন কিছুটা ত্যাগ করতে হয়। একটি দ্রব্য এক একক বেশি উৎপাদনের জন্য অপর দ্রব্যটির যে পরিমাণ ত্যাগ করতে হয় তাই প্রথম দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয়। মনে করি দুটি দ্রব্য 'ক' এবং 'খ' এবং ক দ্রব্যটির এক একক বেশি উৎপাদন করার জন্য যে পরিমাণ সম্পদ প্রয়োজন হয় তাতে খ দ্রব্যের দুই একক উৎপাদন হ্রাস করতে হয়। এখানে ক-এর সুযোগ ব্যয় দুই একক খ।

উৎপাদন সম্ভাব্য রেখা

দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচনের সমস্যা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। একটি অর্থনীতি প্রাপ্তব্য ভূমি শ্রম, মূলধন ও কারিগরীজ্ঞান ব্যবহার করে কি পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদন করতে পারে এই রেখার সাহায্যে তা দেখানো হয়। অর্থনীতি সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে দ্রব্য ও সেবাকার্যের বিভিন্ন সমাহার উৎপাদন করতে পারে। অর্থনীতি বেশি চাল কম পাট, বেশি সেচযন্ত্র কম সাইকেল, বেশি ট্রাক কম ট্রেন ইত্যাদি উৎপাদন করতে পারে। আলোচনার সুবিধার্থে মনে করি অর্থনীতিতে দুটি দ্রব্য যথা, পাট ও আখ উৎপাদিত হয়। অর্থনীতি উৎপাদনের জন্য এ দুটি দ্রব্যের কোন একটি সমাহার নির্বাচন করে। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অর্থনীতির সকল সম্পদ পূর্ণভাবে ব্যবহার করে পাট ও আখের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উৎপাদনের বিভিন্ন সমাহার দেখায়। অন্যভাবে বলা যায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট উৎপাদন করে সর্ব্বোচ্চ যে পরিমাণ আখ উৎপাদন করা যায় উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা তা দেখায়।

মনে করি, বিদ্যমান সকল সম্পদ ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে সর্ব্বোচ্চ ৬ মিলিয়ন বেল পাট উৎপাদন করা যায়। আবার বিদ্যমান সকল সম্পদ আখ উৎপাদনে ব্যবহার করে সর্ব্বোচ্চ ৬০ মিলিয়ন টন আখ উৎপাদন করা যায়। এ দুটি হচ্ছে চূড়ান্ত সম্ভাবনা। এর মাঝামাঝি আরো অনেক সম্ভাবনা আছে। আমরা যদি পাটের উৎপাদন বাড়িয়ে দিই তাহলে আখের উৎপাদন কিছু পরিমাণে কমাতে হয়। যদি পাটের উৎপাদন আরো বাড়ানো হয় তাহলে আখের উৎপাদন আরো কিছু কমাতে হয়। সারণী ১১-এ এরূপ কিছু উৎপাদন সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে।

সারণী ১.১ (উৎপাদন সম্ভাবনা)

পাট (মিলিয়ন বেল)	আখ (মিলিয়ন টন)	১ মিলিয়ন বেল পাটের সুযোগ ব্যয়
০	৬০	২
১	৫৮	৩
২	৫৫	৫
৩	৫০	১৮
৪	৪২	১২
৫	৩০	৩০
৬	০	

পাটের উৎপাদন ৩ মিলিয়ন বেল থেকে ৪ মিলিয়ন বেল-এ বাড়ানো হলে আখের উৎপাদন ৫০ মিলিয়ন টন থেকে ৪২ মিলিয়ন টনে কমাতে হয়। এখানে ১ মিলিয়ন বেল পাটের সুযোগ ব্যয় ৮ মিলিয়ন টন আখ। অর্থনীতি বিদ্যমান সকল সম্পদ ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৪ মিলিয়ন বেল পাট ও ৪২ মিলিয়ন টন আখ উৎপাদন করতে পারে। এ ভাবে অর্থনীতি ৫ মিলিয়ন বেল পাট ও ৩০ মিলিয়ন টন আখ উৎপাদন করতে পারে।

সারণী ১১ এর তথ্যের ভিত্তিতে চিত্র ১.১ আঁকা হয়েছে। চিত্রে

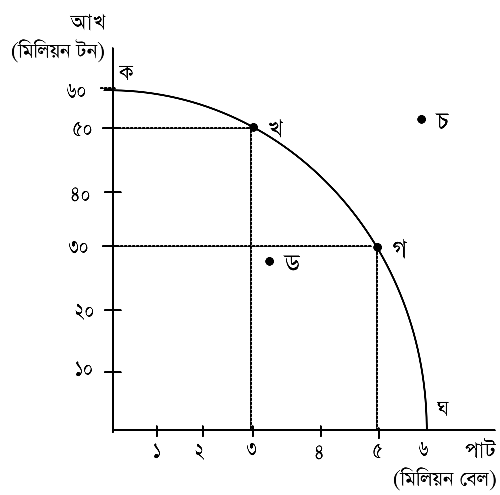

চিত্র ১.১ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

ভূমি অক্ষে পাট ও উল্লম্ব অক্ষে আখ এর উৎপাদন দেখানো হয়েছে। কঘ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বিভিন্ন বিন্দু পাট ও আখ-এর সর্ব্বোচ্চ উৎপাদনের বিভিন্ন সমাহার দেখায়। যেমন- ক বিন্দু ০ (শূন্য) মিলিয়ন বেল পাট ও ৬০ মিলিয়ন টন আখ, খ বিন্দুতে ৩ মিলিয়ন বেল পাট ও ৫০ মিলিয়ন টন আখ, গ বিন্দুতে ৫ মিলিয়ন বেল পাট ও ৩০ মিলিয়ন টন আখ এবং ঘ বিন্দুতে ৬ মিলিয়ন বেল পাট ও ০ মিলিয়ন টন আখ এর উৎপাদন দেখায়। এভাবে অন্যান্য বিন্দু ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন সমাহার দেখায়।

দক্ষ উৎপাদন

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দক্ষ উৎপাদন দেখায়। দক্ষ উৎপাদন বলতে সম্পদের অপচয়হীন উৎপাদন বুঝায়। উৎপাদন দক্ষতা ঘটে যখন অন্য কোন দ্রব্যের উৎপাদন না কমিয়ে কোন দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো যায় না। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার খ বিন্দুতে যে উৎপাদন সমাহার নির্দেশ করে তা থেকে বেশি পরিমাণ আখ উৎপাদন করতে চাইলে পাটের উৎপাদন কমাতে হয়। অনুরূপভাবে বেশি পরিমাণ পাট উৎপাদন করতে চাইলে আখের উৎপাদন কমাতে হয়।

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা উৎপাদন সমাহারগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করে সীমিত সম্পদ দ্বারা যে সমাহার গুলো উৎপাদন করা সম্ভব নয় এবং যে সমাহারগুলো উৎপাদন করা সম্ভব। ক ঘ রেখার ডানদিকের সমাহারগুলো উৎপাদন করা সম্ভব নয় কারণ এগুলো উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ নেই। ক ঘ রেখার বামদিকের সমাহারগুলোতে সম্পদ পূর্ণভাবে ব্যবহার না করে উৎপাদন করা সম্ভব। শুধু ক ঘ রেখার উপরস্থ সমাহারগুলো প্রাপ্তব্য সম্পদ পূর্ণভাবে ব্যবহার করে উৎপাদন করা সম্ভব। চিত্র ১-এ চ বিন্দু অর্জন বহির্ভুক্ত বিন্দু এবং ড বিন্দু অদক্ষ বিন্দু নির্দেশ করে। কোন অর্থনীতি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অভ্যন্তরে অবস্থান করলে বুঝতে হবে যে অর্থনীতিতে সম্পদ সম্পূর্নভাবে ব্যবহৃত হয়নি বা সম্পদের অপচয় ঘটছে। এরূপ অবস্থায় পাট ও আখ উভয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব বা পাটের (আখের) উৎপাদন বাড়ালে আখের (পাটের) উৎপাদন কমাতে হয় না। একটি অর্থনীতি নানা কারণে ড বিন্দুতে উৎপাদন করতে পারে। যেমন বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, একচেটিয়া কারবার, আমলাতন্ত্র কর্তৃক অদক্ষ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। এই রেখাটি ডানদিকে নিম্নগামী কারণ কোন দ্রব্যের বেশি পরিমাণ পেতে হলে অপর দ্রব্যটির কিছু পরিমাণে ত্যাগ করতে হয়। নিম্নগামী ঢাল সুযোগ ব্যয় দেখায়-একটি দ্রব্য বেশি পেতে হলে অন্য দ্রব্য কিছু পরিমানে ত্যাগ করতে হয়। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা মূল বিন্দুর দিকে অবতল। এটি উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান সুযোগ ব্যয় দেখায়। পাটের উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়ালে আখ উৎপাদন ক্রমশ: বেশি হারে কমে। পাটের প্রতি একক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আখের উৎপাদন ক্রমাগত ভাবে ২, ৩, ৫, ১, ৮, ১২ ও ৩০ একক কমে। পরিভাষাগত ভাবে, এর কারণ কি? এর সরল ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া যায় ঃ অর্থনৈতিক সম্পদ বিশেষায়িত বা বিশেষ কাজে অধিক উৎপাদনশীল। ক বিন্দু থেকে শুরু করে ঘ বিন্দুর দিকে এগোলে প্রথমে আখ উৎপাদন থেকে সরিয়ে ভূমি ও অন্যান্য যে সকল সম্পদ পাট উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হবে, যুক্তিসঙ্গতভাবে সেগুলো আখ উৎপাদনের তুলনায় পাট উৎপাদনে অধিক উৎপাদনশীল । ফলে অল্প পরিমাণ সম্পদ স্থানান্তর করে অনেক বেশি পরিমাণ পাট উৎপাদন করা যায়। এই রেখাধরে ক্রমাগতভাবে ঘ বিন্দুর দিকে এগোলে পাট উৎপাদনে বেশি উৎপাদনশীল সম্পদ ক্রমান্বয়ে দুস্প্রাপ্য হয়। ক্রমান্বয়ে আখ উৎপাদন থেকে পাট উৎপাদনে ঐসব সম্পদ স্থানান্তর করতে হয় যা তুলামূলকভাবে পাট এর চেয়ে আখ উৎপাদনে অধিক উৎপাদনশীল। ফলে সমান পরিমাণ পাট উৎপাদনের জন্য এ সকল সম্পদ বেশি বেশি পরিমাণে লাগে এবং ক্রমাগতভাবে বেশি পরিমানে আখ এর উৎপাদন ত্যাগ করতে হয়। সবশেষে আখ উৎপাদন থেকে যে সব সম্পদ স্থানান্তর করা হয় তা পাট উৎপাদনের উপযোগী নয়। আখ বীজ পাট উৎপাদনে লাগে না ফলে অনেক পরিমাণ আখ উৎপাদন ত্যাগ করেও পাট উৎপাদন সামান্য পরিমাণ বাড়ে। সম্পদের পূর্ণ বিকল্পায়ন বা পরিবর্তনীয়তার অভাবে, একটি দ্রব্যের ক্রমাগত অধিক একক পাওয়ার জন্য অপর দ্রব্যের পরিমাণ ক্রমাগত অধিকহারে ত্যাগ ক্রমাবর্ধমান ব্যয় বিধি হিসাবে পরিচিত।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে চিত্র - ১ - এ চ বিন্দু নির্দেশিত সমাহার এই অর্থনীতির নাগালের বাইরে। এই সমাহার উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ এই অর্থনীতিতে নেই। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলে উৎপাদন সম্ভাবনা ডান দিকে সরে যায় এবং আজকে যে উৎপাদন সমাহার নাগালের বাইরে আগামীতে তা নাগালের মধ্যে চলে আসে। অর্থনৈতিক সম্পদ - শ্রম, ভূমি, কারখানা, যন্ত্রপাতি, পরিবহন মাধ্যম ইত্যাদি বৃদ্ধি পেলে এবং/বা প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে। চিত্র ২ - এ ক′ ঘ′ রেখা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে অর্থনীতির নতুন উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

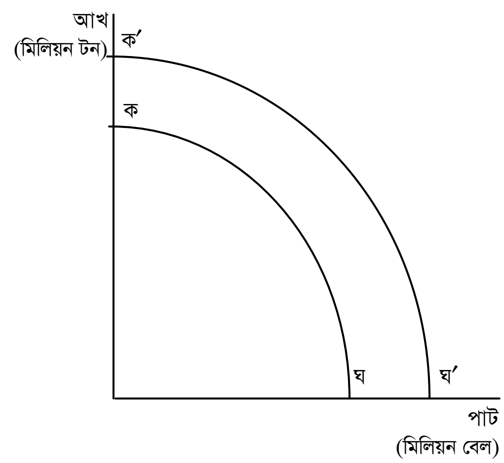

চিত্র ২ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

অনুশীলনী ১.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. সুযোগ ব্যয় হচ্ছে?
   ক. একটি দ্রব্যের উৎপাদন খরচ
   খ. একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে গিয়ে অন্য দ্রব্যের যে পরিমাণ উৎপাদন ত্যাগ করতে হয়
   গ. উদ্যোক্তার পাওনা
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়

২. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা –
   ক. সম্পদের বিভিন্ন পরিমাণ দেখায়
   খ. দুটি পণ্যের বিভিন্ন সমন্বয় দেখায়
   গ. উপরের পরিমাণ দেখায়
   ঘ. উপরের সব কয়টিই সঠিক

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কি নির্দেশ করে? বর্ণনা করুন।

২. সুযোগ ব্যয় কি? উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে সুযোগ ব্যয় ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যায় কি?

৩. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার কোন পরিবর্তন হয় কি? ব্যাখ্যা করুন।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ইউনিট ২

fwgKv

অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের বেঁচে থাকার একটি কৌশল। মানুষের উৎপাদন ও বন্টন কাজ চালানোর একটি উপায়। বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান সেগুলোকে প্রধানতঃ কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, মিশ্র অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতি।

পাঠ ১ : অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে বিকল্প ব্যবস্থাসমূহ : ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র ও ইসলামী অর্থনীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক তফাৎগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

২.১.১ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি সাধারণভাবে বাজার অর্থনীতি বা অবাধ উদ্যোগ বা অবাধ-নীতি অর্থনীতি হিসেবেও পরিচিত। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ বাজার শক্তির অবাধ ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান করা হয়। এই অর্থ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে রাষ্ট্রের কোন ভূমিকা থাকে না বা নগণ্য ভূমিকা থাকে। যথাযথভাবে বলতে গেলে বিশুদ্ধ বাজার অর্থনীতি বা অবাধ-নীতি অর্থনীতি কখনও বিদ্যমান ছিল না। সমাজে যখনই কোন রাজনৈতিক সংগঠন ছিল তখনই তা কিছু কিছু অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদন করেছে (যেমন, মূল্য নিয়ন্ত্রণ বা কর আরোপ)। বিশুদ্ধ বাজার অর্থনীতি একটি আদর্শ অবস্থা এবং আমাদের জানা দরকার এটি কিভাবে কাজ করে।

২.১.২ ধনতান্ত্রিক বা বাজার অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলঃ

১. ব্যক্তিগত সম্পত্তি

ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ অর্থব্যবস্থায় ভূমি, দালান কোঠা, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ও মানুষ নির্মিত সম্পদের মালিকানার, নিয়ন্ত্রণের ও বিলিবন্দেজ করার অধিকার ব্যক্তি বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে।

২. পছন্দ ও উদ্যোগের স্বাধীনতা

উদ্যোগের স্বাধীনতা বলতে বুঝায় যে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক সম্পদ কেনা ও ভাড়া নেয়া, এই সকল সম্পদ সংগঠিত করে পছন্দমত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করা এবং উৎপাদিত

দ্রব্য ও সেবা পছন্দমত বাজারে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে স্বাধীন। কোন শিল্পে প্রবেশ বা প্রস্থানের ক্ষেত্রে কোন উদ্যোক্তার জন্য সরকার বা অন্য উৎপাদক কোন কৃত্রিম বাধা বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না।

পছন্দের স্বাধীনতা বলতে বুঝায় যে, ভূমি ও মূলধনের মালিকেরা যেভাবে উপযুক্ত মনে করে সেভাবে এসব সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। শ্রমিকেরা তাদের যোগ্যতা অনুসারে পেশা বাছাই ও ত্যাগ করতে পারে। সর্বোপরি ভোক্তা তাদের পছন্দ অনুযায়ী খরচ করতে পারে। ভোক্তার স্বাধীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তাকে প্রভূ বিবেচনা করা হয়। কারণ ভোক্তা যে সব দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য ব্যয় করে সমাজের সম্পদ সেসব দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩. স্বার্থের ভূমিকা

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ব্যক্তিবাদী এবং এজন্য এরূপ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হল ব্যক্তি স্বার্থের উন্নতি সাধন। প্রত্যেক অর্থনৈতিক একক তার নিজের জন্য যা সবচেয়ে ভাল তা করে। ফার্ম এমনভাবে উৎপাদন করে যাতে তার মুনাফা সর্ব্বোচ্চ হয় (বা ক্ষতি নূন্যতম হয়)। ভূমি ও মূলধনের মালিক এসব সম্পদ এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে যা থেকে সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক পাওয়া যায়। শ্রমিক তার পেশা ও কর্মস্থল এমনভাবে পছন্দ করে যাতে সে সর্বোচ্চ মজুরি পায়। ভোক্তা এমনভাবে তার আয় ব্যয় করে যাতে সে সর্বোচ্চ কিস্তি লাভ করে। বাজার অর্থনীতির প্রবক্তাগণ যেমন এ্যাডাম স্মীথ, যুক্তি দেখান যে ব্যক্তি স্বার্থের উন্নতিবিধানের চেষ্টা সর্বোচ্চ সামাজিক কল্যাণ বয়ে আনে।

৪. প্রতিযোগিতা

অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। প্রতিযোগিতা বলতে মূলতঃ দাম প্রতিযোগিতা বুঝায়। দ্রব্য বা উপকরণের বাজারে অসংখ্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা থাকে। কোন একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা বাজারের তুচ্ছ অংশ অর্থাৎ মোট ক্রয় বা বিক্রয়ের তুলনায় তার ক্রয় বা বিক্রয়ের পরিমাণ খুব অল্প। সুতরাং সে এককভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মোট চাহিদা ও যোগানের মিথ ক্রিয়ার মাধ্যমে বাজারে দাম নির্ধারিত হয় এবং এই দাম প্রদত্ত ধরে ক্রেতা ও বিক্রেতা সিদ্ধান্ত নেয়। তত্ত্বগতভাবে, প্রতিযোগিতা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণমূলক কৌশল। এটি অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ সীমিত করে। কারণ, কোন একক ফার্ম বা ব্যক্তি বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

৫. বাজার এবং দাম

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে সম্পদ বরাদ্দকরণে মূল্য প্রক্রিয়ার ব্যবহার। বিভিন্ন দ্রব্য ও উপকরণের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সিদ্ধান্ত বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে কার্যকরি হয়। ক্রেতাদের সিদ্ধান্ত দ্বারা চাহিদা এবং বিক্রেতাদের সিদ্ধান্ত দ্বারা যোগান নির্ধারিত হয়। চাহিদা এবং যোগানের মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে বাজারে দাম নির্ধারিত হয়। এই দাম সম্পদের মালিক, উদ্যোক্তা এবং ভোক্তাদের জন্য পথনির্দেশক স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে যার ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। যেমন, কোন দ্রব্যের দাম বাড়লে ঐ দ্রব্যটি উৎপাদন করা বেশী লাভজনক হয় এবং ফলে উৎপাদকেরা দ্রব্যের যোগান বাড়ায়।

দাম রসদবন্টন কৌশল হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক দ্রব্য দুষ্পাপ্য। এসব দুস্প্রাপ্য দ্রব্যের যারা চাহিদা সৃষ্টি করে দাম তাদের মধ্যে দ্রব্য সংবিভাগ করে। কোন দ্রব্যের যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হলে দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পায়। যারা বেশি দাম দিতে সক্ষম নয় তারা বাজার থেকে সরে যায়। যারা বেশি দিতে সক্ষম তারা দুস্প্রাপ্য দ্রব্যটি পেতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে, দাম

প্রয়োজন বা অভাব অনুসারে দ্রব্য সংবিভাগ করে না বরং দাম প্রদানের ক্ষমতা অনুসারে দ্রব্য সংবিভাগ করে।

৬. সরকারের সীমিত ভূমিকা

প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্পদের ব্যবহার বা বরাদ্দকরণে সর্বাপেক্ষা দক্ষ। তাই এরূপ অর্থনীতির কার্যপরিচালনার জন্য বস্তুতপক্ষে সরকারের কোন ভূমিকা নেই। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবহার এবং ব্যক্তির পছন্দের সীমারেখা টানার জন্য সরকার শুধু যথাযথ আইন কাঠামো দিতে পারে। যেমন, নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে মাদক দ্রব্য উৎপদানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে।

২.১.৩ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বলতে এমন অর্থনীতি বুঝায় সেখানে সম্পদের সামাজিক মালিকানা বিদ্যমান এবং মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সমাধা হয়।

২.১.৪ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হল।

১. অর্থনৈতিক সম্পদের সামাজিক (ও নিয়ন্ত্রন পৃঃ ২২) মালিকানা

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক সম্পদের সামাজিক মালিকানা থকে। ভূমি, আবাসন, কলকারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি সাধারণতঃ রাষ্ট্রের মালিকানাধীন থকে। আয় ও সম্পদ বন্টনে যাতে প্রকট বৈষম্য সৃষ্টি না হয় এজন্য এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে রাষ্টীয় মালিকানা থাকে। তাছাড়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যও রাষ্ট্রের হাতে সম্পদের প্রত্যক্ষ মালিকানা থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

সম্পদের মালিকানা ব্যক্তিগত না হয়ে যৌথ হওয়ার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, সম্পদের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পদের নিয়ন্ত্রণ এবং সকল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা গৃহীত হয়। কি উৎপাদিত হবে, কিভাবে উৎপাদিত হবে এবং কিভাবে উৎপাদিত দ্রব্য বন্টিত হবে তা কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করে। বিকল্পভাবে, সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত থাকলেও খামার, কলকারখানা এবং দোকানের দৈনন্দিন পরিচালনার দায়িত্ব শ্রমিক ও ভোক্তার সমবায়ের নিকট দেয়া হতে পারে।

যে সমাজে সম্পত্তির সরকারী মালিকানা থকে তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম্পত্তির মালিকানা থেকে কোন ব্যক্তিগত আয় উদ্ভূত হয় না। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তির মালিকানা থেকে সুদ, খাজনা এবং মুনাফা অর্জিত হয়।

২. নির্দেশিত পরিকল্পনা

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কি উৎপাদিত হবে এবং কি ভাবে উৎপাদিত হবে এই সিদ্ধান্ত মুনাফা উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তি স্বার্থের অবাধ ক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় না। কোন নির্বাচিত বা নিয়োগকৃত পরিকল্পনাবিদ গোষ্ঠীর এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। বলা হয়ে থাকে যে, উৎপাদন ব্যবহারের জন্য মুনাফার জন্য নয়। প্রথমে চূড়ান্ত দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। এরপর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিমাণ এবং বিভিন্ন ফার্মের মধ্যে প্রবাহ হিসাব করা হয়। বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বিশদভাবে তৈরি করা হয়। তবে ফার্মগুলো বিভিন্ন প্রকার শ্রমের সমন্বয় নির্বাচনে ব্যাপক স্বাধীনতা ভোগ করে।

গত এক দশকের বেশি সময় ধরে পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পতন ঘটে এবং বাজার অর্থনীতির বিজয় ঘটে। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে বাজার অর্থনীতিতে

উত্তরণের উৎকৃষ্ট পথের সন্ধান চলছে। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যত ভূমিকা কি হবে তা নিয়ে ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদগণ গবেষণা করছেন।

২.১.৫ মিশ্র অর্থনীতি

বর্তমান কালে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই বিশুদ্ধ ধনতান্ত্রিক বা বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নয়। বর্তমানে সকল অর্থনীতি মিশ্র অর্থনীতি। মিশ্র অর্থনীতি বলতে এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে বাজার ও নির্দেশমূলক উভয় প্রকার অর্থনীতির উপাদান বিদ্যমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে কখনই শতকরা ১০০ ভাগ বাজার অর্থনীতি ছিলনা। বর্তমান কালে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ যেমন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, জাপান এ মূলত বাজার অর্থনীতি বিদ্যমান অধিকাংশ সিদ্ধান্ত বাজারের মাধ্যমে গৃহীত হয়। কিন্তু এসব দেশে বাজারের শক্তির ক্রিয়া সংশোধন বা পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও সরকার কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সরকার অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন ও বিধি প্রণয়ন করে ও জনউপযোগী সেবাকর্ম প্রদান করে। এসব দেশে নির্দেশমূলক ও বাজার অর্থনীতির মিশ্রণ বিদ্যমান।

২.১.৫.১ মিশ্র অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

মিশ্র অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় প্রকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপাদান বিদ্যমান থাকে। মিশ্র অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা ররা হল :

১. **ব্যক্তিগত ও সরকারী খাতের সহাবস্থান :** মিশ্র অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে ব্যক্তিগত ও সরাকারী খাত একত্রে পাশাপাশি অবস্থান করে। অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে ব্যক্তিগত ও সরকারী খাতের ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয়। যেমন, ভারী প্রকৌশল শিল্প, সামরিক উপকরণ, আনবিক শক্তি ইত্যাদি সাধারণতঃ সরকারী খাতে থাকে। অপরদিকে, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প, কৃষি ইত্যাদি সাধারণতঃ ব্যক্তিগত খাতে থাকে।

২. **দাম ব্যবস্থা ও সরকারী নির্দেশের ভূমিকা :** মিশ্র অর্থনীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এটি দাম ব্যবস্থা ও সরকারী নির্দেশ উভয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়। সরকারী খাতের উৎপাদন, দাম ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করে। অপরদিকে, ব্যক্তিগত খাতের উৎপাদন, দাম ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত মুনাফা সর্বোচ্চকরণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।

৩. **সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও আইন :** ব্যক্তিগত খাত যেন শুধু ব্যক্তির স্বার্থে পরিচালিত না হয় এজন্য মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত খাতের কার্যকলাপ সরকারী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন, কোন শিল্পস্থাপনের জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজন হয়। শ্রম নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরী আইন মেনে চলতে হয়, পরিবেশ দূষণকারী ফার্মকে কর দিতে হয় বা সরকারী স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়।

৪. **ভোক্তার স্বাধীনতা :** মিশ্র অর্থনীতিতে ভোক্তার স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। ভোক্তা বাজারে নির্ধারিত দমে তার পছন্দসই পণ্য বাজার থেকে ক্রয় করতে পারে। উৎপাদক ফার্ম ভোক্তার পছন্দসই পণ্য বাজারে যোগান দেয়। অবশ্য কখনও কখনও সরকার ভোক্তার স্বার্থে দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করে বা সীমিত যোগান বিশিষ্ট দ্রব্য রেশনিং এর মাধ্যমে বন্টন করে।

২.১.৬ ইসলামী অর্থনীতি

ইসলামী অর্থনীতি বলতে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত একটি ন্যায়পরায়ণ সমাজে সম্পদের দক্ষ বরাদ্দ ব্যবস্থাকে বুঝায়। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হল :

ক) **সুদ হারাম :** ইসলামী অর্থনীতিতে সুদকে হারাম করা হয়েছে। সুদ ঋণদানকারীর জন্য নিশ্চিত প্রতিদানের ব্যবস্থা করে; ঋণ গ্রহীতার ঝুঁকি বিবেচনা করে না। কোন ব্যাংক ঋণ দান করলে ঋণের অর্থ দ্বারা পরিচালিত বিনিয়োগ বা ব্যবসায় ব্যর্থ হলেও ব্যাংক নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ পায়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি ব্যাংকে আমানত রাখলে আমানতের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ পায় যদিও আমানতের অর্থ ঋণ দিয়ে ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে ঋণের কোন ঝুঁকি না নিয়ে ব্যাংক বা ব্যক্তি ঋণের উপর সুদ অর্জন করে। কিন্তু ন্যায়পরায়ণতা দাবী করে যে ব্যবসায় লাভজনক হলে যেমন তারা মুনাফার অংশ পাবে, ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে তেমনি তারা ক্ষতির ভাগ বহন করবে। অর্থাৎ ঋণদানকারী মুনাফা ও ঝুঁকি উভয়েরই অংশ বহন করবে।

খ) **ইসলামী পুর্নবন্টন :** ইসলামী অর্থনীতির দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ইসলামী পুর্নবন্টন ব্যবস্থা। ইসলামী অর্থনীতিতে পুর্নবন্টনের উদ্দেশ্যে যে সকল হাতিয়ার ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে রয়েছে যাকাত (নিসাব স্তরের অতিরিক্ত সম্পদের উপর শতকরা ২.৫ হারে আরোপিত কর), সদকা (স্বেচ্ছামূলক দান), গনিমত (যুদ্ধে লুণ্ঠিত মাল), খারাজ (যুদ্ধে বিজিত ভূমির উপর আরোপিত কর), উশর (শস্যের উপর যাকাত) ইত্যাদি। মনে করা হয় যে, যাকাত আয় পুর্নবন্টনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এ একজন মুসলমান রাষ্ট্র আরোপিত আয়কর ফাঁকি দিতে পারে। কিন্তু সে ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্মীয় বিধান কর্তৃক নির্ধারিত যাকাত স্বেচ্ছায় প্রদান করবে।

গ) **ইসলামী অর্থনৈতিক নিয়ম :** ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তি বা ফার্ম ইসলামী নিয়মের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ পরিচালনা করে। এ সকল নিয়ম ভাল কাজে উৎসাহ দান করে এবং মন্দ কাজ নিরুৎসাহিত করে। এসব নিয়ম অপচয়, অমিতব্যয় ও আড়ম্বর পরিহার করতে উৎসাহ দেয়। ক্ষতিকর বাহ্যিকতা সৃষ্টি করে এরূপ কাজকে নিরুৎসাহিত করে। এরা ঔদার্য উৎসাহিত করে। তারা ব্যক্তিকে কঠোর পরিশ্রম করতে, ন্যায্য মূল্য চাইতে এবং অন্যান্যদেরকে তাদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করতে উদ্ধুদ্ধ করে। এ সকল নিয়মের উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্বার্থপর ও অর্পনেচ্ছু অর্থনৈতিক মানুষকে উৎকৃষ্ট গুণাবলীসম্পন্ন ইসলামী মানুষে রূপান্তরিত করা। একজন ইসলমী মানুষ স্বাধীনভাবে সম্পত্তি অর্জন করে, কিন্তু কখনও ফটকা কারবার, জুয়া, মজুদদারী কিংবা ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জন করে না। সে যদিও সবসময় ভাল দামে জিনিস বিক্রয় করতে চায়, সে সবসময় তার লেনদেনের অংশীদারের ন্যায্য ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে।

এভাবে ইসলামী অর্থনীতি ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় প্রকার অর্থনীতি থেকে পৃথক। ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত, আবার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে তা খুবই সংকীর্ণ। ইসলামী অর্থনীতি একটি তত্ত্বীয় পন্থা যা অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে কাম্য স্তরে সীমিত করে।

অনুশীলনী ২.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সরকারের হস্তক্ষেপের মাত্রা
 ক. অতিরিক্ত
 খ. সীমিত
 গ. খুবই সীমিত
 ঘ. মোটেই নেই

২. কোন্ ধরনের ব্যবস্থায় সরকারের হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী?
 ক. ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি
 খ. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি
 গ. ইসলামী অর্থনীতি
 ঘ. উপরের সব কয়টিই সঠিক

৩. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সম্পদের মালিক হচ্ছে –
 ক. ব্যক্তি
 খ. রাষ্ট্র
 গ. একটি বিশেষ গোষ্ঠী
 ঘ. উপরের কোনটিই সত্য নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ কি কি? বর্ণনা করুন।
২. মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি?

পাঠ ২ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতি মিশ্র অর্থনীতি। অর্থনীতির সকল খাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বেসরকারী খাতকে তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকারী খাতের ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বর্তমান বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বেসরকারী খাতের ভূমিকাই প্রধান। তবে কিছু ক্ষেত্রে সরকারী খাতের সীমিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গুলি নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

ক) সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন কৃষি জমির ক্ষেত্রে, সম্পত্তির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

খ) ব্যক্তিগত উদ্যোগ, ব্যবসা- বানিজ্য ও পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু শিল্প স্থাপন, ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা ইত্যাদি সরকারী নীতিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন, বাজারে নির্দ্দিষ্ট গুণগত মানের দ্রব্য বিক্রয়, দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন। এ ছাড়া বেআইনী পেশা গ্রহণের উপর বিধিনিষেধ রয়েছে।

গ) বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিকাংশ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে কোন কোন পণ্যের বাজার এ সরকারী হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। যেমন, ধান কাটার মৌসুমে ধান-চাল সংগ্রহ, বেশি দামের সময় খোলা বাজারে ন্যায্যমূল্যে চাল বিক্রয়, ঘাটতির সময় চাল আমদানি ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে।

ঘ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। তবে ধীরে ধীরে বাজার অর্থনীতির প্রয়োজনে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের গুরুত্ব হ্রাস পায়। বর্তমানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সকল কাজ পরিচালিত হলেও শিল্পখাত, আর্থিক খাত, যোগাযোগ ও পরিবহন খাত, খনিজ ও জ্বালানী খাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত রয়েছে।
শিল্প আইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ৬টি ক্ষেত্রে ছাড়া অন্যান্য সকল শিল্প ব্যক্তিগত খাতের বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

ঙ) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যক্তিগত ও সরকারী উভয় খাত গুরুত্বপূর্ণ ও পরিপূরক ভূমিকা পালন করে। বিশেষত, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সরকার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চ) যে সকল ব্যক্তি বাজারে অংশগ্রহণ করতে পারে না বা অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না বাজার অর্থনীতিতে তাদের কল্যাণ হয় না। এসব বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করে। যেমন, দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে গৃহীত কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ডি,জি,ডি কর্মসূচী ইত্যাদি।

ছ) অর্থনীতিতে কোন দুর্যোগ বা সঙ্কট দেখা দিলে সরকার তা মোকাবিলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ব্যাধি ইত্যাদির প্রকোপ লাঘবের জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কোন বাজারে যোগানের স্বল্পতার জন্য বা ফটকাবাজির জন্য অস্থিতিশীলতা দেখা দিলে বাজারকে স্থিতিশীল করার জন্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

অনুশীলনী ১.৩

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে কোন্ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিরাজমান? ব্যাখ্যা করুন।

গাণিতিক অর্থনীতির মৌলিক ধারণা

ইউনিট ৩

fwgKv

অর্থনীতি পাঠের জন্য গাণিতিক অর্থনীতির কিছু মৌলিক ধারণার সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। অর্থনীতি পরিমাপযোগ্য রাশি যেমন- চাহিদা, দাম, মজুরী, জাতীয় আয় ইত্যাদি এবং দুই বা ততোধিক রাশির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। এই সম্পর্ক সমূহ আলোচনায় গাণিতিক ধারণা ব্যবহার করা হয়।

পাঠ-১ : চলক ও ধ্রুবক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- চলক ও ধ্রুবক সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- চলক ও ধ্রুবকের পার্থক্য বলতে পারবেন।

চলক ও ধ্রুবক

গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে রাশির মান পরিবর্তিত হতে পারে তাকে চলক বলে। যেহেতু চলক যে কোন মান গ্রহণ করতে পারে সেজন্য এটি কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ না করে প্রতীক দ্বারা নির্দেশ করা হয়। যেমন X, Y, Z, P, Q ইত্যাদি। অর্থনীতিতে ব্যবহৃত চলকসমূহ হচ্ছে চাহিদা, যোগান, দাম, আয় ইত্যাদি। মনে করি Q চলকটি বাংলাদেশে চা উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করে। কোন বিশেষ বছরে একটি নির্দিষ্ট মান গ্রহণ করতে পারে কিন্তু বিভিন্ন বছর এটির মান বিভিন্ন হবে।

গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে রাশির মানের কোন পরিবর্তন হয় না তাকে ধ্রুবক বলে। যেহেতু ধ্রুবকের মান স্থির থাকে এটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায় কিংবা নির্দিষ্ট প্রতীক দ্বারা নির্দেশ করা যায়। সাধারণত a, b, c ইত্যাদি দ্বারা ধ্রুবক নির্দেশ করা হয়। যখন ধ্রুবক কোন চলকের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে তখন তাকে চলকের সহগ বলা হয়। যেমন ax, by ইত্যাদি।

উপরের আলোচনা থেকে এটি পরিষ্কার যে, চলক ও ধ্রুবক পরস্পর বিপরীত ধারণা। গাণিতিক প্রক্রিয়ায় চলকের মান পরিবর্তিত হয় কিন্তু ধ্রুবকের মান স্থির থাকে।

পরামিতি

যখন ধ্রুবক কোন চলকের সহগ হিসাবে প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তখন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এটির মান স্থির থাকতে পারে। কিন্তু অন্য অবস্থায় এটির মান ভিন্ন হতে পারে। এরূপ ধ্রুবককে পরামিতিক ধ্রুবক বা সংক্ষেপে পরামিতি বলে। যেমন aQ রাশিতে a একটি পরামিতি। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে $a = 5$ হতে পারে; কিন্তু অন্যক্ষেত্রে a যে কোন মান গ্রহণ করতে পারে।

সারসংক্ষেপ

১. গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে রাশির মান পরিবর্তিত হয় তাকে চলক বলে।
২. গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে রাশির মান পরিবর্তিত হয় না তাকে ধ্রুবক বলে।
৩. চলকের সহগ হিসাবে ব্যবহৃত ধ্রুবকের মান একটি বিশেষ অবস্থায় স্থির থাকে। কিন্তু অন্য অবস্থায় ধ্রুবকটির মান ভিন্ন হতে পারে। এরূপ ধ্রুবককে পরামিতিক ধ্রুবক বা পরামিতি বলে।

অনুশীলনী ৩.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে রাশির মান পরিবর্তিত হয় তাকে বলা হয়-
   ক. পরামিতিক ধ্রুবক খ. চলক
   গ. ধ্রুবক ঘ. উপরের সবকটি

২. যদি ধ এর মান সকল সময় ২ হয় তাহলে এটিকে বলা হয়-
   ক. চলক খ. পরামিতিক ধ্রুবক
   গ. ধ্রুবক ঘ. উপরের একটিও নয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. চলক ও ধ্রুবকের মধ্যে পাথর্ক্য নির্দেশ করুন। পরামিতি বলতে কি বুঝেন ?

পাঠ – ২ : অপেক্ষক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- অপেক্ষক সম্পর্কে বলতে পারবেন।

গাণিতিক বিশ্লেষণ চলক সম্পর্কে আলোচনা করে। একটি চলকের মান কিভাবে পরিবর্তিত হয় গাণিতিক বিশ্লেষণ শুধু তাই আলোচনা করে না বরং দুই বা ততোধিক চলক কিভাবে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত থাকে সে সম্পর্কেও আলোচনা করে। যদি দুটি চলক x এবং y এরূপভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় যে x এর প্রতিটি মানের জন্য y এর একটি মাত্র মান পাওয়া যায় তাহলে y-কে x-এর অপেক্ষক বলে। এটি সাংকেতিকভাবে লিখা হয় $y = f(x)$ এবং পড়া হয় y x এর একটি অপেক্ষক বা y x-এর f-এর সমান। এখানে x কে স্বাধীন চলক এং y কে অধীন চলক বলা হয়। y এর মান x এর নির্ভরশীল কিন্তুx এর মান y এর উপর নির্ভর করে না।

অপেক্ষকগত রাশি $y=f(x)$ একটি সাধারণ উক্তি। কিন্তু x পরিবর্তিত হলে y কিভাবে পরিবর্তিত হবে তা এ উক্তি থেকে নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। নির্দিষ্ট ধরনের কিছু অপেক্ষক আছে সেগুলো দুটি চলকের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক প্রকাশ করে।

অর্থনীতিতে সাধারণত যে সকল অপেক্ষক ব্যবহার করা হয় সেগুলো নিচে দেয়া হল।

অপেক্ষক	সাধারণ রূপ	উদারহণ
রৈখিত	$y=mx+c$	$y=3x+5$
দ্বিঘাত	$y=ax^2+bx+c$	$y=5x^2+8x-2$
বহুপদী	$y=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+........+a_0$	$y=6x^3+2x^2-3x+6$
আনুপাতিক	$y=g(x)/h(x)$	$y=3x-5/2x+3$
ঘাত	$y=ax^n$	$y=2x^4$

উপরের $y=3x+5$ অপেক্ষক থেকে দেখা যায় $x=0$ হলে $y=5$। এরপর x 1 একক বৃদ্ধি পেলে y 3 একক বৃদ্ধি পায়।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অর্থনীতিতে অপেক্ষকগত সম্পর্ক নির্দেশ করার জন্য অনেক সময় বামদিকের চলকটির পুনরুক্তি করা হয় অর্থাৎ লিখা হয় $y=y(x)$। এরূপে চাহিদা দামের উপর নির্ভর করে লিখা যায় $Q=Q(p)$ যেখানে Q=চাহিদা এবং p=দাম। আবার ভোগ আয়ের উপর নির্ভর করে লিখা যায় $c=c(y)$।

যেখানে c=ভোগ এবং y=আয়।

সারসংক্ষেপ

১. যদি x, y চলক দুটি পরস্পর এরূপভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় যে x-এর প্রত্যেক মানের জন্য y-এর একটি মাত্র মান পাওয়া যায় তাহলে y-কে x এর অপেক্ষক বলা হয় এবং এটি লিখা হয় $y=f(x)$।

২. অপেক্ষকগত সম্পর্কে যে চলকের মান অপর চলকের মানের উপর নির্ভর করে তাকে অধীন চলক বলে এবং যে চলকের মান অপর চলকের উপর নির্ভর করে না তাকে স্বাধীন চলক বলে।

৩. x পরিবর্তনের সাথে y কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা $y=f(x)$ থেকে জানা যায় না। নির্দিষ্ট ধরনের অপেক্ষক থেকে x, y এর নির্দিষ্ট ধরনের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানা যায়।

অনুশীলনী ৩.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. y x-এর অপেক্ষক যদি-
   ক. x ও y এর চলক দুটি সম্পর্কযুক্ত হয় এবং y-এর মান x-এর উপর নির্ভর করে।
   খ. x-এর প্রতিটি মানের জন্য y-এর একটি মাত্র মান পাওয়া যায়।
   গ. x-এর প্রতিটি মানের জন্য y-এর একাধিক মান পাওয়া যায়।
   ঘ. x-এর পরিবর্তন y-এর পরিবর্তন ঘটায়।
   ঙ. ক এবং খ

২. একটি চলককে স্বাধীন চলক বলে যদি-
   ক. এটির মান স্থির থাকে
   খ. এটির মান অধীন চলকের উপর নির্ভর করে
   গ. এটিকে নির্দিষ্ট মান দেয়া হয়
   ঘ. এটির মান অধীন চলকের উপর নির্ভর করে না।
   ঙ. গ এবং ঘ

৩. নিচের কোনটি অপেক্ষক নয়-
   ক. $y=3x+10$
   খ. $y= x^2$
   গ. $y^2=x$
   ঘ. $y= -x^2+2x+8$

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অপেক্ষক বলতে কি বুঝায় ? অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয় এরূপ কতগুলো অপেক্ষকের উদাহরণ দিন।

পাঠ – ৩ : লেখচিত্র অংকন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- লেখচিত্র কি তা বলতে পারবেন।
- লেখচিত্র অঙ্কন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- সরল লেখচিত্র অংকন করতে পারবেন।

দুটি চলকের মধ্যকার অপেক্ষকগত সম্পর্কের জ্যামিতিক প্রতিরূপ হল লেখচিত্র। লেখচিত্রের মাধ্যমে অপেক্ষকগত সম্পর্ক সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়। একটি লেখচিত্র চাক্ষুষ দেখে সংশ্লিষ্ট চলক দুটির মধ্যকার সম্পর্কের ধরন সম্পর্কে ভাল ধারণা পাওয়া যায়।

একটি নির্দিষ্ট অপেক্ষকের লেখচিত্র অঙ্কনের জন্য x ও y চলকের কিছু সংখ্যক জোড়া মান বের করে সারণী আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। এজন্য x চলককে একটি নির্দিষ্ট মান দেয়া হয় এবং x-এর প্রত্যেক মানে অপেক্ষকটি সমাধান করে y-এর প্রাতিষঙ্গিক মান বের করা হয়। এরপর একটি ছক কাগজে পরস্পর লম্ব করে অনুভূমিক বা x-অক্ষ এবং উলম্ব বা y-অক্ষ অঙ্কন করা হয়। এই লম্ব দুটির ছেদবিন্দুকে মূলবিন্দু বলে। মূলবিন্দু থেকে শুরু করে অনুভূমিক অক্ষে x চলকের মান এবং উলম্ব অক্ষে y চলকের মান পরিমাপ করা হয়। প্রতি একক x(y) এর জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক বর্গ নেয়া হয়। এবার সারণী থেকে x ও y এর এক জোড়া মান নিয়ে ছক কাগজে একটি বিন্দু হিসাবে স্থাপন করা হয়। সুতরাং জোড়া মান বিন্দুর স্থানাংক হিসাবে কাজ করে। এভাবে প্রতি জোড়া মান একেকটি বিন্দু হিসাবে স্থাপন করা হয়। এই বিন্দুগুলোর মধ্য দিয়ে মুক্ত হস্তে রেখা অঙ্কন করে নির্দিষ্ট অপেক্ষকের লেখচিত্র পাওয়া যায়।

উদাহরণ ঃ y=5-2x এবং y=3x+4 এর লেখচিত্র অঙ্কন।

প্রথমে x এর কয়েকটি নির্দিষ্ট মান নেই এবং সমীকরণটির x-এর প্রত্যেক মানের সমাধান করে y-এর মান বের করি।

x	5-2x=y	বিন্দুর স্থানাংক :
0	5-2.0=5	(0,5)
1	5-2.1=3	(1,3)
2	5-2.2=1	(2,1)

x	3x+4=Y	বিন্দুর স্থানাংক
0	3.0+4=4	(0,4)
1	3.1+4=7	(1,7)
2	3.2+4=10	(2,10)

জোড়া মানগুলি ছক কাগজে স্থাপন করি। বিন্দুগুলো যোগ করে একটি সরল রেখা পাওয়া যায়। এই রেখার নাম দিই DD রেখা।

একইভাবে দ্বিতীয় অপেক্ষকের লেখচিত্র অংকন করি। এই রেখার নাম দিই SS রেখা।

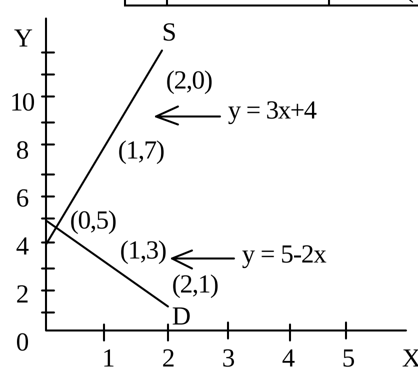

চিত্র- ৩.১ লেখচিত্র অংকন

সারসংক্ষেপ

দুটি চলকের মধ্যকার অপেক্ষকগত সম্পর্কের জ্যামিতিক প্রতিরূপ হ'ল লেখচিত্র।

অনুশীলনী ৩.৩

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. y = 4x-5 & y = -1/3x+10 অপেক্ষক দুটির লেখচিত্র আঁকুন।

পাঠ – ৪ : ঢাল ও ছেদাংশ

দুটি চলকের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান তা রেখার ঢালের সাহায্যে সহজে বর্ণনা করা যায়। একটি চলকের পরিবর্তনের সঙ্গে অপর একটি চলকের পরিবর্তনের পরিমাপ রেখার ঢালের সাহায্যে দেখানো হয়। আরো সঠিকভাবে বলা যায়, x-চলকের ১-একক পরিবর্তনের ফলে y এককের পরিবর্তনের পরিমাপই হচ্ছে ঢাল। যদি একটি সরল রেখা দুটি (x_1,y_1)বিন্দু ও (x_2,y_2)এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে ঐ রেখার ঢাল নিম্নোক্তভাবে পরিমাপ করা যায়।

$$M=\Delta y/\Delta x=y_2-y_1/x_2-x_1$$

এখানে Δ দ্বারা পরিবর্তন বুঝানো হয়েছে।

চিত্র ৩.২-এর সাহায্যে একটি রেখার ঢাল কিভাবে পরিমাপ করা যায় তা ব্যাখ্যা করা যায়।

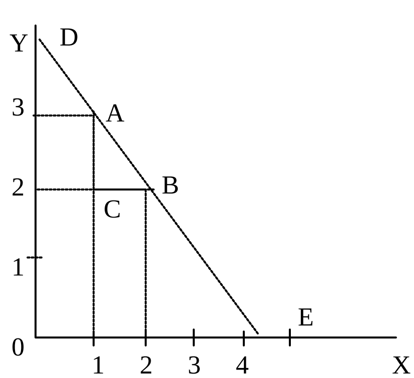

চিত্র- ৩.২ ক – ঢাল

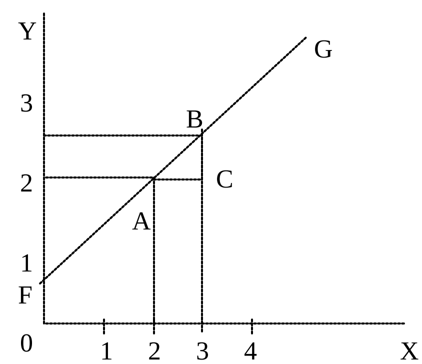

চিত্র- ৩.২ খ – ঢাল

২ক রেখার A ও B বিন্দুর মধ্যে ঢাল $M=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{AC}{BC}=\frac{2-2\frac{3}{4}}{2-1}=\frac{-\frac{3}{4}}{1}=-\frac{3}{4}$

২খ রেখার A ও B বিন্দুর মধ্যে ঢাল $M=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{BC}{AC}=\frac{2\frac{1}{2}-2}{3-2}=\frac{\frac{1}{2}}{1}=\frac{1}{2}$

৩.২ক চিত্রে x-এর ১ একক বৃদ্ধির সঙ্গে y-এর 3/4 একক হ্রাস ঘটে। সুতরাং ঢাল = -3/4 ৩.২খ চিত্রে x-এর ১ একক বৃদ্ধির সঙ্গে y-এর 1/2 একক বৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং ঢাল =1/2। প্রথম ক্ষেত্রে ঢাল ঋণাত্মক এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঢাল ধনাত্মক। ঋণাত্মক ঢাল বিশিষ্ট রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়। অর্থাৎ x বৃদ্ধি পেলে y হ্রাস পায়। অপরদিকে ধনাত্মক ঢাল বিশিষ্ট রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়। অর্থাৎ x বৃদ্ধি পেলে y বৃদ্ধি পায়। সরল রেখা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এর প্রতিটি বিন্দুতে ঢাল অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ x-এর পরিবর্তনের সঙ্গে y-এর পরিবর্তনের পরিমাণ সকল বিন্দুতে সমান থাকে।

একটি রেখা y-অক্ষের যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে y ছেদাংশ বলে। এই বিন্দুতে x=0। রেখাটি x অক্ষের যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে x ছেদাংশ বলে, এই বিন্দুতে y=0। ৩.২ক চিত্রে DE রেখার y ছেদাংশ OD এবং x ছেদাংশ OE। ৩.২খ চিত্রে FG রেখার y ছেদাংশ OF।

সারসংক্ষেপ

১. কোন রেখার ঢাল রেখাটির দুটি বিন্দুর মধ্যে x-এর প্রতি একক পরিবর্তনের ফলে y-এর পরিবর্তনের পরিমাণ দেখায়।

২. কোন রেখার ঢাল রেখাটির দিক নির্দেশ করে।

৩. সকল রেখার ঢাল স্থির।

৪. একটি রেখা y অক্ষে যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে y ছেদাংশ এবং x অক্ষে যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে x ছেদাংশ বলে। একটি চলকের মান শূন্য অবস্থায় অপর চলকটির যে মান পাওয়া যায় ছেদাংশ তাই নির্দেশ করে।

পাঠত্তোর মূল্যায়ন ৩.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. $Y= -2/3x+6$ রেখাটির ঢাল

ক. 2/3 খ. 6

গ. -2/3 ঘ. ক এবং গ উভয়ই

২. কোন রেখার ঢাল ঋণাত্মক হলে রেখাটি

ক. ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয় খ. ডানদিকে নিম্নগামী হয়

গ. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় ঘ. উলম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়

৩।

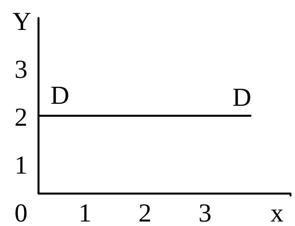

উপরের রেখাটির ঢাল

ক. 1 খ. -1

গ. শূন্য ঘ. অর্নির্ণেয়

৪।

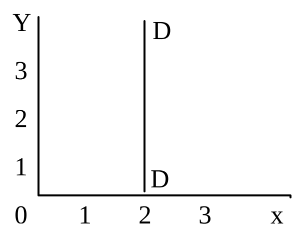

উপরের রেখাটির ঢাল

ক. 2 খ. 1

গ. অসীম ঘ. শূন্য

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

(ক) ঢাল বলতে কি বুঝায় ? একটি সরল রেখা এঁকে রেখাটির ঢাল ও ছেদাংশ নির্দেশ করুন।

পাঠ ৫ : বিভিন্ন রেখার সমীকরণ : চাহিদা ও যোগান রেখা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- চাহিদা রেখা ও যোগান রেখা কি তা জানতে পারবেন
- চাহিদা রেখা ও যোগান রেখা আঁকতে পারবেন।

অর্থনীতির আলোচনায় প্রায়শঃ লেখচিত্র ব্যবহার করা হয়। লেখচিত্রের সুবিধা হল এর সাহায্যে অনেক উপাত্ত সহজে দেখানো যায় এবং সহজে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যায়। একটি লেখচিত্রের এক নজর দেখে ধারণা করা যায় দুটি চলকের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের প্রাথমিক পর্যায়ে দুটি রেখা খুব বেশি ব্যবহৃত হয়। এ দুটি হচ্ছে চাহিদা রেখা ও যোগান রেখা। এখানে চাহিদা রেখা ও যোগান রেখা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

চাহিদা রেখা কোন দ্রব্যের চাহিদা ও দামের সম্পর্কের জ্যামিতিক প্রকাশ। কোন দ্রব্যের চাহিদা দ্রব্যটির দাম, অন্যান্য ভোগ্য দ্রব্যের দাম, ভোক্তার আয় ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত রেখে কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হলে দ্রব্যটির চাহিদা কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা যে রেখার সাহায্যে দেখানো হয় তাকে চাহিদা রেখা বলে। মনে করি $P=A-bQ_d$ একটি রৈখিক চাহিদা রেখার সমীকরণ। এখানে Q_d চাহিদার পরিমাণ এবং A ধনাত্মক ধ্রুবক। জ্যামিতিকভাবে A হচ্ছে উলম্ব দাম রেখার সাথে চাহিদা রেখার ছেদাংশ (দাম এত বেশী যে এ দামে চাহিদার পরিমাণ শূন্য) এবং -b হচ্ছে চাহিদা রেখার ঋণাত্মক ঢাল।

চিত্র ৩.৩ এ একটি নিম্নগামী চাহিদা রেখা দেখানো হয়েছে। দাম অক্ষের সাথে এই রেখা A বিন্দুতে মিলিত হয়। OA দামে চাহিদার পরিমাণ শূন্য। চাহিদা রেখার সাথে একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা হয়েছে যার ভূমি 1 এবং উচ্চতা b অর্থাৎ রেখাটির ঢাল $-b/1 = -b/1$ রেখাটি অনুভূমিক অক্ষের h বিন্দুতে মিলিত হয়। শূন্য দামে অর্থাৎ দ্রব্যটি অবাধলভ্য হলে এর চাহিদা হয় oh।

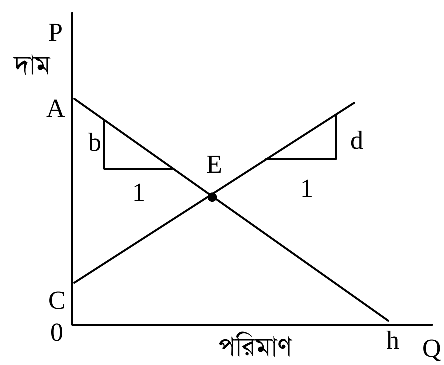

চিত্র- ৩.৩ চাহিদা ও যোগান রেখা

যোগান রেখা কোন দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ এবং দ্রব্যটির দামের সম্পর্কের জ্যামিতিক প্রকাশ। কোন দ্রব্যের যোগান দ্রব্যটির দাম, সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম, উপকরণের দাম, প্রযুক্তির স্তর ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত রেখে কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যটির যোগানের পরিমাণ কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা যে রেখার সাহায্যে দেখানো হয় তাকে যোগান রেখা বলে। মনে করি $p=c+dQ_s$দাম একটি রৈখিক যোগান রেখার সমীকরণ। এখানে Qs যোগানের পরিমাণ, P দাম এবং c & d ধণাত্মক ধ্রুবক। জ্যামিতিকভাবে c হচ্ছে দাম অক্ষে চাহিদার রেখার ছেদাংশ (দাম এত কম যে এই দামে যোগানের পরিমাণ শূন্য) এবং d হচ্ছে যোগান রেখার ধনাত্মক ঢাল। চিত্র ৩.৩ এ একটি ডানদিকে উর্ধ্বগামী যোগান রেখা দেখানো হয়েছে। এই রেখা দাম অক্ষের সাথে c বিন্দুতে মিলিত হয়। oc দামে যোগানের পরিমাণ শূন্য। যোগান রেখার সাথে একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা হয়েছে যার ভূমি 1 এবং উচ্চতা d অর্থাৎ রেখাটির ঢাল =d/1 =d।

উদাহরণ ঃ নিচে চাহিদা ও যোগান রেখার সমীকরণ দেয়া আছে। এ থেকে চাহিদা ও যোগান রেখা আঁক।

চাহিদা

$$P=10-Q_d$$
$$P=4+Q_s$$

উত্তর : এখানে চাহিদা রেখা ও যোগান রেখা উভয়ই সরল রেখা। সরল রেখা আঁকার জন্য দুটি বিন্দু বের করাই যথেষ্ট এবং এই বিন্দু দুটি যোগ করে চাহিদা রেখা পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে যোগান সমীকরণ তৃপ্ত করে এরূপ দুটি বিন্দু বের করতে হবে এবং এ বিন্দু দুটি যোগ করে যোগান রেখা পাওয়া যাবে। চাহিদা রেখার সমীকরণ থেকে দাম অক্ষের ছেদাংশ বের করার জন্য ধরি Qd=0 এবং P এর মান বের করি O=10-p বা p=10। পরিমাণ অক্ষের ছেদাংশ বের করার জন্য ধরি P=0 এবং Qd-এর জন্য সমাধান করে পাই Qd=10। এখন (O,10) এবং (10, O) বিন্দু দুটি দাম ও পরিমাণ অক্ষে আঁকি। বিন্দু দুটি যোগ করে DD চাহিদা রেখা পাওয়া যায়।

একইভাবে, যোগান রেখার সমীকরণ থেকে যোগান রেখার দাম অক্ষের ছেদাংশ বিন্দু এবং অপর যেকোন একটি বিন্দু নির্ণয় করি। এরূপ দুটি বিন্দু যথাক্রমে (o,4) এবং 6,10 (5,9) বিন্দু দুটি যোগ করে যোগান SS রেখা পাওয়া যায়।

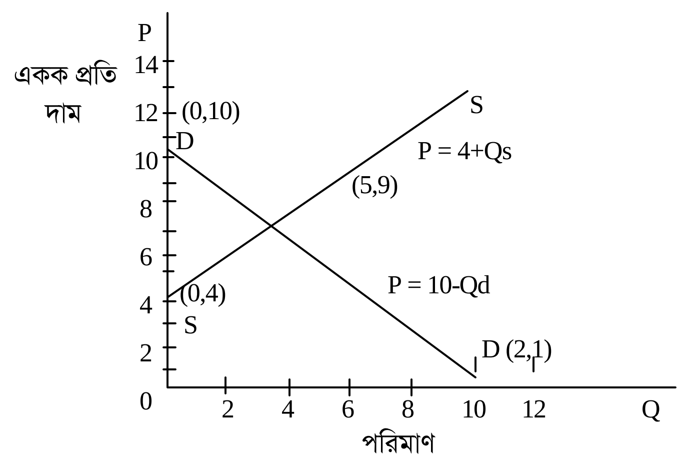

চিত্র- ৩.৪ চাহিদা ও যোগান রেখা

সারসংক্ষেপ

অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থেকে কোন নির্দিষ্ট সময়ে দাম পরিবর্তনের সাথে চাহিদার পরিমাণের যে পরিবর্তন হয় তা যে রেখার সাহায্যে দেখানো হয় তাকে চাহিদা রেখা বলে। সাধারণ অবস্থায় চাহিদা রেখার ঢাল ঋণাত্মক অর্থাৎ এটি ডানদিকে নিম্নগামী। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থেকে কোন নির্দিষ্ট সময়ে দাম পরিবর্তনের সাথে যোগানের পরিমাণের যে পরিবর্তন হয় তা যে রেখার সাহায্যে দেখানো হয় তাকে যোগান রেখা বলে।

অনুশীলনী ৩.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. চাহিদা রেখার উপর কোন কোন বিষয় অপরিবর্তিত ধরে নেয়া হয় না?

ক. ভোক্তার আয়   খ. সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম

গ. ভোক্তার সংখ্যা   ঘ. দ্রব্যটির দাম

২. যোগান রেখার উপরে কোন বিষয় অপরিবর্তিত ধরে নেয় হয় ?

ক. সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম   খ. উপকরণের দাম

গ. প্রযুক্তির স্তর   ঘ. উপরের সবকটি

৩. চাহিদা রেখা সমীকরণ P=10-1/2Q। দাম ৫ হলে চাহিদার পরিমাণ

ক. 5   খ. 7.5

গ. 10   ঘ. 12.5

৪. যোগান রেখা সমীকরণ p=2Q। দাম 1O হলে যোগানের পরিমাণ

ক. 20   খ. 5

গ. 10   ঘ. 0

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. চাহিদা রেখা বলতে কি বুঝায় ? চাহিদা রেখা সমীকরণ p=10-2Q থেকে একটি চাহিদা রেখা আঁকুন।

২. যোগান রেখা বলতে কি বুঝায় ? যোগান রেখা সমীকরণ P=6+3Q থেকে একটি যোগান রেখা আঁকুন।

ভোক্তার আচরণ : উপযোগ

ইউনিট ৪

পাঠ ১ : উপযোগ : মোট, গড় ও প্রান্তিক উপযোগ

fwgKv

ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণ অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণের দু'টো মৌলিক এ্যাপ্রোচ রয়েছে। প্রথমটি হলো সনাতনি এ্যাপ্রোচ : প্রান্তিক উপযোগ ভিত্তিক। এটি পরিমাপগত উপযোগ এ্যাপ্রোচ নামে খ্যাত। দ্বিতীয়টি হলো নিরপেক্ষ রেখা বিশ্লেষণ যা পর্যায়গত বিশ্লেষণ হিসেবে খ্যাত। উপযোগের পরিমাপগত বিশ্লেষকদের মতে উপযোগ পরিমাপযোগ্য। কেউ কেউ অর্থের মাধ্যমে তা পরিমাপ করেছেন। আবার কেউ কেউ ভিন্ন একক ব্যবহার করেছেন। উপযোগের পর্যায়গত বিশ্লেষকদের মতে উপযোগ পরিমাপযোগ্য নয়। দু'টি ভিন্ন ভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ ভিন্ন। একটি থেকে প্রাপ্ত উপযোগ অন্যটির থেকে প্রাপ্তউপযোগের চেয়ে কম/ বেশি হতে পারে, তবে কোনটির উপযোগ কত বা একটির উপযোগ অন্যটির চেয়ে কত বেশি/কম তা বলা যায় না। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন এককের উপযোগকে র‍্যাংকিং করা যৌক্তিক। আমরা অত্র ইউনিটে ভোক্তার আচরণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরব। আমরা পাঠ-১ এ উপযোগের সংখ্যা এবং এর বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- উপযোগ কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মোট, গড় ও প্রান্তিক উপযোগ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

উপযোগ (Utility) ঃ সাধারণ অর্থে উপযোগ বলতে কোন দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতাকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে উপযোগ শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন দ্রব্য বা সেবার (উপকারি হউক আর ক্ষতিকর হউক) দ্বারা মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে। অধ্যাপক মেয়ার্সের মতে " উপযোগ হলো কোন দ্রব্যের ঐ বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা যা মানুষের অভাব পূরণে সক্ষম। সুতরাং কোন দ্রব্য বা সেবার মধ্যে মানুষের অভাব বা চাহিদা পূরণের ক্ষমতা থাকলেই ঐ দ্রব্য বা সেবার উপযোগ আছে বলে বিবেচ্য যেমন কলম দিয়ে আমাদের লিখার চাহিদা পূরণ হয়, পানি পিপাসা মেটায়, খাদ্য ক্ষুধা নিবারণ করে, ডাক্তারের পরামর্শ রোগ নিরাময়ের সহায়ক, নার্সের সেবা রোগীকে সুস্থ হতে সহায়তা করে। কাজেই উপরোক্ত দ্রব্য ও সেবা সমূহের উপযোগ রয়েছে।

উল্লেখ্য যে উপযোগ সম্পর্কীয় আলোচনায় নিম্মোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি নজর রাখা বাঞ্ছনীয় :

১) উপযোগের সাথে নৈতিকতার কোন সম্পর্ক নেই অর্থাৎ ভাল মন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ, উচিৎ অনুচিৎ ইত্যাদির সাথে তা সম্পর্কিত নয়। যেমন- মদ, গাঁজা, আফিন ইত্যাদি ক্ষতিকর হলেও এদের উপযোগ আছে।

২) উপযোগ একটি মানসিক অনুভূতি যা অন্যের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য নয়।

৩) স্থান কাল ও পাত্র ভেদে কোন দ্রব্যের উপযোগের তারতম্য ঘটে থাকে। যেমন শীতের দেশে গরম বস্ত্রের উপযোগ বেশি আর গ্রীষ্ম প্রধান দেশে সুতী কাপড়ের উপযোগ বেশি।

৪) কোন দ্রব্যের উপযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চাহিদার তীব্রতা, অভ্যাস, রুচি, আয় প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

৫) কোন দ্রব্যের প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্তি ও ভোগের ফলে ভোক্তার কাছে তার উপযোগ হ্রাস পায়।

মোট উপযোগ, গড় উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ

মোট উপযোগ (Total Utility) : কোন নির্দিষ্ট সময়ে ভোক্তা কোন দ্রব্য বা সেবা যত একক ভোগ করে তার সবগুলি থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে। মনে করি কোন নির্দিষ্ট সময়ে একজন ভোক্তা পরপর তিনটি কমলা ভোগ করে এবং ১ম, ২য় ও ৩য় কমলা থেকে যথাক্রমে ৬ একক ৫ একক ও ৪ একক উপযোগ লাভ করে। এ ক্ষেত্রে তার মোট উপযোগ হলো সকল একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টি অর্থাৎ তার মোট উপযোগ (৬ একক ৫ একক ও ৪ একক) বা ১৫ একক। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট সময়ে ভোগকৃত কোন দ্রব্যের মোট উপযোগ = দ্রব্যের প্রথম এককের উপযোগ + দ্বিতীয় এককের উপযোগ +.......+ n তম এককের উপযোগ, প্রত্যেক একককে প্রান্তিক একক বিবেচনা করলে মোট উপযোগ সমান প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টি অর্থাৎ

$$TU = MU_1 + MU_2 + \ldots + MU_n$$

যেখানে TU = মোট উপযোগ

MU_i = i তম এককের প্রান্তিক উপযোগ (i=1, 2...n)

উল্লেখ্য কোন নিদিষ্ট সময়ে কোন দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে মোট উপযোগ ক্রম হ্রাসমান হারে বাড়তে থাকে, একসময় মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হয় এবং তারপর তা কমতে থাকে।

গড় উপযোগ (Average Utility) : কোন নির্দিষ্ট সময়ে একজন ভোক্তা ভোগকৃত দ্রব্য থেকে একক প্রতি যে উপযোগ পায় তাকে গড় উপযোগ বলে। নিদির্ষ্ট সময়ে ভোক্তার ভোগকৃত সকল একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগকে ভোগকৃত দ্রব্যের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে গড় উপযোগ পাওয়া যায়। অর্থাৎ গড় উপযোগ = $\dfrac{\text{মোট উপযোগ}}{\text{ভোগকৃত দ্রব্যের পরিমাণ}}$

পূর্বোক্ত উদাহরণে দেখা যায় ভোক্তা তিনটি কমলা থেকে ১৫ একক উপযোগ পায়। এমতাবস্থায় একক প্রতি প্রাপ্ত উপযোগ হচ্ছে (১৫÷৩) একক বা ৫ একক। আর তা-ই হচ্ছে এ ক্ষেত্রে ঐ দ্রব্যের গড় উপযোগ। অর্থনৈতিক আলোচনায় মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ ধারণাদ্বয়ের ব্যবহার ব্যাপক। গড় উপযোগ ধারণাটির তেমন ব্যবহার দেখা যায় না।

প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility) : প্রান্তিক উপযোগ হচ্ছে কোন নিদিষ্ট সময়ে ভোক্তা কোন দ্রব্যের এক একক বেশি বা কম ভোগ করার ফলে মোট উপযোগের পরিবর্তনের পরিমাণ। উপরোক্ত উদাহরণে ভোক্তা কোন ভোগ না করলে মোট উপযোগ শূন্য। ভোক্তা প্রথম কমলাটি ভোগ করায় মোট উপযোগ শূন্য থেকে বেড়ে (পরিবর্তিত হয়ে) দাঁড়াল ৬ এককে।

সুতরাং প্রথম কমলার প্রান্তিক উপযোগ ৬ একক। ভোক্তা দ্বিতীয় কমলাটি ভোগ করার ফলে মোট উপযোগ দাঁড়াল **১১** এককে, অতএব, দ্বিতীয় কমলার প্রান্তিক উপযোগ ৫ একক।

বিষয়টি সমীকরণের সাহায্যে দেখানো যায়- $MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$

যেখানে - MU = প্রান্তিক উপযোগ TU = মোট উপযোগ Q = দ্রব্যের পরিমাণ এবং প্রান্তিক উপযোগ ধারণাটি নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়-

মনে করি, একজন ভোক্তা কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের (n-1) সংখ্যক একক ভোগ করে মোট উপযোগ পায় TU_{n-1}, সে আর এক একক দ্রব্য ভোগ করার মোট উপযোগ বৃদ্ধি (পরিধি) পেয়ে দাঁড়াল TUnএ। ফলে nতম এককের জন্য মোট উপযোগ বাড়ল (পরিবর্তন হলো) = $TU_n—TU_{n-1}$ আর তা হলো nতম এককের প্রান্তিক উপযোগ।

অর্থাৎ $MU_n = TU_n—TU_{n-1}$

যেখানে MU_n = nতম এককের প্রান্তিক উপযোগ।

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Total Utility and Marginal Utility): মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ কমতে থাকে। এভাবে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে ভোগের একস্তরে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হয় এবং সে পর্যায়ে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়। প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হওয়ার আগ পর্যন্ত মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়তে থাকে। প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হওয়ার পরও ভোগের পরিমাণ বাড়াতে থাকলে মোট উপযোগ কমে যায়। অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়।

নিম্নোক্ত সূচীর সাহায্যে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হলো:-

সূচী ৪.১

দ্রব্যের একক (Q)	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
১	৬	৬
২	১১	৫
৩	১৫	৪
৪	১৮	৩
৫	২০	২
৬	২০	০
৭	১৯	- ১

উপরোক্ত সূচীটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দ্রব্যটির ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে মোট উপযোগ বাড়ছে তবে ক্রমহ্রাসমান হারে। এর অর্থ হচ্ছে, প্রান্তিক উপযোগ কমছে। ভোগের পরিমাণ ৫ একক পর্যন্ত এমনটি ঘটেছে। ভোক্তা যখন ৬ একক দ্রব্য ভোগ করে তখন মোট উপযোগ সর্বোচ্চ এবং প্রান্তিক উপযোগ শূন্য। ভোক্তা এরপর অতিরিক্ত একক ভোগের ফলে মোট উপযোগ কমে যাচ্ছে অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক। ভোক্তা ৭ একক ভোগ করলে এমন অবস্থা হয়।

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে যে সম্পর্ক তা চিত্র ৪.১-এর মাধ্যমে দেখানো হলো:-

চিত্র : ৪.১

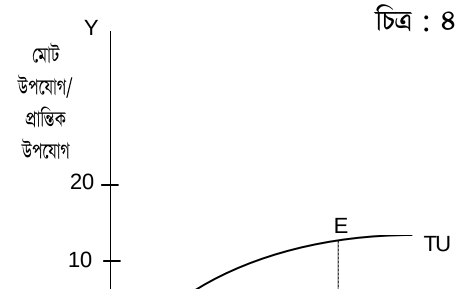

চিত্র ৪.১ এ OX অক্ষে ভোগের পরিমাণ এবং OY অক্ষে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশিত হলো। মোট উপযোগ রেখা (TU) ভূমি অক্ষ থেকে শুরু করে উর্ধগামী এবং এক পর্যায়ে সর্বোচ্চ বিন্দুর পর তা নিম্নগামী। এ রেখাটি উল্টা U-এর মত।

ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ছে। ফলে প্রান্তিক উপযোগ কমে। চিত্রে MU রেখা হল প্রান্তিক উপযোগ রেখা যা ডানদিকে নিম্নগামী। ভোগের পরিমাণ OM এর আগ পর্যন্ত (৬ এককের পূর্ব পর্যন্ত) মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ছে। ফলে প্রান্তিক উপযোগ ধনাত্মক তবে ক্রমহ্রাসমান। OM পরিমাণ ভোগস্তরে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ (ME)। এস্তরে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য যা MU রেখা এবং OX অক্ষের ছেদ বিন্দু M দ্বারা নির্দেশিত, ভোগের পরিমাণ যদি এর চেয়ে বেশি (৬ এককের বেশি) হলে মোট উপযোগ ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে এবং প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়। চিত্রে দেখা যাচ্ছে MU রেখা OX অক্ষকে M বিন্দুতে ছেদ করে নিম্নগামী হয়।

অনুশীলনী ৪.১

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। উপযোগ বলতে কি বুঝ?

২। মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ বলতে কি বুঝ?

৩। মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ কর (সূচী ও রেখাচিত্রের সাহায্যে)।

পাঠ ২ : ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি

fwgKv

ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণে এবং ব্যক্তির চাহিদা রেখা নিরূপণে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির (Law of Diminishing Marginal Utility) গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা এ পর্যায়ে জটিল আলোচনায় না গিয়ে কেবলমাত্র বিধিটির বর্ণনা ও তার সমালোচনা তুলে ধরব।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রান্তিক নিয়োগ রেখা ব্যতিক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি

ইঞ্জিনিয়ার হেনরিখ গোসেন সর্বপ্রথম এ বিধিটির ধারণা উল্লেখ করলেও তার সুস্পষ্টরূপ দেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল।

অনুমিতিসমূহ

এ বিধিটি নিম্নোক্ত কতিপয় অনুমিতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

১. উপযোগের সংখ্যাগত পরিমাপ সম্ভব।
২. ভোক্তার পছন্দ, রুচি, আয় অপরিবর্তিত।
৩. কোন দ্রব্যের উপযোগ একটি স্বাধীন অপেক্ষক। অর্থাৎ কোন দ্রব্যের উপযোগ কেবলমাত্র ঐ দ্রব্যের ভোগের উপর নির্ভরশীল অন্য দ্রব্যের উপর নয়।
৪. ভোক্তা দ্রব্যের প্রতিটি এককের ভোগ একটি নির্দিষ্ট সময়ে ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন করে।
৫. ভোগের প্রাথমিক এককগুলো তৃপ্তির জন্য পর্যাপ্ত হতে হবে এবং প্রতিটি একক সমজাতীয়। দ্রব্যটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য হবে।
৬. ভোক্তার আচরণ যুক্তিসঙ্গত।

বিধিটির মূল বক্তব্য

সাধারণতঃ মানুষের অভাব অসীম। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সময় কোন বিশেষ দ্রব্যের অভাব সসীম। অভাবের এই বৈশিষ্ট্য থেকে এ বিধির উদ্ভব। কোন ভোক্তা যখন কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি দ্রব্য ক্রমাগতভাবে ভোগ করতে থাকে তখন সে দ্রব্যের প্রতি তার আসক্তি আস্তে আস্তে কমে যায়। তাই অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কোন নির্দিষ্ট সময়ে একজন ভোক্তা কোন একটি দ্রব্য ক্রমাগতভাবে ভোগ করতে থাকলে ঐ দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ ক্রম হ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পেতে থাকে। কোন দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাওয়ার এরূপ প্রবণতাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে। অধ্যাপক মার্শালের মতে, "কোন দ্রব্যের মজুত বৃদ্ধির ফলে একজন ব্যক্তি যে অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করে তা ঐ দ্রব্যের মজুত বৃদ্ধির সাথে সাথে হ্রাস পায়।" বোল্ডিং এর মতে, "অন্য সব দ্রব্যের ভোগ অপরিবর্তিত রেখে যদি কোন ভোক্তা কোন একটি দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি করে তাহলে পরিবর্তনীয় দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ পরিশেষে হ্রাস পাবেই।"

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি নিম্নের সূচীর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো:-

সূচী ৪.২

দ্রব্যের একক (Q)	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
১	৬	৬
২	১১	৫
৩	১৫	৪
৪	১৮	৩
৫	২০	২
৬	২০	০
৭	১৯	- ১

ভোক্তা কোন নির্দিষ্ট সময়ে ১ম একক দ্রব্য থেকে ৬ একক উপযোগ, ২য় একক থেকে ৫ একক উপযোগ, ৩য় একক থেকে ৪ একক উপযোগ, ৪র্থ একক থেকে ৩ একক উপযোগ, ৫ম একক থেকে ২ একক উপযোগ এবং ৬ষ্ঠ একক থেকে শূন্য একক উপযোগ পাচ্ছে। সে ঐ সময়ে দ্রব্যটি যতই বেশি ভোগ করছে ততই এর প্রতি আসক্তি কমে যাচ্ছে। ফলে দ্রব্যটি থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। ভোগের এক পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে, অতিরিক্ত একক থেকে কোন উপযোগ পাচ্ছে না। অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ শূন্য। এরপরও যদি ভোক্তা ভোগ অব্যাহত রাখে তবে অতিরিক্ত একক থেকে ঋণাত্মক উপযোগ পায়। সূচীতে ৭ম একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ ঋণাত্মক। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট সময়ে ভোক্তা একটি দ্রব্য ক্রমাগত ভোগ করতে থাকলে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। ভোগের এক পর্যায়ে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয় এবং এরপর তা ঋণাত্মক হয়।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি রেখা চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। চিত্র ৪.২-এ OX অক্ষে ভোগের পরিমাণ এবং OY অক্ষে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশিত হলো।

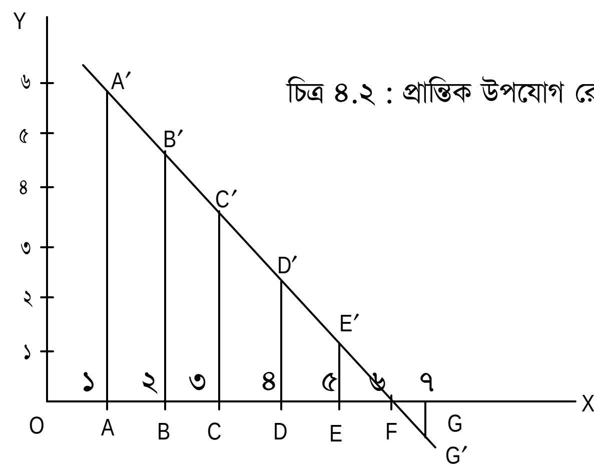

চিত্র ৪.২ : প্রান্তিক উপযোগ রেখা

উপরের চিত্র অনুসারে-

OA (১ম) একক ভোগের প্রান্তিক উপযোগ AA′ (৬ একক)
AB (২য়) একক ভোগের প্রান্তিক উপযোগ BB′ (৫ একক)
BC (৩য়) একক ভোগের প্রান্তিক উপযোগ CC′ (৪ একক)
CD (৪র্থ) একক ভোগের প্রান্তিক উপযোগ DD′ (৩ একক)
DE (৫ম) একক ভোগের প্রান্তিক উপযোগ EE′ (২ একক)
EE (৬ষ্ঠ) একক ভোগের প্রান্তিক উপযোগ O (শূন্য একক)
FG (৭ম) একক ভোগের প্রান্তিক উপযোগ GG′ (-১ একক)

এখানে ভোগের প্রতিটি একক সমান। অর্থাৎ $OA = AB = BC = CD = DE = EF = FG$. কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে, অর্থাৎ $AA' > BB' > CC' > EE' > O > GG'$। চিত্রে ভোগের পরিমাণ এবং প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশক A', B', C', E', F, G' বিন্দুগুলো যোগ করে প্রান্তিক উপযোগ রেখা MU পাওয়া যায় যা ডানদিকে নিম্নগামী এবং ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রতিফলন।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির ব্যতিক্রম:

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটির কতিপয় ব্যতিক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:-

১. এককের পরিমাণ : দ্রব্যের একক যদি যথার্থ না হয়, তাহলে এ বিধির ব্যতিক্রম দেখা দিবে। যেমন- একজন তৃষ্ণার্তকে এক গ্লাস পানির পরিবর্তে এক চামচ পানি দেয়া হলে দ্বিতীয় চামচের জন্য তার আসক্তি বেড়ে যাবে।
২. অভ্যাস ও রুচির পরিবর্তন : ভোক্তার অভ্যাস ও রুচির পরিবর্তন হলে বিধিটি কার্যকর হবে না। যেমন- একজন মদ্যপায়ী যত বেশি মদ পায় তত বেশি আসক্ত হয়ে পড়ে।
৩. সময়ের ব্যবধান : বিধিটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ দ্রব্যের বিভিন্ন একক ভোগের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বেশি হলে বিধিটি কার্যকর নাও হতে পারে। যেমন- ভোক্তা প্রথম কমলা খাওয়ার কয়েক ঘন্টা পর দ্বিতীয় কমলা খেলে তার প্রতি আসক্তি না কমে বাড়তেও পারে।
৪. শখের দ্রব্য : শখের দ্রব্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ বিধিটি কার্যকর হয় না। যেমন- ডাক টিকিট, পুরাতন মুদ্রা, কীর্তিমার মূর্তি ইত্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ বিধিটি কর্যকর হয় না।
৫. কৃপণের ক্ষেত্রে : কৃপণ যত বেশি সম্পদ অর্জন করে তার প্রতি কৃপণের আসক্তি আরও বেড়ে যায়।
৬. বিকল্প ও পরিপূরক দ্রব্য : কোন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ কোন সে দ্রব্যের ভোগের উপরই নির্ভর করে না, বরং বিকল্প ও পরিপূরক দ্রব্যের দামের উপরও নির্ভরশীল।
৭. আয় বৃদ্ধি : ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পেলে এ বিধির ব্যতিক্রম দেখা দেয়।
৮. অনুরুপের প্রভাব : অনুকরণপ্রিয় হয়ে ভোগের ইচ্ছা হলে এ বিধি কার্যকর হয় না। যেমন- মহিলারা অনুকরণের বশবর্তী হয়ে ভিন্ন ডিজাইনের অলংকার বানাতে চায় পুরানো থাকা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে অলংকারের প্রতি তাদের আসক্তি কমে না, বরং বাড়ে।
৯. আবেগের ক্ষেত্রে : অনেক সময় আবেগের বসবর্তী হয়ে কোন দ্রব্যের প্রতি ভোক্তর আসক্তি বেড়ে যায়। ফলে এ ক্ষেত্রে এ বিধি কার্যকর হয় না। যেমন- কোন প্রিয় শিল্পীর গানের ক্যাসেটের প্রতি মানুষের আসক্তি বাড়ে।
১০. প্রতিপত্তি সম্পন্ন দ্রব্য : সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি লাভের জন্য ভোক্তা যে দ্রব্য সংগ্রহ করে সেক্ষেত্রে এ বিধি প্রযোজ্য নাও হতে পারে।
১১. অন্যের মজুত : অনেক দ্রব্য আছে যাদের উপযোগ শুধু তার মজুতের উপর নির্ভর করে না, অন্যের মজুতের উপরও নির্ভর করে। যেমন- টেলিফোন গ্রাহকের সংখ্যা বাড়লে তা উপযোগ না কমে বেড়ে যায়।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির ব্যতিক্রম/সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণে তার গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ।

অনুশীলনী ৪.২

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যতিক্রমসহ আলোচনা কর।
বা
ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা কর? এ বিধির ব্যতিক্রমসমূহ উল্লেখ কর।

পাঠ ৩ : ভোক্তার উদ্বৃত্ত (Consumer's Surplus)

fwgKv

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির থেকে ভোক্তার উদ্বৃত্ত ধারণাটির উৎপত্তি। অর্থনীতিতে এ ধারণাটির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক গুরুত্ব রয়েছে। আমরা এ পাঠে ধারণাটির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক গুরুত্ব রয়েছে। আমরা এ পাঠে ধারণাটি সমালোচনাসহ আলোচনা করে তার গুরুত্ব তুলে ধরব। উল্লেখ্য যে, এ ধারণাটি নিরপেক্ষ রেখার মাধ্যমেও ব্যাখ্যা করা যায়। তবে এ পর্যায়ের ছাত্রদের জন্য সহজে বোধগম্য নয় বলে আমরা কেবলমাত্র চাহিদা রেখার মাধ্যমে তা ব্যাখ্যা করব।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ভোগ্য উদ্বৃত্ত সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ভোক্তার উদ্বৃত্ত পরিমাপ করতে পারবেন।

ধারণাটির মূল বক্তব্য : অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শালই মূলতঃ ভোক্তার উদ্বৃত্ত ধারণাটির প্রণেতা। তাঁর মতে, " ভোক্তা কোন দ্রব্যের কোন পরিমাণের জন্য উচ্চ দাম দিতে রাজী থাকে অথচ যে নিম্নদাম প্রদান করে অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে থাকে তাকেই ভোক্তার উদ্বৃত্ত বলে"। ক্রেতা কোন দ্রব্যের বিভিন্ন একক যে দামে ক্রয় করতে ইচ্ছুক এবং প্রকৃতপক্ষে যে দামে ক্রয় করে, এ দু'য়ের পার্থক্য হল ভোক্তার উদ্বৃত্ত। কোন দ্রব্যের জন্য ভোক্তা যে দাম দিতে রাজী তা হলো ক্রেতার চাহিদা দাম। আর প্রকৃত পক্ষে সে যে দাম দেয় তা হলো বাজার দাম। এ দু'য়ের পার্থক্য হলে ভোক্তার উদ্বৃত্ত।

ভোক্তার উদ্বৃত্ত ধারণাটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির উপর নির্ভরশীল। চাহিদা রেখার প্রান্তিক উপযোগভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে জানি যে, প্রান্তিক উপযোগ ও বাজার দাম সমান, কোন দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে তার প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায় এবং তা অবশেষে দামের সমান হয়। এ কারণে ভোক্তা দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে যাবে যতক্ষণ না প্রান্তিক উপযোগ দামের সমান হয় এবং যে এককে দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হবে তার পূর্ববর্তী একক সমূহ হতে যে উদ্বৃত্ত উপযোগ ভোক্তা লাভ করে তা-ই তার উদ্বৃত্ত।

ভোক্তার উদ্বৃত্ত ধারণাটি নিম্নোক্ত সূচীর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হলো:-

দ্রব্যের পরিমাণ	চাহিদা দাম	বাজার দাম	ভোক্তার উদ্বৃত্ত
১ম একক	১২ টাকা	৮ টাকা	৪ টাকা
২য় একক	১০ টাকা	৮ টাকা	২ টাকা
৩য় একক	৮ টাকা	৮ টাকা	০ টাকা
মোট= ৩ একক	৩০ টাকা	২৪ টাকা	৬ টাকা

উপরের সূচীটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভোক্তা ১২টাকা দামে ১ একক, ১০ টাকা দামে ২ একক এবং ৮ টাকা দামে ৩ একক দ্রব্য কিনতে ইচ্ছুক। সুতরাং ৩ এককের জন্য সে সর্বোচ্চ ৩০ টাকা দিতে ইচ্ছুক। যদি বাজার দাম ৮ টাকা হয় এবং ভোক্তা এ দামে ৩ একক দ্রব্য কিনে তাহলে তার মোট খরচ হয় ২৪ টাকা। সুতরাং ভোক্তার উদ্বৃত্তের পরিমাণ হবে (৩০-২৪) টাকা বা ৬ টাকা।

ভোক্তার উদ্বৃত্ত ধারণাটি নিম্নোক্ত চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা হলো:

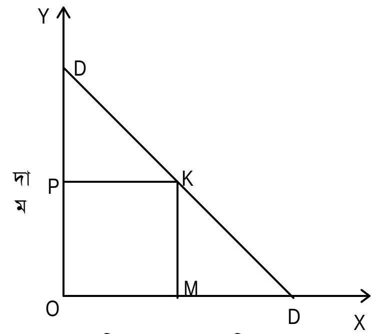

চিত্র ৪.৩ দ্রব্যের পরিমাণ

চিত্র ৪.৩ এ OX অক্ষে দ্রব্যের পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম দেখানো হলো। DD ভোক্তার চাহিদা রেখা। ভোক্তা OP দামে OM পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করে এবং এর জন্য তার খরচ হয় OPKM ক্ষেত্রের সমান। অথচ সে OM পরিমাণ দ্রব্যের জন্য খরচ করতে রাজী ODKM ক্ষেত্রের সমান। এমতাবস্থায় ভোক্তার উদ্বৃত্তের পরিমাণ হল DPK ক্ষেত্রের সমান।

সমালোচনা: ভোক্তার উদ্বৃত্ত ধারণাটি নিম্নোক্ত কতিপয় সমালোচনার সম্মুখীন :

১. ভোক্তার উদ্বৃত্ত অর্থের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য নয়
২. এ তত্ত্বে ধরে নেয়া হয়েছে অর্থের প্রান্তিক উপযোগ স্থির যা সঠিক নয়।
৩. ব্যক্তিগত চাহিদা দাম নিতান্তই কাল্পনিক বিষয়।
৪. এ তত্ত্ব ব্যক্তির ভোগ উদ্বৃত্ত পরিমাপ করতে পারলেও গোটা সমাজের জন্য পারে না।
৫. অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য মানুষ যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত বলে সেক্ষেত্রে ভোক্তার উদ্বৃত্ত অপরিসীম।
৬. বিলাস ও জাঁকজমকপূর্ণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে এ বিধি কার্যকর নয়।
৭. পরিবর্তক ও পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোক্তার উদ্বৃত্ত পরিমাপ করা অসুবিধাজনক। কেননা তাদের ভোগ নিজের দাম ছাড়াও অন্যের দামের উপর নির্ভরশীল।

ভোক্তার উদ্বৃত্ত ধানণাটির গুরুত্ব

ভোক্তার উদ্বৃত্ত ধারণাটির কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক গুরুত্ব রয়েছে।

১. ব্যবহারিক ও বিনিময় মূল্য সম্পর্কে ধারণা : ভোক্তার উদ্বৃত্ত ধারণাটি কোন দ্রব্যের ভোগোদ্বৃত্ত না থাকলে তার ব্যবহারিক ও বিনিময় মূল্য পরস্পর সমান হয়। ভোগোদ্বৃত্ত বেশি হলে দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য বিনিময় মূল্যের চেয়ে বেশি হয়।

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ নির্ধারণ : এ তত্ত্বের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ নির্ধারণ করা যায়। অর্থাৎ কোন দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হতে লাভ পাচ্ছে কিনা তা এ ধারণার মাধ্যমে জানা যায়।

৩. একচেটিয়া কারবারীর নিকট গুরুত্ব : একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যমূল্য নির্ধারণে ভোক্তার উদ্বৃত্ত ধারণাটির গুরুত্ব রয়েছে। ভোক্তার নিকট যে পরিমাপ উদ্বৃত্ত রয়েছে একচেটিয়া কারবারী দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে সর্বাধিক সে পরিমাণ উদ্বৃত্ত আদায় করে নিতে পারে। এ বিষয়টি বিবেচনা করে সে তার দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করতে পারে।

৪. কর আরোপের ক্ষেত্রে : কর আরোপের ক্ষেত্রে এ ধারণাটির গুরুত্ব অপরিসীম, পরোক্ষ কর আরোপের ফলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় আর ভোক্তার উদ্বৃত্ত হ্রাস পায়। তাই এ ধরনের কর আরোপের সময় সরকারকে খেয়াল রাখতে হবে যেন সরকারের রাজস্ব যে হারে বাড়ে ভোক্তার উদ্বৃত্ত সে হারে না কমে।

৫. ভতুর্কির ক্ষেত্রে : অনেক সময় অধিক খরচে উৎপাদিত ক্রেতারা যাতে কম দামে ক্রয় করতে পারে সে জন্য সরকার উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকে ভর্তুকি প্রদান করে। ভর্তুকি প্রদানের ফলে ভোক্তার উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়। যেসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে সৃষ্ট ভোক্তার উদ্বৃত্তের পরিমাণ ভর্তুকির চেয়ে বেশি হয় সে দ্রব্যের উৎপাদককে ভর্তুকি দেয়া বাঞ্ছনীয়।

৬. প্রকৃত আয় নির্ধারণে : অর্থনীতিতে সাধারণ মূল্যস্তর বেশি হলে ভোক্তার উদ্বৃত্ত কম হয় এবং জনসাধারণের প্রকৃত আয় এবং জীবনযাত্রার মান কম হয়। আবার মূল্যস্তর কম হলে ভোক্তার উদ্বৃত্ত বেশি হয় এবং জীবনযাত্রার মানও বেশি হয়।

৭. জনকল্যাণমূলক ব্যয়ের ক্ষেত্রে এ বিবরণটির গুরুত্ব রয়েছে। এ ধরনের ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ভোক্তার উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায়।

অনুশীলনী ৪.৩

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ভোক্তার উদ্বৃত্ত ধারণাটি সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা কর। এ বিধির গুরুত্ব আলোচনা কর।

পাঠ ৪ ঃ ভোক্তার ভারসাম্য

f wg Kv

ভোক্তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সীমিত আয়ের মাধ্যমে ভোগকৃত দ্রব্যাদি থেকে সর্বাধিক সম্ভব উপযোগ লাভ করা বা ভারসাম্যে পৌঁছা। সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির মাধ্যমে ভোক্তার ভারসাম্য নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ ভারসাম্য নির্ধারণের ভিন্নতর বিশ্লেষণও রয়েছে যা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হবে। আমরা এ পাঠে সমপ্রান্তিক বিধি আলোচনা করে ভোক্তার ভারসাম্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করব। এছাড়া এ বিধির দুর্বলতার দিকও তুলে ধরব। অবশ্য এ বিধির মাধ্যমে কোন দ্রব্যের চাহিদা রেখাও অঙ্কন করা যায়। তবে এ আলোচনা উচ্চতর পর্যায়ের।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- সমপ্রান্তিক নিয়োগ বিধিটি বর্ণনা করতে পারবেন।

সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি (Law of Equi-Marginal Utility)

সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি এবং ভোক্তার ভারসাম্য নির্ধারণ প্রান্তিক উপযোগ বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। একজন ভোক্তার আয় সীমিত যা দিয়ে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সে কিভাবে তার সীমিত আয় বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার মধ্যে বন্টন করবে যাতে তার প্রান্তিক উপযোগ সর্বোচ্চ হবে। এপ্রশ্নের জবাব সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির মাধ্যমে জানা যায়। প্রথমে আমরা ধরে নেব ভোক্তা যুক্তিশীল আচরণ করে। সমপ্রাান্তিক উপযোগ বিধি অনুযায়ী ভোক্তাকে সর্বাধিক সম্ভব তৃপ্তি অর্জনের জন্য তার সীমিত আয় বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার মধ্যে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে অর্থের শেষ একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ (অর্থের প্রান্তিক উপযোগ) প্রত্যেক দ্রব্যের জন্য সমান হয়। অন্যান্য ভোক্তা তখনই ভারসাম্যে পৌঁছবে যখন বিভিন্ন দ্রব্যের উপর অর্থ এবং অর্থের প্রান্তিক উপযোগ (MU_M) পরস্পর সমান হয়। উল্লেখ্য, এ বিশ্লেষণে অর্থের প্রান্তিক উপযোগ স্থির হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে।

ভোক্তার ভারসাম্য শর্তটি নিচের সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়।

$$\frac{\text{১ম দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{১ম দ্রব্যের দাম}} = \frac{\text{২য় দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{২য় দ্রব্যের দাম}} \ldots\ldots = \frac{n\text{তম দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}}{n\text{তম দ্রব্যের দাম}} = \text{অর্থের প্রান্তিক উপযোগ}$$

মনে করি, একজন ভোক্তা তার সীমিত আয় X এবং Y এদুটি দ্রব্যের উপর ব্যয় করে সর্বাধিক সম্ভব উপযোগ লাভ করতে চায়। দ্রব্য দু'টির দাম যথাক্রমে Px এবং Py। এমতবস্থায় উপযোগ সর্বোচ্চকরণের জন্য X ও Y এর ভোগের পরিমাণ এমন হবে যেখানে নিম্নোক্ত শর্তটি পূরণ হয় ঃ $\frac{MUx}{Px} = \frac{MUy}{Py} = MUm.$

এখানে MU_x হল X এর প্রান্তিক উপযোগ এবং MU_y হল y এর প্রান্তিক উপযোগ।

$\frac{MUx}{Px} = \frac{MUy}{Py}$ না হলে ভোক্তা সর্বোচ্চ তৃপ্তি পাবে না অর্থাৎ ভারসাম্য অর্জন করবে না। ধরি $\frac{MUx}{Px} > \frac{MUy}{Py}$, এমতাবস্থায় ভোক্তাকে ভারসাম্যে পৌঁছতে হলে Y কমিয়ে X বেশি কিনতে হবে। ফলে MU_x কমে এবং $\frac{MUx}{Px}$ কমে যাবে। অন্যদিকে MU_y বৃদ্ধি পেয়ে $\frac{MUy}{Py}$ বেড়ে

যাবে। ভোক্তা এ প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া ততক্ষণ চালাবে যতক্ষণ পর্যন্ত $\frac{MUx}{Px} = \frac{MUy}{Py}$ হয়। উল্লেখ্য Px এবং Py স্থির।

সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধিটি নিম্মোক্ত সূচীর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ

সূচী ৪.৪

দ্রব্যের একক	X এর প্রান্তিক উপযোগ (MU_x)	Y এর প্রান্তিক উপযোগ (MU_y)	$\frac{MU_x}{p_x}$	$\frac{MU_y}{p_y}$
১	৪০	৪৮	১০	৮
২	৩৬	৪২	৯	৭
৩	৩২	৩৬	৮	৬
৪	২৮	৩০	৭	৫
৫	২৪	১৮	৬	৩
৬	২০	৬	৫	১

বিশেষ দ্রষ্টব্য: p_x = ৪ টাকা, p_y = ৬ টাকা এবং অর্থের প্রান্তিক উপযোগ ৬ ধরে।

উপরোক্ত সূচী থেকে এটা পরিষ্কার যে, ভোক্তা ৫ একক X এবং ৩ একক Y ক্রয় করলে $\frac{MUx}{Px} = \frac{MUy}{Py} = MUm$. অর্থাৎ ভোক্তা ৫ একক X এবং ৩ একক Y ক্রয় করলে তার উপযোগ সর্বাধিক হবে। এ অবস্থায় তার নির্দিষ্ট ব্যয়িত অর্থ (৫ × ৪) + (৩ × ৬) টাকা = ৩৮ টাকা।

নিম্নের চিত্রের সাহায্যে ভোক্তার ভারসাম্য প্রদর্শিত হলো:

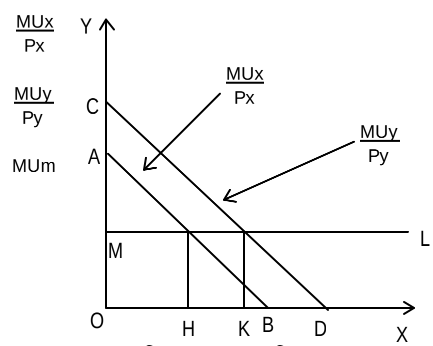

চিত্র ৪.৩ দ্রব্যের পরিমাণ

চিত্র ৪.৪ এ ভূমি অক্ষে দ্রব্যদ্বয় এবং লম্ব অক্ষে $\frac{MUx}{Px}, \frac{MUy}{Py} = MUm$ নির্দেশিতহল। যেহেতু X ও Y দ্রব্যদ্বয়ের প্রান্তিক উপযোগ রেখাদ্বয় ডানদিকে নিম্নগামী সেহেতু $\frac{MUx}{Px}$ ও $\frac{MUy}{Py}$ রেখাদ্বয়ও অনুরূপ। চিত্রে রেখাদ্বয় যথাক্রমে AB এবং CD।

মনে করি অর্থের প্রান্তিক উপযোগ (MUm) OM স্তরে স্থির যা ML রেখা দ্বারা নির্দেশ করা হয়। ভোক্তা যখন OH পরিমাণ X এবং OK পরিমাণ Y দ্রব্য ক্রয় করে তখন $\frac{MUx}{Px} = \frac{MUy}{Py} = MUm$ । সুতরাং নিদিষ্ট আয় এবং দ্রব্যদ্বয়ের দেয় দামস্তরে ভোক্তা OH পরিমাণ X এবং OK পরিমাণ Y দ্রব্য ক্রয় করে ভারসাম্য অর্জন করে।

এ বিধিটি কতিপয় অনুমানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এ অনুমিতিসমূহ হলো :

(১) ভোক্তা যুক্তিশীল আচরণ করে এবং সর্বাধিক তৃপ্তি অর্জন করতে চায়; (২) ক্রেতার আয় বা ক্রয় ক্ষমতা সীমিত; (৩) উপযোগ পরিমাপ যোগ্য; (৪) দ্রব্যসমূহের উপযোগ পরস্পর নির্ভরশীল; (৫) অর্থের প্রান্তিক উপযোগ স্থির। কিন্তু দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান; (৬) ভোক্তার অভ্যাস বা রুচি অপরিবর্তনীয়; (৭) দ্রব্যের দাম সম্পর্কে ভোক্তা সম্পূর্ণ জ্ঞাত।

উপরোক্ত অনুমিতিসমূহ কার্যকর থাকলেই এ বিধি কার্যকর হবে।

সমালোচনা

১. অনেক দ্রব্য আছে যেগুলোকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এককে বিভাজন করা যায় না। ফলে এ বিধির কার্যকারিতা সীমিত হয়ে পড়ে।

২. এ বিধিটি ভোক্তার যুক্তিশীল আচরণের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ভোক্তা আবেগ, অনুকরণপ্রিয়তা, বাজার সম্পর্কে অজ্ঞতা, বিজ্ঞাপনের হটকারিতা ইত্যাদি দ্বারা প্রতারিত হয়। ফলে এ বিধির প্রয়োগ সীমিত হয়ে পড়ে।

৩. উপযোগ একটি মানসিক বিষয় তাই তা পরিমাপ যোগ্য নয়। কাজেই এ অনুমানটি সঠিক নয়।

৪. 'অর্থের প্রান্তিক উপযোগ স্থির' অনুমানটি সঠিক নয়। এ ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর।

৫. এ তত্ত্বে দ্রব্যসমূহের উপযোগ পরস্পর স্বাধীন বলে বিবেচনা করা হয়েছে। এটা ঠিক নয়। বাস্তবে একটি দ্রব্যের উপযোগ অন্য দ্রব্যের ভোগের উপরও নির্ভরশীল।

৬. এ তত্ত্ব বিশ্লেষণে একাধিক দ্রব্য বিবেচনা করলেও মূলতঃ তা এক দ্রব্য মডেল।

এ তত্ত্বের নানা সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও তা ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণ তথা ভোক্তার ভারসাম্য নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুমানের শৈথল্যের মাধ্যমে আমরা চাহিদা সম্পর্কীয় তাৎপর্যপূর্ণ দিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অবশ্য এ পর্যায়ে তা আলোচনা পাঠকের জন্য তেমনটা সহজে বোধগম্য হওয়ার কথা নয়।

অনুশীলনী ৪.৪

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধিটি সমালোচনা সহকারে আলোচনা কর।

২. সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির মাধ্যমে ভোক্তার ভারসাম্য ব্যাখ্যা কর। এ বিধির সমালোচনাসহ আলোচনা কর।

পাঠ ৫ : নিরপেক্ষ রেখা বিশ্লেষণ

f wg Kv

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণের দুটো এ্যাপ্রোচের কথা : প্রান্তিক উপযোগ বিশ্লেষণ ও নিরপেক্ষ রেখা বিশ্লেষণ। পূর্বোক্ত পাঠসমূহের আমরা প্রথমোক্ত প্রক্রিয়ার নানা ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরেছি। নিরপেক্ষ রেখা বিশ্লেষণ এসব ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে মুক্ত এবং তা প্রথমোক্ত প্রক্রিয়া থেকে উন্নততর। আমরা এ পাঠে নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব। পরবর্তী পাঠে নিরপেক্ষ রেখা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভোক্তা কিভাবে ভারসাম্য অর্জন করে তা আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- নিরপেক্ষ রেখা বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

নিরপেক্ষ রেখা (Indifference Curve)

নিরপেক্ষ রেখা হচ্ছে দুটি দ্রব্যের বিভিন্ন সমাহারের সঞ্চার পথ যেগুলো ভোক্তাকে একই উপযোগ প্রদান করে। উল্লেখ্য, এখানে একই পরিমাণ উপযোগের কথা বলা হয়েছে, তবে পরিমাণ কত তা বলা হয়নি। যে সকল দ্রব্য সমাহার ভোক্তাকে সমান উপযোগ প্রদান করে সেগুলোকে স্থানাংক সমতলে জ্যামিতিকভাবে প্রকাশ করে নিরপেক্ষ রেখা পাওয়া যায়।
স্থানাঙ্ক সমতলে বিভিন্ন উপযোগস্তর নির্দেশক অসংখ্য নিরপেক্ষ রেখা কল্পনা করা যায়। এদের সম্মিলিত নাম নিরপেক্ষ মানচিত্র (Indifference Map)। ভোক্তার পছন্দ ও রুচির সামগ্রীর প্রতিফলন হচ্ছে নিরপেক্ষ মানচিত্র। কোন বিশেষ নিরপেক্ষ রেখার নয়। উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখার সমাহারগুলো উচ্চতর উপযোগ প্রকাশ করে, তবে কতটুকু বেশি তা প্রকাশ করে না। সঙ্গত কারণে ভোক্তার কাছে উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখার সমাহারই অধিক পছন্দনীয়।

চিত্র ৪.৫

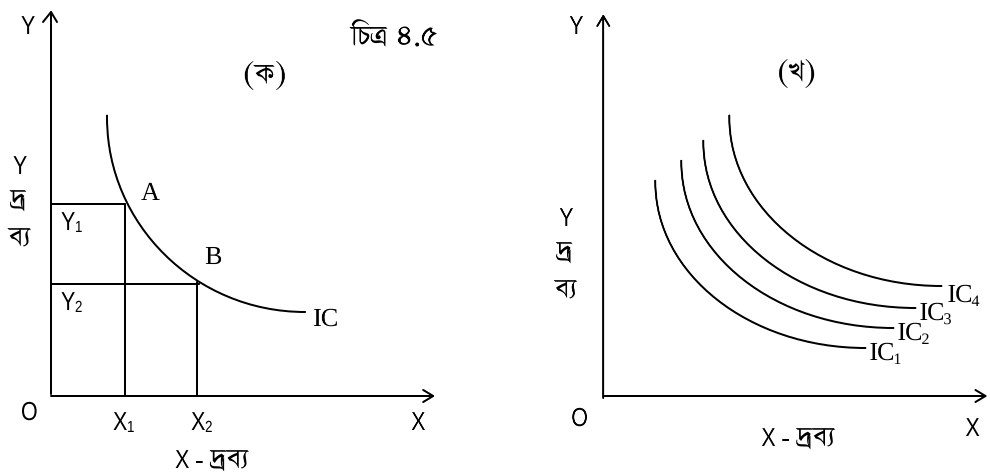

উপরের চিত্রে ভূমি অক্ষে X দ্রব্য এবং লম্ব অক্ষে Y দ্রব্য নির্দেশিত হলো। ক অংশে IC একটি নিরপেক্ষ রেখা এবং খ অংশে নিরপেক্ষ মানচিত্র দেখানো হলো। IC রেখার সকল বিন্দুতেই উপযোগ একই। যেমন- A বিন্দুতে সমাহার (X_1, Y_1) এবং B বিন্দুতে সমাহার (X_2, Y_2) একই উপযোগ নির্দেশ করে। উল্লেখ্য, ভোক্তা A বিন্দু থেকে B বিন্দুতে আসলে অধিক পরিমাণ X এর জন্য কিছু পরিমাণ Y ছেড়ে দেয়। ফলে উপযোগের পরিমাণ স্থির থাকে। অর্থাৎ Y ছেড়ে দেয়ার জন্য যে উপযোগ কমে তা X অধিক ভোগের জন্য প্রাপ্ত অতিরিক্ত উপযোগের সমান।

এই নিরপেক্ষ রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে নির্দেশিত দ্রব্য সমাহারগুলো ভোক্তাকে একই উপযোগ দেয়। ফলে প্রতিটি বিন্দুর প্রতি সে নিরপেক্ষ থাকে।
খ অংশে একটি নিরপেক্ষ মানচিত্র (আংশিক) প্রদর্শিত হয়েছে যেখানে উচ্চতম নিরপেক্ষ রেখা উচ্চতর উপযোগ প্রকাশ করছে।

নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্য

১. নিরপেক্ষ রেখা ডানদিকে নিম্নগামী। অর্থাৎ নিরপেক্ষ রেখার ঢাল ঋণাত্মক। ভোক্তার উপযোগ স্থির থাকার জন্য একটি দ্রব্যের (ধরি X) ভোগের পরিমাণ বাড়লে অন্যটির (Y দ্রব্যের) ভোগের পরিমাণ কমে।

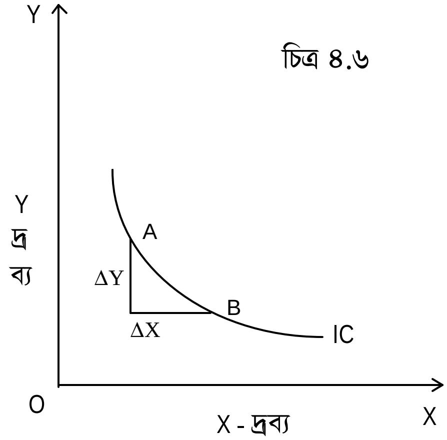

চিত্র ৪.৬

চিত্র ৪.৬-এ দেখা যাচ্ছে ভোক্তা A বিন্দু থেকে B বিন্দুতে আসলে ΔY পরিমাণ Y ছেড়ে ΔX পরিমাণ বেশি X ভোগ করে ফলে তার প্রাপ্ত উপযোগ তাই থাকে। নিরপেক্ষ রেখার ঢাল =

$\frac{\Delta Y}{\Delta X} = MRSyx$(প্রতিস্থাপনের প্রান্তিক হার)।

X-দ্রব্যের জন্য Y- দ্রব্যের প্রতিস্থাপনের প্রান্তিক হার (MRSyx) বলতে আমরা বুঝি অতিরিক্ত এক একক X-দ্রব্য পাওয়ার জন্য ভোক্তা কত একক Y-দ্রব্য ছাড়তে রাজী আছে যাতে উপযোগ স্তর একই থাকে, অর্থাৎ ভোক্তা একই নিরপেক্ষ রেখায় থাকে।

২. নিরপেক্ষ রেখা শুধু ডানদিকে নিম্নগামী-ই নয়, ইহা মূল বিন্দুর দিকেও উত্তল, এর অর্থ নিরপেক্ষ রেখা বরাবরে বাম থেকে ডান দিকে নামলে তার ঢাল (পরম) কমে যায়, অর্থাৎ দ্রব্য প্রতিস্থাপনের প্রান্তিক হার ক্রমহ্রাসমান।

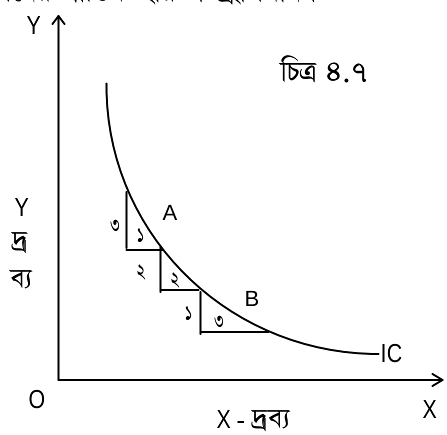

চিত্র ৪.৭

চিত্র ৪.৭ এ দেখা যাচ্ছে প্রতি একক অতিরিক্ত X এর জন্য ভোক্তা ক্রমান্বয়ে কম পরিমাণ Y ছাড়তে প্রস্তুত। অর্থাৎ MRSyx ক্রমহ্রাসমান।

৩. উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখা উচ্চতর উপযোগ প্রকাশ করে। নিম্নের চিত্রে $1C_2$ এর প্রতিটি সমন্বয়ই $1C_1$ এর প্রতিটি সমন্বয় থেকে উচ্চতর উপযোগ প্রকাশ করছে।

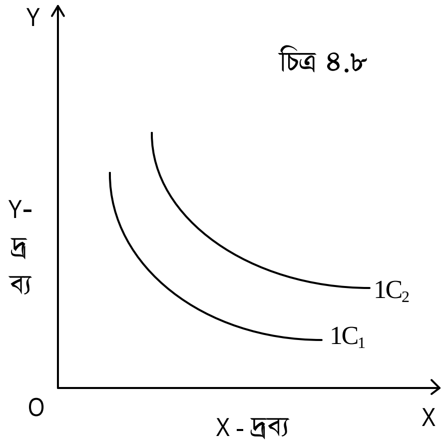

চিত্র ৪.৮

৪. নিরপেক্ষ রেখাসমূহ পরস্পরকে ছেদ করতে পারে না। চিত্র ৪.৯ এর ঘটনাটি কখনও হতে পারে না।

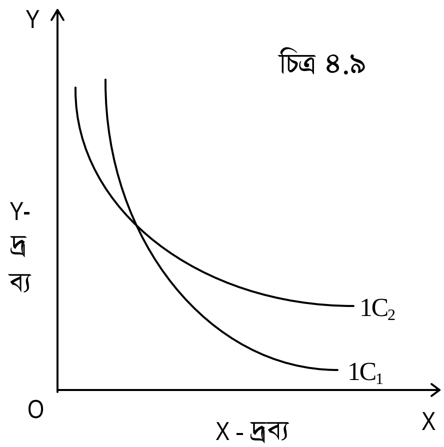

চিত্র ৪.৯

অনুশীলনী ৪.৫

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. নিরপেক্ষ রেখা বলতে কি বুঝ? নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

২. নিরপেক্ষ রেখা ও নিরপেক্ষ মানচিত্রের পার্থক্য নির্দেশ কর।

৩. প্রতিস্থাপনের প্রান্তিক হার কি? এ হার ক্রমহ্রাসমান চিত্রের সাহায্যে উল্লেখ কর।

পাঠ ৬ : নিরপেক্ষ রেখা বিশ্লেষণ ও ভোক্তার ভারসাম্য

একজন যুক্তিশীল ভোক্তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বাধিক সম্ভব তৃপ্তি লাভ। ভোক্তার সাধ উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় উঠা। কিন্তু সে ইচ্ছা করলেই উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় উঠতে পারে না। কেননা তার এ সাধ সাধ্য দ্বারা সীমিত, দ্রব্যের দেয় দাম ও সীমিত আয়ে তাকে একটি বাজেট সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হতে হয়। এ সীমাবদ্ধতার আলোকে তাকে উপযোগ সর্বোচ্চ করতে হয়। অর্থাৎ ভোক্তাকে একটি বাজেট রেখা বরাবরে সর্বোচ্চ তৃপ্তিদায়ক দ্রব্য সমাহারটি নির্বাচন করতে হয়।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- নিরপেক্ষ রেখা বিশ্লেষণের সাহায্যের ভোক্তার ভারসাম্য অর্জন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

বাজেট রেখা বা দাম রেখা (Budget line or Price line) :

মনে করি ভোক্তা তার মাসিক আয় ১০০ টাকা X ও Y দুটি দ্রব্যের উপর ব্যয় করে। ধরি X-দ্রব্যের দাম ২০ টাকা এবং Y দ্রব্যের দাম ১০ টাকা। প্রদত্ত দাম ও আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভোক্তা যে সকল সমাহার ক্রয় করতে পারেন তার কয়েকটি নিচের সূচীতে উল্লেখ করা হলো :

(X)-দ্রব্যের পরিমাণ	(X)-দ্রব্যের জন্য খরচ	অবশিষ্ট আয়	(Y)- দ্রব্যের পরিমাণ	সমাহার (X-দ্রব্য, Y-দ্রব্য)
০	০	১০০	১০	M (০,১০)
১	২০	৮০	৮	A (১,৮)
৩	৬০	৪০	৪	B (৩,৪)
৫	১০০	০	০	N (৫,০)

সূচীতে দেখানো সমাহার গুলি ছাড়াও আরো অনেক সমাহার কিনতে ভোক্তা সমর্থ। চিত্র ৪.১০ এ MN রেখা দ্বারা সবগুলো সমাহার দেখানো হলো। MN রেখার উপর প্রত্যেক বিন্দু X ও Y দ্রব্যের একটি সমাহার নির্দেশ করছে। যেমন- A বিন্দুতে নির্দেশিত সমাহারে ১ একক X-দ্রব্য ও ৮ একক Y-দ্রব্য রয়েছে। B বিন্দুর সমাহারটিতে রয়েছে ৩ একক X-দ্রব্য ও ৪ একক Y-দ্রব্য। উল্লেখিত দামে ও আয়ে MN রেখার উপর প্রত্যেক বিন্দু নির্দেশিত সমাহার ভোক্তা ক্রয় করতে সমর্থ। এ রেখাকে বলা হয় বাজেট রেখা বা দাম রেখা। সুতরাং বাজেট রেখা হল দুটো দ্রব্যের বিভিন্ন সমাহারের সঞ্চারপথ যে সমাহারগুলো ভোক্তা দ্রব্যদ্বয়ের নিদিষ্ট দামে তার নির্দিষ্ট আয় দ্বারা কিনতে পারে। বাজেট রেখার উপরস্থিত সকল সমাহারই ভোক্তার নিকট একই খরচ সম্পন্ন এবং ভোক্তা সমাহারগুলো ক্রয় করতে সমর্থ। বাজেট রেখার নিচে অবস্থিত যে কোন সমাহারও ভোক্তা ক্রয় করতে পারে। তবে তাতে তার সকল অর্থ ব্যয় হয় না। অন্যদিকে বাজেট রেখার ডান দিকে অবস্থিত কোন সমাহারই ভোক্তা এ নির্দিষ্ট আয়ে ক্রয় করতে পারে না।

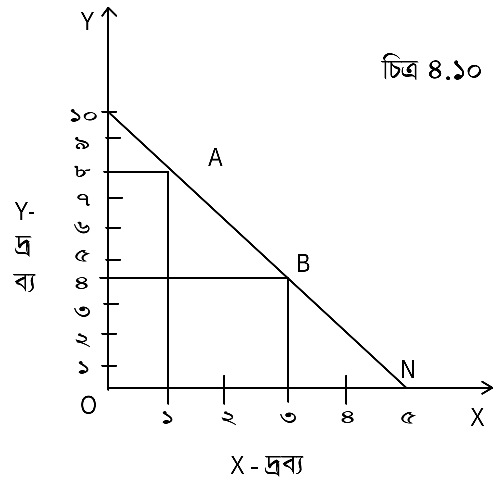

বাজেট রেখা ডানদিকে নিম্নগামী সরল রেখা। সকল বিন্দুতে এ রেখার ঢাল সমান। বাজেট রেখার ঢাল হল দ্রব্যদ্বয়ের দামের অনুপাত। অর্থাৎ বাজেট রেখার ঢাল = $\frac{OM}{ON} = \frac{P_y}{P_x}$।

যেখানে P_x = X দ্রব্যের দাম, P_y = Y দ্রব্যের দাম।

ভোক্তার ভারসাম্য (Consumer's Equilibrium)

এত আলোচনার পর এটা পরিষ্কার যে নিরপেক্ষ মানচিত্র ভোক্তার সাধ এবং বাজেট রেখা তার সাধ্যের প্রতিফলন ঘটায়। এ দুয়ের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ভোক্তার ভারসাম্য নির্ধারিত হয়। ভোক্তাকে এমন একটি সমাহার নির্বাচন করতে হবে যা তার বাজেট রেখায় অবস্থিত এবং যথা সম্ভব সর্বোচ্চ নিরপেক্ষ রেখায়ও অবস্থিত। নিচে চিত্র ৪.১১ এ ভোক্তার ভারসাম্য দেখানো হলো :

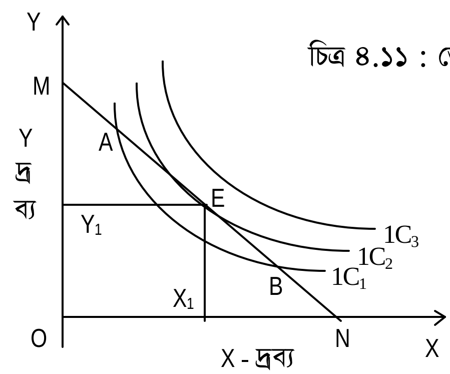

চিত্র ৪.১১ : ভোক্তার ভারসাম্য

চিত্রে OX অক্ষে X দ্রব্য এবং OY অক্ষে Y দ্রব্য প্রদর্শিত হলো। ভোক্তার বাজেট রেখা হলো MN। E বিন্দু নির্দেশিত সমাহারটি হলো ভোক্তার সর্বোচ্চ উপযোগ নির্দেশকারী সমাহার। কেননা উল্লেখিত বাজেট সীমাবদ্ধতায় উক্ত সমাহারটি ক্রয় করলে ভোক্তা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখা $1C_2$ তে উঠতে পারছে। এ অবস্থায় ভোক্তা OX_1 পরিমাণ X দ্রব্য এবং OY_1 পরিমাণ Y দ্রব্য ক্রয় করে সর্বাধিক সম্ভব উপযোগ পাচ্ছে। এ সমাহারটি একই সাথে বাজেট রেখা MN এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখা $1C_2$ তে অবস্থিত। বাজেট রেখাস্থ অন্য যে কোন সমাহার ক্রয় করলে ভোক্তা নিম্নতর নিরপেক্ষ রেখায় নেমে আসে। অর্থাৎ বাজেট রেখাস্থ E বিন্দুর সমাহার ছাড়া অন্য সকল সমাহারই কম উপযোগ নির্দেশকারী। যেমন ভোক্তা A বিন্দু নির্দেশিত সমাহারটি বা B বিন্দু নির্দেশিত সমাহারটি ভোক্তাকে $1C_2$ থেকে $1C_1$ এ

নিয়ে আসে। অর্থাৎ ভোক্তার উপযোগ কমে যায়। সুতরাং E বিন্দু নির্দেশিত সমাহারটি ভোক্তাকে সর্বোচ্চ উপযোগ প্রদানকারী সমাহার। অর্থাৎ E বিন্দু হল ভোক্তার ভারসাম্য বিন্দু।
লক্ষণীয় যে, ভারসাম্য বিন্দুতে বাজেট রেখা MN এবং নিরপেক্ষ রেখা $1C_2$ পরস্পরের স্পর্শক। অর্থাৎ এ বিন্দুতে বাজেট রেখার ঢাল $\frac{Px}{Py}$ এবং নিরপেক্ষ রেখার ঢাল MRS_{yx} পরস্পর সমান। সুতরাং ভারসাম্য বিন্দু এমন এক বিন্দু যেখানে দ্রব্যদ্বয়ের দামের অনুপাত ($^{Px}/_{Py}$) এবং প্রতিস্থাপনের প্রান্তিক হার (MRSyx) পরস্পর সমান। এছাড়া আয় একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো ভারসাম্য বিন্দুতে নিরপেক্ষ রেখাটি মূল বিন্দুর দিকে উত্তল।
ভারসাম্যের প্রথম শর্ত হচ্ছে, ভারসাম্য বিন্দুতে বাজেট রেখা ও নিরপেক্ষ রেখা পরস্পরকে স্পর্শ করে। অর্থাৎ উভয়ের ঢাল পরস্পর সমান। এটি হচ্ছে প্রয়োজনীয় শর্ত। আর দ্বিতীয় শর্ত হলো ভারসাম্য বিন্দুতে নিরপেক্ষ রেখাটি মুল বিন্দুর দিকে উতল। এটি হচ্ছে পর্যাপ্ত শর্ত।
নিরপেক্ষ রেখা বিশ্লেষণ আরও ব্যাপক। এ বিশ্লেষণের আরও অনেক দিক রয়েছে। তবে এ পার্থক্যের আলোচনায় এর বেশি তুলে ধরা সমীচিন হবে না।

অনুশীলনী ৪.৬

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ভারসাম্য কিভাবে অর্জিত হয় তা আলোচনা করুন।

চাহিদা

ইউনিট
৫

পাঠ ১ : চাহিদা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- চাহিদার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- চাহিদাবিধি বর্ণনা করতে পারবেন।

সংজ্ঞা

সাধারণতঃ কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে একজন ব্যক্তি কোন দ্রব্যের যে পরিমাণ দ্রব্য কিনতে প্রস্তুত থাকে তাকে ঐ দ্রব্যের চাহিদা বলে। এখানে "কিনতে প্রস্তুত থাকে" এর মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য লুকায়িত থাকে। প্রথমে ব্যক্তির ঐ দ্রব্যটি কিনার ইচ্ছা থাকতে হবে, দ্বিতীয়তঃ দ্রব্যটি কিনার জন্য তার হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ থাকতে হবে এবং সবশেষে তার ঐ টাকা ব্যয়ের ইচ্ছা থাকতে হবে। উদাহরণ : মনে করি, একজন ব্যক্তি আলু কিনার জন্য বাজারে গেল। বাজারে গিয়ে দেখল যে এক কেজি আলুর দাম ১০ টাকা এখন তার ২ কেজি আলু কিনার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে, তার পকেটে ২০ টাকা বা তার চেয়ে বেশী থাকতে হবে এবং ঐ টাকাটা খরচ করার ইচ্ছা থাকতে হবে। তবেই বলা যাবে ঐ ব্যক্তির আলুর চাহিদা হল ২ কেজি।

চাহিদা বিধি

আমরা চাহিদার যে সংজ্ঞা পড়লাম তাতে দেখতে পেলাম যে কোন দ্রব্যের চাহিদা প্রধানতঃ তার নিজস্ব দামের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ পণ্যের চাহিদা ও দামের মধ্যে একটা আপেক্ষিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এই সম্পর্ককে একটি নিয়মের মাধ্যমে প্রকাশই হল চাহিদা বিধি। বিধিটি হল : অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কোন দ্রব্যের নিজস্ব দাম বাড়লে তার চাহিদা কমে এবং কমলে তার চাহিদা বাড়ে। অর্থাৎ দ্রব্যের চাহিদা আর তার দামের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ একটি বাড়লে অন্যটি কমবে। যেমন : মনে করি এক কেজি আলুর দাম যখন ১০ টাকা তখন একজন ব্যক্তি ২ কেজি আলু ক্রয় করে। এখন যদি দাম বেড়ে ১১ টাকা হয়ে যায় তখন সে ২ কেজি না কিনে ১ কেজি ক্রয় করে। আর আলুর দাম যখন ৮ টাকা তখন সে ৪ কেজি আলু ক্রয় করে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, দাম যখন বেড়ে যায় তখন তার চাহিদা কমে যায়। আবার যখন দাম কমে যায় তখন তার চাহিদা বেড়ে যায়। অর্থাৎ আলুর দাম ও তার চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান, এটিই হল চাহিদা বিধি।

চাহিদা সূচী ও চাহিদা রেখা

কোন দ্রব্যের দাম ও চাহিদাকে পাশাপাশি রেখে যখন আমরা ছকে প্রকাশ করি তখন তাকে চাহিদাসূচী বলে। উপরের উদাহরণের দাম ও তার চাহিদাকে সূচীতে প্রকাশ করলে আমরা নিম্নের সূচী পাব :

আলুর দাম (টাকা)	আলুর পরিমাণ (কে.জি)
১৪	১
১০	২
৮	৪

এই চাহিদা সূচী যখন আমরা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করি তখন তাকে বলে চাহিদা রেখা। নিম্নের চিত্রে DD একটি চাহিদা রেখা।

OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম নির্দেশিত হয়েছে। আলুর দাম যখন ১৪ টাকা (OP_3) চাহিদার পরিমাণ সেখানে ১ কেজি। দাম যখন কমে ১০ টাকা (OP_2) বা ৮ (OP_1) টাকা হয় তখন তার চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে ২ কেজি ও ৪ কেজি হয়। এখন ১৪ টাকা দামে ১ কেজি আলু পাওয়া যায় তা Q বিন্দু দিয়ে প্রকাশ করা হল। একইভাবে ১০ টাকা দামে ২ কেজি আর ৮ টাকা দামে ৪ কেজি আলু পাওয়া যায় সেগুলো যথাক্রমে R ও S বিন্দু দ্বারা প্রদর্শিত হল। এখন Q, R ও S বিন্দু যোগ করে যে রেখা পাওয়া যাবে তাই আলুর চাহিদা রেখা DD।

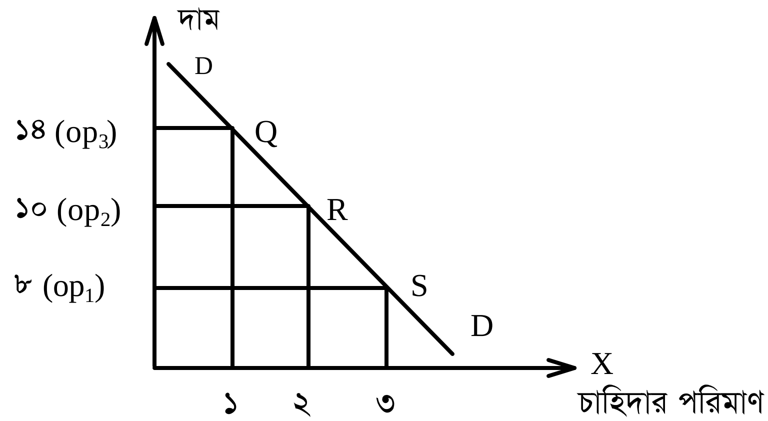

চিত্র : চাহিদা রেখা

অনুশীলনী ৫.১

নিম্নে কোন পরিবারের পেঁয়াজের চাহিদার ছক দেয়া আছে, পেঁয়াজের চাহিদা রেখাটি অঙ্কন কর।

পেঁয়াজের দাম/কেজি	পেঁয়াজের চাহিদা/মাস (কেজি)
২০	১৫
১৮	১৬
১৬	১৮
১৪	২০
১০	২২
৫	৩০

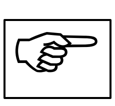

পাঠ ২ : চাহিদার নির্ধারকসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- চাহিদার নির্ধারক সমূহ বলতে পারবেন।
- পরিবর্তক ও পরিপূরক দ্রব্যের উদাহরণ দিতে পারবেন।

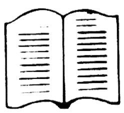

পূর্বের পাঠে আলোচনায় আমরা বলেছি যে, কোন দ্রব্যের চাহিদা তার দামের উপর নির্ভর করে। কিন্তু কোন দ্রব্যের চাহিদা শুধুমাত্র তার দামের উপর নির্ভর করে না বরং ভোক্তার আয়, রুচি, পছন্দ, অভ্যাস, অন্যান্য সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম ইত্যাদি উপাদানের উপর নির্ভর করে। সবগুলি উপাদানকে একসাথে বিবেচনা করলে চাহিদা অপেক্ষকটি দাঁড়ায় $Qx = f(Px, Y, T, C, Pr \text{ ....})$

এখানে $Qx = x$ দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ, $f =$ অপেক্ষক $Px = x$ দ্রব্যের দাম, $Pr =$ সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম, $C =$ ভোক্তার পছন্দ, $T =$ ভোক্তার রুচি পছন্দ, $Y =$ ভোক্তার আয়।

অতএব কোন দ্রব্যের চাহিদা তার দাম ছাড়াও অন্যান্য অনেক উপাদানের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা য়ায়, আমাদের উদাহরণের আলুর চাহিদা আলুর দামের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। এছাড়া যে ব্যক্তি আলু কিনতে যাবে তার আয় কেমন, তার রুচি, পছন্দ কেমন। আলুর সাথে সম্পর্কিত দ্রব্য, যেমন – ভাত/চাল এর দাম ইত্যাদির দ্বারাও আলু ক্রয়ের পরিমাণ প্রভাবিত হয়। যদি চালের দাম বেড়ে যায় তবে একজন ব্যক্তির চাল কিনার চাহিদা কমে যেতে পারে কারণ তখন সে অপেক্ষাকৃত কম দামের আলু কিনার জন্য আগ্রহী হবে এবং আলুর চাহিদা বাড়বে। অর্থাৎ চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় আলুর চাহিদা বেড়ে গেল। এভাবে সম্পর্কিত দ্রব্যের দামও কোন দ্রব্যের চাহিদাকে প্রভাবিত করে।

পরিবর্তক ও পরিপূরক দ্রব্য

আমরা দেখেছি যে, কোন দ্রব্যের চাহিদা সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম দ্বারাও প্রভাবিত হয়। সম্পর্কিত দ্রব্য আবার দুই প্রকারের হতে পারে : (১) পরিবর্তক দ্রব্য (২) পরিপূরক দ্রব্য।

পরিবর্তক দ্রব্য

যখন দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটিকে অপরটির পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়, তখন দ্রব্য দুটির একটিকে অপরটির পরিবর্তক দ্রব্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যেমন : মনে করি চিনির দাম যখন ২০ টাকা তখন একজন ব্যক্তি মাসে ২ কেজি গুড় ক্রয় করে। কিন্তু চিনির দাম বেড়ে ২৫ টাকা হয় তখন সে দুই কেজি গুড় ক্রয় না করে আরও বেশী গুড় ক্রয় করে (২.৫০) অর্থাৎ চিনির দাম বেড়ে যাওয়ায় ব্যক্তি কিছু চিনির পরিবর্তে কিছু গুড় ক্রয় করলো। অর্থাৎ গুড়কে চিনির পরিবর্তক হিসাবে ব্যবহার করল। তেমনি যদি আবার চিনির দাম ২০ টাকা থেকে কমে ১৫ টাকা হয় তবে ব্যক্তি হয়ত ২ কেজি গুড়ের চেয়ে কম গুড় ক্রয় করবে (১ কেজি)। চিনির দাম কমে যাওয়ায় সে একটু বেশী চিনি ক্রয় করবে। অর্থাৎ গুড়ের পরিবর্তে চিনি ক্রয় করবে। এখানে ভোক্তা চিনিকে গুড়ের পরিবর্তক হিসাবে ব্যবহার করল।

এখানে চিনি ও গুড় একে অপরের পরিবর্তক দ্রব্য। এখানে দেখা যাচ্ছে যে চিনির দামের সাথে গুড়ের চাহিদার সম্পর্ক ধনাত্মক। অর্থাৎ পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটি পণ্যের দাম ও অপরটির চাহিদার সম্পর্ক ধনাত্মক।

নিচের সারণীতে চিনির দাম ও গুড়ের চাহিদার সম্পর্ক দেখানো হলো :

চিনির দাম (টাকা)	গুড়ের চাহিদা (কেজি)

১৫	১ কেজি
২০	২ কেজি
২৫	২.৫০ কেজি

পরিপূরক দ্রব্য

যখন একটি দ্রব্যের ব্যবহারের জন্য অপর একটি দ্রব্যের ব্যবহার অত্যাবশ্যক হয় তখন দ্রব্য দুটির একটিকে অপরটির পরিপূরক বলে। যেমন : কালি ও কলমের কথা বলা যায়। কালি ছাড়া কলমের ব্যবহার করা যায় না, তেমনি আবার কলমের ব্যবহারের জন্য কালির ব্যবহার অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ কালির দামের সাথে কলমের সম্পর্ক রয়েছে।

নিচের সারণীতে কালির দামের সাথে কলমের চাহিদার সম্পর্ক তুলে ধরা হলো :

কালির দাম /বোতল	কলমের চাহিদা/মাস
৫	৩০
১০	২৫
১৫	২০
২০	১৫

উপরে কালি ও কলমের আড়াআড়ি চাহিদা সূচক দেয়া হল। এই চাহিদা সূচক থেকে দেখা যায় যে, কালির দাম ও কলমের চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক। অর্থাৎ পরিপূরক দ্রব্যের আড়াআড়ি চাহিদা ঋণাত্মক।

অনুশীলনী ৫.২

১. সম্পূর্ণ চাহিদা অপেক্ষকটি গাণিতিক ভাষায় লিখুন।

২. পরিবর্তক ও পরিপূরক দ্রব্যের মধ্যে তফাৎ বর্ণনা করুন।

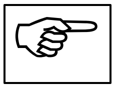

পাঠ ৩ : চাহিদার সংকোচন প্রসারণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- চাহিদার সংকোচন ও প্রসারণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

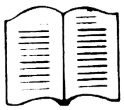

আমরা জানি যে, কোন দ্রব্যের চাহিদা তার দাম, ব্যক্তির আয়, রুচি, অভ্যাস, সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম ইত্যাদি অনেক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এখন এই সব উপাদানের মধ্যে অন্যান্য উপাদানকে স্থির ধরে যদি শুধুমাত্র দামের পরিবর্তন কোন দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন বিবেচনা করি, তখন তাকে বলে চাহিদার সংকোচন প্রসারণ। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদা যখন বাড়ে তখন তাকে বলে চাহিদার প্রসারণ। আবার অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দ্রব্যের দাম বাড়ার কারণে যখন তার চাহিদা কমে তখন তাকে বলে চাহিদার সংকোচন। চাহিদার প্রসারণ ব্যাখ্যার জন্য আমরা নীচের সূচীকে বিবেচনা করতে পারি।

আলুর দাম (টাকা)	আলুর চাহিদা (কেজি)
১০	৫
৮	৬

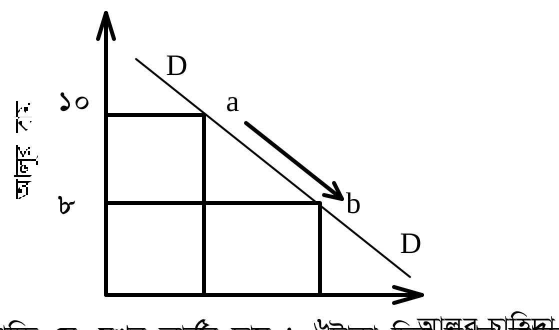

উপরোক্ত উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যখন আলুর দাম ১০টাকা ছিল তখন আলুর চাহিদা ছিল ৫ কেজি এবং এই সম্পর্ক চাহিদা রেখার a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত।

এখন আলুর দাম কমে ৮ টাকা হওয়ায় আলুর চাহিদা ৬ কেজি হল। এই সম্পর্ক চাহিদা রেখার b বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত। অর্থাৎ আলুর দাম কমে যাওয়ায় ভোক্তা চাহিদা রেখার a বিন্দু থেকে b বিন্দুতে অবস্থান পরিবর্তন করে এতে আলুর চাহিদার পরিমাণও বাড়ে একে বলে চাহিদার প্রসারণ।

অনুশীলনী ৫.৩.১

যখন আলুর দাম ৬ টাকা তখন কোন পরিবারের আলুর চাহিদা ১০ কেজি/মাস। এখন আলুর দাম ৪ টাকা হলে চাহিদার কি পরিবর্তন হবে চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

এখন চাহিদার সংকোচনের জন্য নিম্নোক্ত ছক বিবেচনা করা যাক –

আলুর দাম (টাকা)	আলুর চাহিদা (কেজি)
৮	৪
১২	৩

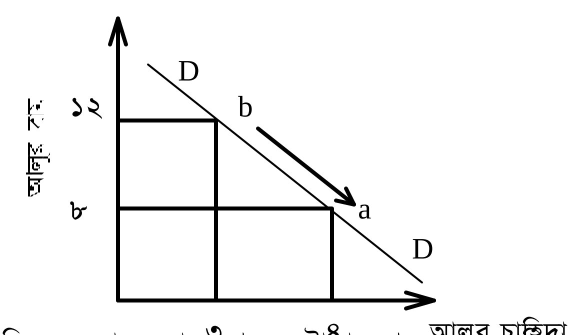

উপরোক্ত উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আলুর দাম যখন ৮ টাকা তখন আলুর চাহিদা ছিল ৪ কেজি এবং এই সম্পর্ক DD চাহিদা রেখার a বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত। এখন আলুর দাম

বেড়ে ১২ টাকা হওয়ায় আলুর চাহিদা কমে ৩ কেজি হল এবং এই সম্পর্ক চাহিদা রেখার b বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত অর্থাৎ আলুর দাম বেড়ে যাওয়ায় চাহিদা ৪ কেজি থেকে কমে ৩ কেজি হল এবং ভোক্তা a বিন্দু থেকে b বিন্দুতে স্থানান্তরিত হল। একে বলে চাহিদার সংকোচন।

অনুশীলনী ৫.৩.২

যখন শার্টের দাম ৬০০ টাকা তখন একজন ব্যক্তির শার্টের চাহিদা ৪টি। এখন যদি ১০০০ টাকা হয় তবে শার্টের চাহিদা কমে ৩টি হয়। এই পরিবর্তনকে চাহিদা রেখার মাধ্যমে দেখাও।

চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি

চাহিদার সংকোচন প্রসারণের ব্যাখ্যাতে দ্রব্যটির নিজস্ব দামের পরিবর্তনকে আমরা শুধু বিবেচনা করেছি এবং ভোক্তার আয়, রুচি, পছন্দ অন্যান্য সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম ইত্যাদি উপাদানগুলিকে আমরা স্থির ধরেছি। কিন্তু চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধির আলোচনায় আমরা দ্রব্যের নিজস্ব দামকে স্থির ধরে অন্যান্য উপাদানগুলিকে পরিবর্তনশীল বলে বিবেচনা করব।

চাহিদার বৃদ্ধি

এখন দ্রব্যটির দাম স্থির রেখে ভোক্তার আয় বাড়লে, রুচির অনুকূল পরিবর্তন হলে, পরিবর্তক দ্রব্যের দাম বাড়লে বা পরিপূরক দ্রব্যের দাম কমলে অর্থাৎ চাহিদার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে ভোক্তা দামের প্রতিটি স্থির অবস্থায় আগের চেয়ে বেশী দ্রব্য ক্রয় করবে। অর্থাৎ দামের প্রতিটি পূর্বাবস্থায় চাহিদার পরিমাণ বাড়বে এবং চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হবে। একে বলে চাহিদার বৃদ্ধি।

উদাহরণ : আয় বৃদ্ধির কারণে আলুর চাহিদা বৃদ্ধি

আলুর দাম	ব্যক্তির আয়	আলুর চাহিদা
১০	১৫০	১৫
১০	২০০	২০

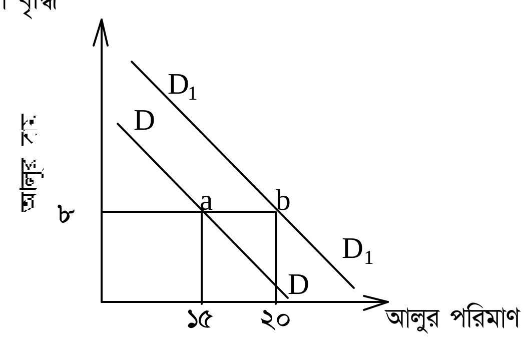

উপরোক্ত উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আলুর দাম ১০ টাকা থাকা অবস্থায় ভোক্তার আয় যখন ১৫০ টাকা তখন সে ১৫ কেজি আলু ক্রয় করত। এই সম্পর্কটি DD রেখার a বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত। এখন আলুর দাম ১০ টাকাতেই স্থির থাকা অবস্থায় যখন ব্যক্তির আয় বেড়ে ২০০ টাকা হল তখন আলুর চাহিদা বেড়ে ২০ কেজি হল। এতে চাহিদা রেখা স্থানান্তরিত হয়ে D_1D_1 হল। এখন এই সম্পর্কটি নতুন চাহিদা রেখা D_1D_1 এর b বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত। আলুর দাম স্থির (১০) থাকাবস্থায় আয় বৃদ্ধির কারণে a বিন্দু থেকে b বিন্দুতে চাহিদার পরিমাণ বেশী হয়। একেই বলে চাহিদার বৃদ্ধি।

অনুশীলনী ৫.৩.৩

চিনির চাহিদা গুড়ের দাম দ্বারা প্রভাবিত হয়। চিনির দাম ৪০ টাকা স্থির অবস্থায় গুড়ের দাম যখন ২০ টাকা তখন চিনির চাহিদা হয় ৩ একক। আর গুড়ের দাম যখন ৩০ টাকা তখন চিনির চাহিদা হয় ৪ একক। চিত্রের মাধ্যমে চিনির এই চাহিদা বৃদ্ধিকে ব্যাখ্যা কর।

চাহিদার হ্রাস

অন্যদিকে দ্রব্যের দাম স্থির থেকে ভোক্তার আয় কমলে, রুচির প্রতিকূল পরিবর্তন হলে, পরিবর্তক দ্রব্যের দাম কমলে বা পরিপূরক দ্রব্যের দাম বাড়লে অর্থাৎ চাহিদার প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে ভোক্তা দামের প্রতিটি স্থির অবস্থায় আগের চেয়ে কম দ্রব্য ক্রয় করবে। অর্থাৎ দামের প্রতিটি পূর্বাবস্থায় চাহিদার পরিমাণ কমবে এবং চাহিদা রেখা বামদিকে স্থানান্তরিত হবে। একেই বলে চাহিদার হ্রাস।

উদাহরণ : আয় হ্রাসের ফলে আলুর চাহিদা হ্রাস

আলুর দাম	ব্যক্তির আয়	আলুর চাহিদা
১০	১০০	৫
১০	৫০	৩

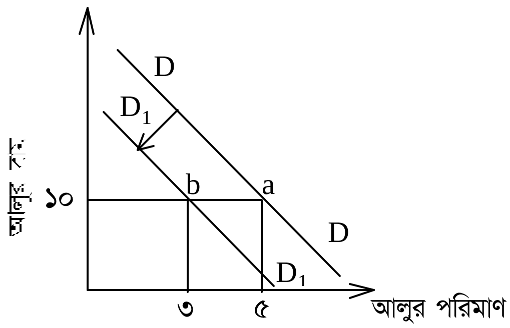

উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আলুর দাম ১০ টাকা স্থির থাকাবস্থায় ব্যক্তির আয় যখন ১০০ টাকা তখন ব্যক্তির আলুর চাহিদা ছিল ৫ কেজি যা চাহিদা রেখার a বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত। এখন আলুর দাম ১০ টাকাতেই স্থির থাকা অবস্থায় ব্যক্তির আয় যখন কমে ১০০ টাকা থেকে ৫০ টাকা হল তখন ব্যক্তি আলুর চাহিদা কমিয়ে ৩ কেজি করল। এতে চাহিদা রেখা বামে স্থানান্তরিত হল এবং এই সম্পর্কটি স্থানান্তরিত চাহিদা রেখার (D_1D_1) b বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত হল a বিন্দুর তুলনায় b বিন্দুতে একই দামে চাহিদার পরিমাণ কম। একেই বলে চাহিদার হ্রাস।

অনুশীলনী ৫.৩.৪

কলমের দাম ৫ টাকা স্থির অবস্থায় কালির দাম ৫ টাকা (প্রতি বোতল) হলে কলমের চাহিদা হয় ১০০টি। যদি কালির দাম ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা হয় তবে কলমের চাহিদা কিভাবে পরিবর্তিত হবে চিত্রের মাধ্যমে দেখান।

পাঠ ৪ : চাহিদার প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- চাহিদার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

আমরা জানি, কোন দ্রব্যের চাহিদা ভোক্তার রুচি, পছন্দ আবহাওয়া ইত্যাদি উপাদানের উপর নির্ভর করে। এই নির্ভরশীলতার উপর ভিত্তি করে চাহিদা প্রধানত তিন প্রকার।

১। দাম চাহিদা ২। আয় চাহিদা ৩। আড়াআড়ি চাহিদা

১। দাম চাহিদা (Price Demand)

অন্যান্য অবস্থা পরিবর্তিত থেকে শুধুমাত্র দামের পরিবর্তনের কারণে চাহিদার পরিবর্তন হলে তাকে দাম চাহিদা বলে। দাম চাহিদা রেখার দ্বারা বিভিন্ন দামে বিভিন্ন চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক প্রকাশ পায়। যেমন মনে করি, দ্রব্যের চাহিদা তার দামের উপর নির্ভরশীল বা $Q = f(P)$, স্বাভাবিক দ্রব্যের জন্য দাম ও চাহিদার এই সম্পর্কটি বিপরীত। অর্থাৎ দাম বাড়লে চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। তাই দাম চাহিদা রেখাকে চিত্রে রূপ দিলে আমরা নিম্নগামী চাহিদা রেখা পাব যা নীচের চিত্রে DD রেখা দ্বারা দেখান হল।

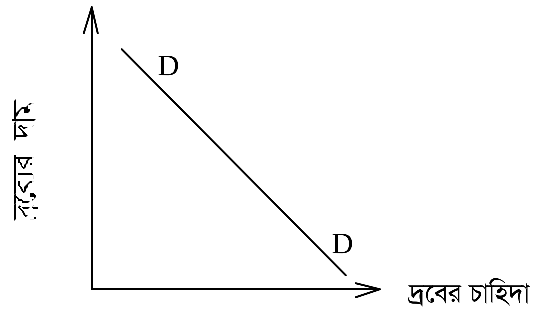

২। আয় চাহিদা (Income Demand)

অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে শুধুমাত্র আয়ের পরিবর্তনের ফলে ভোক্তার চাহিদার যে পরিবর্তন হয় তাকে আয় চাহিদা বলে। আয়ের বিভিন্ন পরিমাণের সাথে চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণের যে সম্পর্ক তাকে আয় চাহিদা রেখা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। স্বাভাবিক দ্রব্যের বেলায় আয় চাহিদা রেখা উর্ধ্বগামী। কারণ আয়ও চাহিদার মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ ব্যক্তির আয় যত বাড়বে কোন দ্রব্যের বেলায় ব্যক্তির চাহিদাও তত বাড়বে। আর নিকৃষ্ট দ্রব্যের বেলায় আয় চাহিদা রেখা নিম্নগামী। কারণ ব্যক্তির আয় আর নিকৃষ্ট দ্রব্যের চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। নিকৃষ্ট দ্রব্য হল সে সব দ্রব্য যেসব দ্রব্যকে ভোক্তা আয় বৃদ্ধি পেলে পরিত্যাগ করতে চায়। অর্থাৎ আয় বৃদ্ধি পেলে যেসব দ্রব্যের চাহিদা কমে যায় তাকে নিকৃষ্ট দ্রব্য বলে।

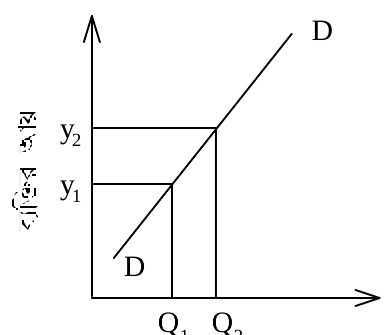

স্বাভাবিক দ্রব্য
চিত্র : ক

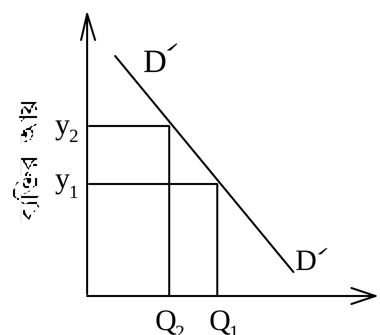

নিকৃষ্ট দ্রব্য
চিত্র : খ

উপরোক্ত চিত্রের (ক) এ ভূমি অক্ষে স্বাভাবিক দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে ব্যক্তির আয় পরিমাপ করা হল। উপরোক্ত 'ক' চিত্রে DD হল স্বাভাবিক দ্রব্যের আয় চাহিদা রেখা। এখানে দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তির আয় যখন Y_1 তখন দ্রব্যটির জন্য ব্যক্তির চাহিদা Q_1, আর আয় বেড়ে যখন Y_2 হল তখন চাহিদাও বেড়ে Q_2 হল। অর্থাৎ স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় বাড়লে চাহিদাও বাড়ে। তাই আয় চাহিদা রেখা উর্ধ্বগামী।

অন্যদিকে খ চিত্রে D_1D_1 হল নিকৃষ্ট দ্রব্যের আয় চাহিদা রেখা। এই চিত্রে ব্যক্তির আয় যখন Y_1 তখন দ্রব্যের চাহিদা Q_1 আর আয় বেড়ে যখন Y_2 হল তখন দ্রব্যের চাহিদা কমে Q_2 হল। আয় ও নিকৃষ্ট দ্রব্যের চাহিদার এই বিপরীত সম্পর্কের কারণে নিকৃষ্ট দ্রব্যের আয় চাহিদা রেখা নিম্নগামী। যেমন পদোন্নতির কারণে একজন গরীব ব্যক্তির আয় যদি বৃদ্ধি পেয়ে ৫০০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা হয় তবে তিনি অধিক পরিমাণে ভাত ডাল না খেয়ে ফল মূল মাছ মাংস খাবার চেষ্টা করবে।

এক্ষেত্রে ভাত ডালকে বলবে নিকৃষ্ট দ্রব্য এবং তখন ভাত/ডালের আয় চাহিদা রেখা নিম্নগামী।

৩। আড়াআড়ি চাহিদা (Cross Demand)

আমরা চাহিদার নির্ধারক সমূহ আলোচনার সময় দেখেছি যে, চাহিদা অন্য কোন দ্রব্যের দামের উপরও নির্ভর করে। আর আমরা এও জানি যে, সম্পর্কিত দ্রব্য দুই প্রকার : ১। পরিবর্তক দ্রব্য ২। পরিপূরক দ্রব্য। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে শুধুমাত্র এই সম্পর্কিত দ্রব্যের চাহিদার যে পরিবর্তন হয় তাকে সে দ্রব্যের আড়াআড়ি চাহিদা বলে। যেমন x, y দুটি সম্পর্কিত দ্রব্য। এখন y এর দাম পরিবর্তিত হলে x দ্রব্যের চাহিদার যে পরিবর্তন হয় তাকে x দ্রব্যের আড়াআড়ি চাহিদা বলে।

পরিবর্তক বা বিকল্প দ্রব্যের আড়াআড়ি চাহিদা

পরস্পর পরিবর্তক হিসাবে x, y দুটি দ্রব্য বিবেচনা করা যাক, y দ্রব্যের দাম বাড়লে x দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে। আবার y দ্রব্যের দাম কমলে x দ্রব্যের চাহিদা কমবে। অর্থাৎ y দ্রব্যের দাম ও x দ্রব্যের চাহিদার মধ্যে সরাসরি ধনাত্মক সম্পর্ক। তাই এ ক্ষেত্রে x দ্রব্যের চাহিদা রেখাটা ডানদিকে উর্ধ্বগামী। উদাহরণ স্বরূপ, চিনি ও গুড় দুটি দ্রব্য। যদি চিনির দাম বেড়ে যায় তবে গুড়ের চাহিদা বেড়ে যাবে আবার চিনির দাম কমে গেলে গুড়ের চাহিদা কমে যাবে। তাই এখানে গুড়ের চাহিদা রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী। চিনির দাম যখন p_1 ছিল তখন গুড়ের চাহিদা M_1 যা a বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত। আর চিনির দাম বেড়ে P_2 হলে গুড়ের চাহিদাও বেড়ে M_2 হল। এই সম্পর্ক b বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত। এই a, b বিন্দু যোগ করে আমরা গুড়ের চাহিদা রেখা পেলাম যা ডানদিকে উর্ধ্বগামী। একে বলে পরিবর্তক দ্রব্যের আড়াআড়ি চাহিদা রেখা।

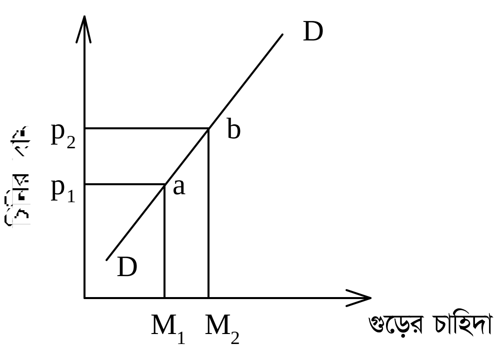

অনুশীলনী ৫.৪.১

অনুশীলনী ৫ কে ব্যবহার করে গুড় চিনির আড়াআড়ি চাহিদা রেখা অঙ্কন করুন।

পরিপূরক দ্রব্যের আড়াআড়ি চাহিদা রেখা :

পরস্পর পরিপূরক দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটি দামের সাথে অপরটির চাহিদার ঋণাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। একটির দাম বাড়লে অপরটির চাহিদা কমে। আর একটি দাম কমলে অপরটির চাহিদা বাড়ে যেমন আমরা কালি ও কলমের কথা বলতে পারি। যদি কালির দাম বেড়ে যায় তবে কলমের চাহিদা কমে যাবে। আর কালির দাম কমে গেলে কলমের চাহিদাও বেড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে কলমের চাহিদা রেখাটা ডানদিকে নিম্নগামী।

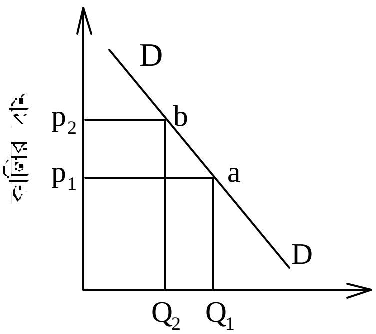

চিত্রে দেখা যায় যে যখন কালির দাম p_1 ছিল তখন কলমের চাহিদার পরিমাণ ছিল Q_1 যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত। আবার যখন কালির দাম বেড়ে P_2 হয় তখন কলমের চাহিদা কমে Q_2 হয় যা চিত্রে b বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এই a ও b বিন্দু যোগ করলে আমরা ডানদিকে নিম্নগামী চাহিদা রেখা পাব। একে বলে পরিপূরক দ্রব্যের আড়াআড়ি চাহিদা রেখা।

অনুশীলনী ৫.৪.২

অনুশীলনী ৫.৩.৪ কে ব্যবহার করে পরিপূরক দ্রব্য কালি ও কলমের আড়াআড়ি চাহিদা রেখা অঙ্কন করুন।

চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম

চাহিদা বিধি হতে আমরা জানি যে, দ্রব্যের দাম বাড়লে তার চাহিদা কমে। আর দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদা বাড়ে। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু এই চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ অনেক সময় আমরা এমন কিছু অবস্থার সম্মুখীন হই যখন দ্রব্যের দাম হ্রাস পেলেও তার চাহিদা কমে যায় বা দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলেও তার চাহিদা বাড়ে। একেই বলে চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম। নিম্নে চাহিদা বিধির কিছু ব্যতিক্রম আলোচনা করা হলো :

ক) সামাজিকভাবে মর্যাদাপূর্ণ দ্রব্য : থর্সস্টেইন ভেবলন নামের একজন অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে চাহিদা বিধিকে সবসময় উপযুক্ত বলে মনে করা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে তিনি উদাহরণ হিসাবে সামাজিকভাবে মর্যাদাপূর্ণ দ্রব্য যেমন হীরকের কথা উল্লেখ করেন। হীরকের দাম যখন বেশী থাকে তখন তার চাহিদাও সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষের কাছে বেশী। আবার হীরকের দাম যখন কমে যায় তখন তার চাহিদাও বাড়ে না। কারণ হীরকের দাম কমে গেলে তার সামাজিক মর্যাদাও কমে যায় এবং সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষের নিকট তার চাহিদাও কমে যায়। এক্ষেত্রে চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম দেখা যায়, অর্থাৎ এখানে হীরকের দামের সাথে তার চাহিদার ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান।

খ) গিফেন দ্রব্য (Giffen goods) : রবার্ট গিফেন নামের একজন অর্থনীতিবিদ উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটেনে যারা কম আয় সম্পন্ন শ্রমিক তাদের চাহিদার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেন। সেখানে দেখা গিয়েছিল যে পাউরুটির দাম যখন বৃদ্ধি পায় তখন তারা বেশী পরিমাণে পাউরুটি ক্রয় করে। কারণ পাউরুটির দাম যখন বেড়ে যায় তখন একই পরিমাণ দ্রব্যের জন্য তাদেরকে বেশী খরচ করতে হয়। ফলে তাদের হাতে অন্যান্য দ্রব্য কিনার জন্য কম টাকা থাকে। তাই তারা ভবিষ্যৎ দাম বৃদ্ধির আশংকায় আগের চেয়ে বেশী রুটি ক্রয় করবে। অর্থাৎ রুটির দাম বাড়লেও তারা বেশী রুটি ক্রয় করে। আবার রুটির দাম কমলে অন্যান্য দ্রব্য কিনার জন্য তাদের হাতে বেশী টাকা থাকে। তখন তারা রুটির পরিমাণ কমিয়ে অন্যান্য উৎকৃষ্ট দ্রব্য ক্রয় করবে। অর্থাৎ রুটির দাম কমলে তারা কম রুটি ক্রয় করে। অতএব এখানে দেখা যাচ্ছে যে রুটির দামের সাথে চাহিদার সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। এখানে রুটি হল গিফেন দ্রব্য এবং এই গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয়না।

গ) আরও দাম বৃদ্ধির প্রত্যাশা : কোন কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে ক্রেতাগণ মনে করে যে এর দাম ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। ফলে তাদের ঐ দ্রব্যের জন্য চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যেমন কোন শেয়ার বাজারের শেয়ারের দাম কমলে জনগণ মনে করে যে এর দাম আরও কমবে এতে শেয়ারের চাহিদা কমে যায়। এখানেও দেখা যাচ্ছে যে শেয়ারের দামের সাথে শেয়ারের চাহিদার সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান যা চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম।

পাঠ ৫ : চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বর্ণনা করতে পারবেন।

সংজ্ঞা

চাহিদার নির্ধারক উপাদানগুলির মধ্যে যে কোন একটি পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের মাত্রা বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। এইসব উপাদানের পরিবর্তনের সঙ্গে চাহিদার সাড়া দেখার মাত্রাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে। এই সাড়া দেখার মাত্রা বা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে শতাংশিক পরিবর্তনের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সংজ্ঞাকে সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

$$\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Price elasticity)} = \frac{\text{চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক বা শতাংশ পরিবর্তন}}{\text{চাহিদার নির্ধারকের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন}}$$

প্রকারভেদ : চাহিদার নির্ধারক উপাদানের উপর নির্ভর করে চাহিদার ৩ ধরনের স্থিতিস্থাপকতার কথা আমরা এ পাঠে আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে :

১। চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা
২। চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা
৩। চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা

চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা :

চাহিদা বিধিতে আমরা দেখেছি যে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের সঙ্গে তার চাহিদারও পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের মাত্রা বিভিন্ন রকম। দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সেই দ্রব্যের চাহিদার সাড়া দেয়ার মাত্রাকে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বলে। একে শতাংশিক পরিবর্তনের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অতএব দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তনের ফলে চাহিদা যে আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন হয়, তাদের অনুপাতকে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বলে।

$$\text{দাম স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন}}{\text{দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন}}$$

চাহিদার আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন জানার জন্য আমাদের মূল্য চাহিদা ও চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ এই দুয়ের অনুপাত জানতে হবে। অতএব সূত্রটি দাঁড়ায় –

$$\text{দাম স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\dfrac{\text{চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ}}{\text{মূল চাহিদা}}}{\dfrac{\text{দামের পরিবর্তনের পরিমাণ}}{\text{মূল দাম}}}$$

যদি ep = দাম স্থিতিস্থাপকতা, dq = চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ, q = মূল চাহিদা, dp = দামের পরিবর্তনের পরিমাণ, p = মূল দাম প্রকাশ করে তবে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার সূত্র দাঁড়ায় :

$$ep = \frac{\dfrac{dq}{q}\times 100}{\dfrac{dp}{p}\times 100} = \frac{dq}{q} \div \frac{dp}{p} = \frac{dq}{q} \times \frac{p}{dp} = \frac{dq}{dp} \times \frac{p}{q}$$

অনুশীলনী ৫.৫.১

প্রদত্ত চাহিদা অপেক্ষক $Q = 150\text{-}5p$ চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করুন যখন $p=4$.

প্রকারভেদ : চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা ৫ প্রকার।

১। একের সমান স্থিতিস্থাপকতা বা একক স্থিতিস্থাপকতা (e=১)

২। একের চেয়ে বেশী স্থিতিস্থাপকতা বা স্থিতিস্থাপক চাহিদা (e>১)

৩। একের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা বা অস্থিতিস্থাপকতা চাহিদা (e<১)

৪। শূন্য স্থিতিস্থাপকতা বা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (e=০)

৫। অসীম স্থিতিস্থাপকতা বা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (e=∝)

১। **একক স্থিতিস্থাপকতা :** দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন ও চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন যদি একই হয়। তবে তাকে বলে একক স্থিতিস্থাপকতা। যেমন দামের ১০% পরিবর্তন হলে চাহিদারও যদি ১০% পরিবর্তন হয় তবে তাকে এককের সমান স্থিতিস্থাপকতা বলে।

২। **একের চেয়ে বেশী স্থিতিস্থাপকতা :** দামের শতাংশিক পরিবর্তনের চেয়ে যদি চাহিদার শতাংশিক পরিবর্তন বেশী হয়, তবে তাকে একের চেয়ে বেশী স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। সাধারণত বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা একের চেয়ে বেশী।

৩। **একের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা বা অস্থিতিস্থাপক চাহিদা :** দামের শতাংশিক পরিবর্তনের চেয়ে যদি চাহিদার শতাংশিক পরিবর্তন কম হয় তবে তাকে একের চেয়ে কম বা অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে।

৪। **শূন্য স্থিতিস্থাপকতা বা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা :** দামের পরিবর্তনের হওয়া সত্ত্বেও যদি চাহিদার কোনরূপ পরিবর্তন না হয় তবে তাকে শূন্য স্থিতিস্থাপক বা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। নীচের চিত্রের (ক) অংশে দেখা যাচ্ছে যে, দাম p_1 থেকে পরিবর্তিত হয়ে p_2, p_3, p_4 যাই হোক না কেন চাহিদার পরিমাণ স্থির থাকে বলে চাহিদা রেখা DD লম্ব অক্ষের সমান্তরাল। DD রেখার স্থিতিস্থাপকতা শূন্যের সমান।

৫। **অসীম স্থিতিস্থাপকতা বা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা :** দামের সামান্যতম পরিবর্তনের (যে পরিবর্তনকে গণনা না করলেও চলে) ফলে যদি চাহিদার অনেক পরিবর্তন হয় তবে তাকে চাহিদার অসীম স্থিতিস্থাপকতা বলে। অসীম স্থিতিস্থাপকতা চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল (DD) যার প্রতিটি বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা অসীম। নিচের চিত্রের (খ) অংশে তা দেখানো হলো।

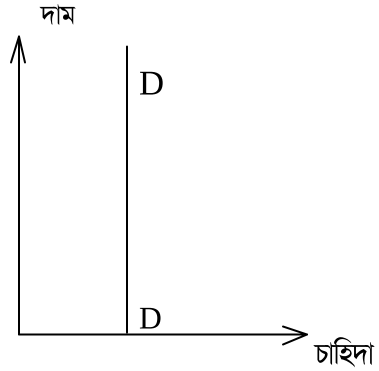

(ক)

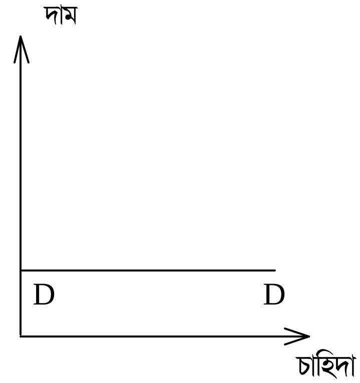

(খ)

চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা :

আমরা চাহিদার নির্ধারণকারী উপাদান আলোচনার সময় দেখেছি যে, ভোক্তার আয় তার চাহিদাকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ আয়ের পরিবর্তন হলে চাহিদার পরিবর্তন হতে পারে। আয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে চাহিদার সাড়া দেয়ার মাত্রাকে আয় স্থিতিস্থাপকতা বলে। স্থিতিস্থাপকতাকে যেহেতু শতাংশিক পরিবর্তনের দ্বারা পরিমাপ করা হয় তাই আমরা বলতে পারি, আয়ের শতাংশিক পরিবর্তনের সঙ্গে চাহিদার পরিমাণের যে শতাংশিক পরিবর্তন হয়, তাদের অনুপাতকে আয় স্থিতিস্থাপকতা বলে।

$$\text{আয় স্থিতিস্থাপকতা (Income elasticity)} = \frac{\text{চাহিদার শতাংশিক পরিবর্তন}}{\text{আয়ের শতাংশিক পরিবর্তন}}$$

$$ey = \frac{\frac{dq}{q}\times 100}{\frac{dy}{y}\times 100} = \frac{\frac{dq}{q}}{\frac{dy}{y}} = \frac{dq}{q}\times\frac{y}{dy} = \frac{dq}{dy}\times\frac{y}{q}$$

$$ey = \frac{dq}{dy}\times\frac{y}{q}$$

এখানে,
ey = চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা।
dq = চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ।
dy = আয়ের পরিবর্তনের পরিমাণ।
y = মূল বা প্রাথমিক আয়।
q = মূল বা প্রাথমিক চাহিদা।

অনুশীলনী ৫.৫.২

চাহিদা অপেক্ষক $x = \frac{y}{2p}$ হতে চাহিদার দাম ও আয় স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কর।

আয় স্থিতিস্থাপকতা ৫ প্রকার :

১। এককের চেয়ে বেশী স্থিতিস্থাপকতা
২। এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা
৩। এককের সমান স্থিতিস্থাপকতা।
৪। শূন্য আয় স্থিতিস্থাপকতা
৫। ঋণাত্মক আয় স্থিতিস্থাপকতা।

আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, কোন দ্রব্যের সাথে সম্পর্কিত দ্রব্যের দামও তার চাহিদাকে প্রভাবিত করতে পারে। এই সম্পর্কিত দ্রব্য দুই প্রকার হতে পারে – পরিবর্তক ও পরিপূরক। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা দেয়া হয়। মনেকরি, x ও y দুটি সম্পর্কিত দ্রব্য। y দ্রব্যের দামের শতাংশিক বা আপেক্ষিক পরিবর্তনের ফলে x দ্রব্যের চাহিদার যে শতাংশিক আপেক্ষিক পরিবর্তন হয় তাদের অনুপাতকে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা বলে।

$$\text{আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{x \text{ দ্রব্যের চাহিদার শতাংশিক পরিবর্তন}}{y \text{ দ্রব্যের দামের শতাংশিক পরিবর্তন}}$$

$$e_c = \frac{\frac{dq_x}{q_x} \times 100}{\frac{dp_y}{p_y} \times 100} = \frac{dq_x}{q_x} \div \frac{dp_y}{p_y} = \frac{dq_x}{dp_y} \times \frac{p_y}{q_x}$$

এখানে,
e_c = আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা।
dq_x = x দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন।
q_x = x দ্রব্যের প্রাথমিক চাহিদা।
dp_y = y দ্রব্যের দামের পরিবর্তন।
p_y = y দ্রব্যের প্রাথমিক দাম।

অনুশীলনী ৫.৫.৩
চাহিদা অপেক্ষক $Q_a = 50 - 4P_a - 4P_b$ হতে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কর যখন $P_a = 5$, $P_b = 5$.

আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা ৩ প্রকার।
১। বিকল্প দ্রব্যের ক্ষেত্রে ধনাত্মক আড়াআড়ি অবস্থান
২। পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা
৩। স্বাধীন দ্রব্যের ক্ষেত্রে "শূন্য" আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা।

স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারকসমূহ
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণকারী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আমরা নিম্নে আলোচনা করব।

১। **দ্রব্যের প্রকৃতি :** দ্রব্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে আমরা দ্রব্যকে দুইভাগে ভাগ করতে পারি। যথা – প্রয়োজনীয় দ্রব্য, বিলাস দ্রব্য, চাল, ডাল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা স্বল্প স্থিতিস্থাপক, আর হীরা, সোনা ইত্যাদি বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদী বেশী স্থিতিস্থাপক।

২। **পরিবর্তনের সুবিধা :** যে সব দ্রব্যের কোন পরিবর্ত দ্রব্য নাই তাদের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। আর যে সব দ্রব্যের পরিবর্ত দ্রব্য আছে তাদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। যেমন – ডাল ভাতের বিকল্প দ্রব্য কম আছে তাই তা কম স্থিতিস্থাপক। আর মাছের পরিবর্ত দ্রব্য হিসাবে ডিম বা মাংস ব্যবহার করা যায়। তাই মাছের দাম বাড়লে লোকে ডিম বা মাংস খেয়ে থাকে। তাই মাছের চাহিদা অধিক স্থিতিস্থাপক। তাই সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি যে,
একটি দ্রব্যের যত অধিক সংখ্যক পরিবর্ত দ্রব্য অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ততই অধিক হয়।

৩। **দ্রব্যের উপর আয়ের ব্যয়িত অংশ :** একটি দ্রব্যের দাম আয়ের অনুপাত যত বেশী হবে তার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ততই বেশী হবে। যেমন – মনেকরি, একটা দিয়াশলাইয়ের দাম ২০ পয়সা। এখন যদি দিয়াশলাই এর দাম ৫০% বৃদ্ধি পায় তবে দিয়াশলাইয়ের দাম হবে ৩০ পয়সা। এতে দিয়াশলাইয়ের চাহিদা একটা হ্রাস পাবে বলে মনে হয় না। কারণ আয়ের খুব ছোট অংশকই এর জন্য ব্যয় হয়। অন্যদিকে যদি একটি গাড়ীর দাম ৪০,০০০ টাকা থেকে ৫০% বৃদ্ধি পেয়ে ৬০,০০০ টাকা হয় তবে এর চাহিদা অনেক হ্রাস পাবে। কারণ আয়ের একটা বড় অংশ এখানে ব্যয়িত হয়।

৪। **সময় :** দামের পরিবর্তনকে অনুসরণ করে কোন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা স্বল্পকালের তুলনায় দীর্ঘকালে বেশী হবে। যেমন – মনে করি, হঠাৎ করে মাংসের দাম বেড়ে গেল। এতে করে ভোক্তা প্রথমে অন্যান্য দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করে বা সঞ্চয় না করে মাংস ক্রয় করবে। অর্থাৎ দামের বৃদ্ধির ফলে চাহিদার হ্রাস কম হবে এবং স্থিতিস্থাপকতাও কম হয়। কিন্তু এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দাম যদি অনেকদিন ধরে চলে তবে মানুষ মাংসের বিকল্প দ্রব্য খুঁজে বের করবে এবং মাংসের চাহিদা হ্রাস করবে। অর্থাৎ পরে চাহিদা বেশী স্থিতিস্থাপক হবে।

৫। **স্থায়িত্ব :** একটি দ্রব্যের স্থায়িত্ব যত বেশী হবে তার চাহিদা ততই স্থিতিস্থাপক হবে। আর একটি দ্রব্যের স্থায়িত্ব যত কম হবে তার চাহিদা ততই অস্থিতিস্থাপক হবে। যেমন – আলুর চেয়ে শার্টের স্থায়িত্ব বেশী। তাই আলু এবং শার্টের দাম ১০% বাড়লে আলুর ক্রয় যতটুকু কমবে শার্টের ক্রয় তার চেয়ে বেশী হারে কমবে। অর্থাৎ আলুর চেয়ে শার্টের স্থিতিস্থাপকতা বেশী।

অর্থনীতিতে স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি কেবলমাত্র তাত্ত্বিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর ব্যবহারিক গুরুত্বও অনেক যা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হল :

ক। দাম স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব :

১। **মূল্য তত্ত্বে দাম স্থিতিস্থাপকতা :** আমরা জানি একটি ফার্ম তখনই ভারসাম্যে পৌঁছে যখন প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হয়, আর প্রান্তিক আয়ের মান নির্ভর করে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার উপর। এখানে দাম স্থিতিস্থাপকতা জানা একান্ত প্রয়োজন।

$$\text{প্রান্তিক আয়} = \left(১ - \frac{১}{\text{দাম স্থিতিস্থাপকতা}}\right)$$

২। **করতত্ত্বে দাম স্থিতিস্থাপকতা :** কোন দ্রব্যের উপর কর স্থাপনের আগে সে দ্রব্যের দাম স্থিতিস্থাপকতা জানতে হবে। কারণ কর আরোপ করলে (বিক্রয় কর) দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাবে। এখন যদি দ্রব্যটি বেশী স্থিতিস্থাপক হয় দাম বৃদ্ধির ফলে তার চাহিদা বেশী হ্রাস পাবে এবং তা থেকে সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ কম হবে। অন্যদিকে দ্রব্যটি যদি কম স্থিতিস্থাপক হয় তবে দাম বৃদ্ধির ফলে তার চাহিদা কম হ্রাস পাবে এবং তা থেকে সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ তুলনামূলকভাবে বেশী হবে।

৩। **একচেটিয়া কারবারে দাম স্থিতিস্থাপকতা :** একজন একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের দাম নির্ধারণের সময় চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বিবেচনায় আনতে হয়। কারণ দ্রব্যটির চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তবে সে দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি করে মোট আয় বৃদ্ধি করতে পারে। কারণ এক্ষেত্রে দ্রব্যটির চাহিদা বেশী হ্রাস পাবেনা। অন্যদিকে দ্রব্যটির চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয় তবে সে দ্রব্যটির দাম হ্রাস করে মোট আয় বৃদ্ধি করতে পারে। কারণ এক্ষেত্রে দ্রব্যটির দাম বাড়লে চাহিদা অনেক কমে যাবে।

খ। **আয় স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব :** আমরা জানি যে, স্বাভাবিক দ্রব্যের বেলায় আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে এবং নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় বাড়লে চাহিদা কমে। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে তা দেশের জন্য সুফল বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু যে সব শিল্প নিকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করে, তাদের ক্ষেত্রে এটা মোটেই কাম্য নয়। ফলে টেলিভিশন, মোটরগাড়ী ইত্যাদি শিল্পে আয় স্থিতিস্থাপকতা অধিক বলে এই শিল্পগুলি জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে ক্রমাগতই প্রসারিত হতে থাকে।

গ। **আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব :** এর সাহায্যে শিল্পের সীমারেখার সংজ্ঞা দেয়া হয়। চাহিদার দৃষ্টিকোণ ক্ষেত্রে যে সব দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতার মান উচ্চ ঐ সব দ্রব্য একটি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

যোগান

ইউনিট ৬

পাঠ ১ : যোগান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- যোগান বিধি বর্ণনা করতে পারবেন।
- যোগানসূচি থেকে যোগান রেখা অংকন করতে পারবেন।
- যোগান রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।

কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট দামে একজন বিক্রেতা কোন দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয় করতে প্রস্তুত থাকে তাকে বলে যোগান। উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যাক ১০ টাকা দরে একজন আলু উৎপাদক ১৫ কেজি আলু বিক্রি করার জন্য বাজারে আনল। এখন এই ১৫ কেজি হল আলুর যোগান। যদি বাজারে এসে দেখে যে আলুর দাম কেজি প্রতি ৯ টাকা এবং তখন সে আলু বিক্রি করতে নারাজ হবে তখন ১৫ কেজিকে আর যোগান বলা যাবে না।

যোগান বিধি

যোগানের সংজ্ঞায় আমরা দেখলাম যে কোন দ্রব্যের যোগান তার দামের উপর প্রধানত নির্ভরশীল। অর্থাৎ যোগান ও দামের মধ্যে একটি আপেক্ষিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এই আপেক্ষিক সম্পর্ক প্রত্যক্ষ এবং একে বলে যোগান বিধি।

যোগান বিধিটি হল – অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দ্রব্যের দাম বাড়লে তার যোগান বাড়বে এবং দাম কমলে যোগান কমবে। অর্থাৎ দাম ও যোগানের মধ্যে সরাসরি বা ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান।

আমাদের উপরোক্ত উদাহরণ থেকে আমরা বলতে পারি যে, যখন আলুর দাম ১০ টাকা তখন একজন আলু বিক্রেতা ১৫ কেজি আলু বিক্রি করতে প্রস্তুত থাকে। এখন যদি আলুর দাম ১০ টাকা থেকে ১২ টাকা হয় তখন সে ১৫ কেজির বদলে ২০ কেজি আলু বিক্রি করতে প্রস্তুত থাকে। এখন আলুর দাম যদি ৯ টাকা হয় তবে বিক্রেতা হয়ত ১০ কেজি আলু বিক্রি করতে প্রস্তুত থাকবে। এতে আমরা দেখলাম যে, আলুর দাম যখন বাড়ে তখন আলু বিক্রেতা বেশী আলু বিক্রি করতে প্রস্তুত থাকে। আর আলুর দাম যখন কমে যায় তখন সে কম আলু বিক্রি করতে প্রস্তুত থাকে। আলুর দাম ও আলুর যোগানের এই সম্পর্ককে যোগান বিধি বলে।

যোগান সূচী

আমরা দেখেছি যে, কোন দ্রব্যের দাম ও তার যোগানের মধ্যে একটা অপেক্ষিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এখন বিভিন্ন দামে যোগানের যে বিভিন্ন পরিমাণ পাওয়া যায় তাকে যখন আমরা একটি ছকের সাহায্যে প্রকাশ করবো তখন তাকে বলে যোগান সূচী।

নিম্নে একটি যোগান সূচীর উদাহরণ দেয়া হল :

আমের যোগান সূচী

দাম / কেজি	যোগানের পরিমাণ / কেজি
৪০	১০০
৫০	১২০
৬০	১৪০

উপরোক্ত উদাহরণে দেখা যাচ্ছে যে, যখন আমের দাম ৪০ টাকা/কেজি তখন আমের যোগান ১০০ কেজি। এখন যদি আমের দাম বেড়ে ৫০ বা ৬০ টাকা হয় তবে যোগানের পরিমাণও বেড়ে ১২০ বা ১৪০ কেজি হবে।

যোগান রেখা

দ্রব্যের দাম ও যোগনের মধ্যে যে আপেক্ষিক সম্পর্ক তাকে যদি আমরা চিত্রে রূপ দেই তবে যোগান রেখা পাব। অর্থাৎ বিভিন্ন দামে দ্রব্যের যে বিভিন্ন যোগান তাকে চিত্রের প্রকাশ করলেই যোগান রেখা পাওয়া যায়। উপরের সূচীকে চিত্রে রূপ দিলে নিম্নরূপ SS যোগান রেখা পাওয়া যায়।

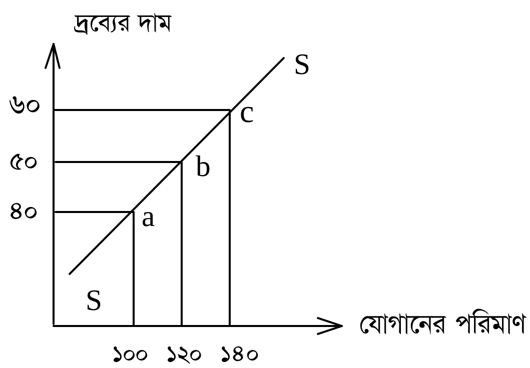

চিত্রে : Y অক্ষে দ্রব্যের দাম আর X অক্ষে যোগানের পরিমাণ দেখান হল। এখন ৪০ টাকা কেজি দরে যোগানের পরিমাণ হয় ১০০ কেজি। তখন a বিন্দু দিয়ে প্রকাশ পায়। এরপর ৫০ বা ৬০ টাকা কেজি দরে যোগানের পরিমাণ যথাক্রমে ১২০ ও ১৪০ কেজি যা b ও c বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত। এখন a, b ও c বিন্দুকে যোগ করে আমরা SS একটি রেখা পেলাম তা আমের যোগান রেখা।

অনুশীলনী ৬.১.১

নিম্নে কোন দেশের পেঁয়াজের যোগানের ছক দেয়া হল এখান থেকে পেঁয়াজের যোগান রেখা অঙ্কন কর।

দাম/কেজি	যোগান/মাস
৪০	৪০০০
৩৫	৭০০০
৩০	৯০০০
২০	১২০০০

যোগান রেখা কেন ডান দিকে উর্ধ্বগামী হয়?

কোন দ্রব্যের দাম যখন বাড়ে যখন বিক্রেতার বিক্রয় লব্ধ অর্থের পরিমাণ বাড়ে। উৎপাদক তখন সে দ্রব্য উৎপাদনে বেশী আগ্রহী হয়। এতে উৎপাদক। ঐ দ্রব্য উৎপাদনেই বেশী নিয়োগ করবে এবং দ্রব্যের উৎপাদনও বাড়বে। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম বাড়লে তার উৎপাদন বাড়ে।
অন্যদিকে যদি দ্রব্যের দাম কমে তবে বিক্রেতার বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ কমে। উৎপাদক তখন আর ঐ দ্রব্য উৎপাদনে আগ্রহী হয় না এবং উৎপাদনের উপাদানকেও ঐ দ্রব্য উৎপাদনে বেশী নিয়োগ করে না। এতে উৎপাদন কম হয়। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম কমলে তার যোগানের পরিমাণও কমে।
অতএব দেখা যাচ্ছে যে, দ্রব্যের দাম ও তার যোগানের সঙ্গে এটি সরাসরি বা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। এই প্রত্যক্ষ বা ধনাত্মক সম্পর্কের কারণেই যোগান রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী।

যোগানের নির্ধারকসমূহ

আমরা দেখেছি যে, কোন দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ তার বাজার দামের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। কিন্তু যোগান শুধুমাত্র দ্রব্যের দামের উপর নির্ভর না করে আরও অনেক উপাদানের উপর নির্ভর করে। যেমন উৎপাদনের উপকরণসমূহের দাম (PF), প্রাকৃতিক অবস্থা (N), কারিগরী কৌশল (T), কর/ভর্তুকি (T/S), সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম (Pr), বিক্রেতার সংখ্যা (SN), উৎপাদকে আয় ও বিনিয়োগ (Y/I) স্তর ইত্যাদি।

এই সবগুলি উপাদানকে বিবেচনা করলে যে যোগান অপেক্ষক পাব তা হল QS = f(P, PF, N, T/S, Pr SN, Y/I ....)

কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা দ্রব্যের দাম ছাড়া অন্যান্য সব উপাদানকে স্থির ধরে শুধুমাত্র নিজস্ব দামকে পরিবর্তনশীল ধরে যে যোগান অপেক্ষক পাই তা হল QS = f(P) অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কোন দ্রব্যের যোগান তার দামের উপরই নির্ভরশীল।

পাঠ ২ : যোগানের পরিবর্তন ও যোগান রেখার স্থানান্তর

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- যোগানের পরিবর্তনের কারণসমূহ বলতে পারবেন।
- যোগান রেখার স্থানান্তর ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

যোগানের পরিবর্তন

যোগানের যে নির্ধারকসমূহের কথা আমরা আলোচনা করলাম তাদের মধ্যে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে শুধুমাত্র দামের পরিবর্তনের কারণে যোগানের পরিমাণের যে পরিবর্তন হয় তাকে যোগানের পরিবর্তন বলে। যেমন, ডিমের দাম যখন ১৪ টাকা/হালি তখন ডিমের যোগানের পরিমাণ হয় ২০ হালি, আর ডিমের দাম বেড়ে ১৬ টাকা হলে যোগানের পরিমাণ বেড়ে ২৯ হালি হল। এক্ষেত্রে আমরা একই যোগান রেখা SS এর উপরে a বিন্দু থেকে b বিন্দুতে যাব। একেই বলে যোগানের পরিবর্তন।

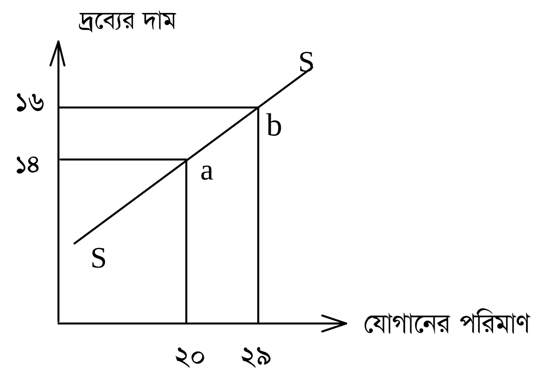

অনুশীলনী ৬.২.১

রসুনের দাম যখন ১০ টাকা/কেজি তখন কোন দেশের রসুনের যোগান ১০,০০০ কেজি। এখন যদি রসুনের দাম ১৫ টাকা/কেজি হয় তবে সে দেশের রসুনের যোগানের পরিবর্তন চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

যোগান রেখার স্থানান্তর

অন্যদিকে যোগানের যে সব নির্ধারকগুলি আছে তাদের মধ্যে শুধুমাত্র দ্রব্যের দাম ছাড়া অন্যান্য উপাদানগুলির যে কোন একটির পরিবর্তনের কারণে যোগান রেখার যে স্থান পরিবর্তন হয় তাকে বলে যোগান রেখার স্থানান্তর। পূর্বের নির্দিষ্ট দামে যোগানের পরিমাণ যখন বাড়বে তখন যোগান রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়। আবার পূর্ব নির্ধারিত দামে যোগান যখন কমবে তখন যোগান রেখা বামে স্থানান্তরিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ : মনেকরি, একটি শার্টের দাম বর্তমানে ৪০০ টাকা। এই ৪০০ টাকা দামে শার্টের যোগান হল ৫০টি। যা S_O S_O যোগান রেখা দ্বারা দেখান হল। এখন যদি কারিগরি কলাকৌশলের উন্নতি হয় তবে কাপড় শিল্পে উন্নত যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন হবে। এতে একই খরচে আগের চেয়ে বেশী কাপড় উৎপাদন করা যাবে। অর্থাৎ পূর্বের দামে বেশী পরিমাণ শার্টের যোগান হবে। মনে করি ৪০০ টাকা দামেই এখন ৬০টি শার্টের যোগান হয়। এক্ষেত্রে যোগান রেখা ডানে স্থানান্তরিত হয়ে S1 S1 হল। নিচের চিত্রে তা দেখানো হলো :

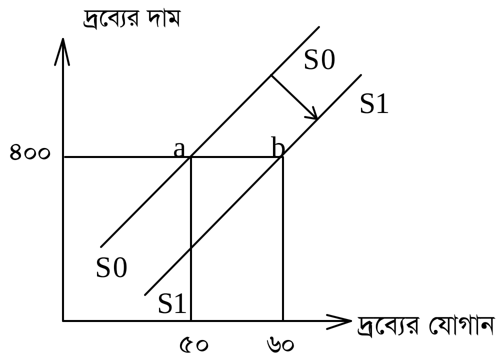

অনুশীলনী ৬.২.২

কাগজের দাম যখন ১৫ টাকা/দিস্তা তখন একটি কাগজের মিল ১০,০০০ দিস্তা কাগজের যোগান দেয়। এখন যদি সরকার তাকে ১০,০০০ টাকা ভর্তুকি দেয় তবে কাগজের যোগানের কি পরিবর্তন হবে চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

আবার যদি বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত উপকরণের দাম বেড়ে যায়, যেমন সুতার দাম বেড়ে গেলে তবে উৎপাদন খরচও বেড়ে যাবে। এ অবস্থায় আগের দামে যোগানের পরিমাণ কমে যাবে। মনে করি ৪০০ টাকা দামে এখন ৪০টি শার্টের যোগান হয় তখন যোগান রেখা বামে স্থানান্তরিত হয়ে S2 S2 হয়।

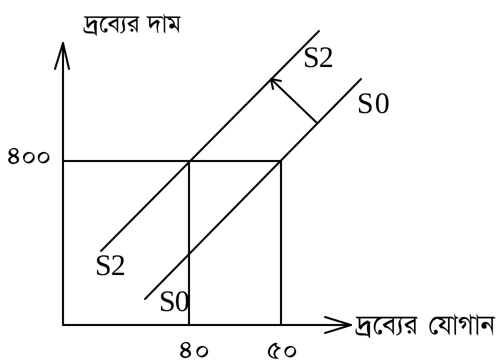

অনুশীলনী ৬.২.৩

কলমের দাম যখন ৫ টাকা (প্রতিটি) তখন একজন কলম বিক্রেতা ১০,০০০ কলম যোগান দেয়। এখন যদি সরকার কলমের বিক্রয়ের উপর কর ধার্য্য করে তবে কলমের যোগান কিভাবে পরিবর্তিত হবে চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

পাঠ ৩ : যোগানের স্থিতিস্থাপকতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- যোগানের বিভিন্ন ধরনের স্থিতিস্থাপকতা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যোগানের স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারকসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

যোগান বিধিতে আমরা দেখেছি যে, অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকলে কোন দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের সঙ্গে যোগানের পরিমাণও পরিবর্তিত হয়। দামের পরিবর্তনের সঙ্গে যোগানের পরিবর্তনের মাত্রা বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। এই দামের পরিবর্তনের সঙ্গে যোগানের সাড়া দেয়ার মাত্রাকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে। স্থিতিস্থাপকতাকে শতাংশিক পরিবর্তনের দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

অতএব আমরা বলতে পারি, দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তনের ফলে যোগানের যে আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন হয় তাকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে। এই সংজ্ঞাকে নিম্নোক্ত সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

$$\text{যোগানের স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{যোগানের পরিমাণের শতাংশিক পরিবর্তন}}{\text{দ্রব্যের দামের শতাংশিক পরিবর্তন}}$$

$$Qs = \frac{\dfrac{\text{যোগানের পরিবর্তনের পরিমাণ}}{\text{মূল যোগান}}}{\dfrac{\text{দামের পরিবর্তনের পরিমাণ}}{\text{মূল দাম}}} = \frac{\dfrac{dQs}{Qs}}{\dfrac{dP}{P}}$$

বা, $Qs = \dfrac{dQs}{dP} \times \dfrac{P}{Qs}$

এখানে es = যোগানের স্থিতিস্থাপকতা, dQs = যোগানের পরিমাণের পরিবর্তন,
Qs = মূল যোগান, dP = দামের পরিবর্তনের পরিমাণ, P = মূল দাম।

অনুশীলনী ৬.৩.১

কোন দ্রব্যের সরবরাহ অপেক্ষক $Q = .5 + 2P^2$. যোগানের দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করুন। যখন $P = 2$।

প্রকারভেদ :

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা পাঁচ প্রকার :

১। এককের সমান স্থিতিস্থাপকতা ($es = 1$)

২। এককের চেয়ে বেশী স্থিতিস্থাপকতা ($es > 1$)

৩। এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা ($es < 1$)

৪। শূন্য স্থিতিস্থাপকতা বা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপকতা ($es = 0$)

৫। অসীম স্থিতিস্থাপকতা বা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপকতা ($es = \infty$)

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারক সমূহ

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা যে সব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলি নিম্নরূপ –

১। **সময় :** স্বল্পকাল অপেক্ষা দীর্ঘকালে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বেশী। অর্থাৎ যোগানের স্থিতিস্থাপকতা সময়ের সাথে বৃদ্ধি পায়।

২। **উপকরণসমূহের গতিশীলতা :** উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণসমূহকে এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে স্থানান্তরের মাত্রা যত বেশী হয় স্থিতিস্থাপকতা তত বেশী হবে।

৩। **ঝুঁকি গ্রহণ :** উদ্যোক্তাগণ যতই ঝুঁকি আগ্রহী হবে, যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ততই অধিক হবে।

পাঠ ৫ : যোগান ও সময়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- যোগানের সাথে সময়ের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা সময়ের সাথে সম্পর্কিত। যোগানের নির্ধারণকারী উপাদানের মধ্যে কোন একটির পরিবর্তন হলে যোগানের যে পরিবর্তন হবে তা দীর্ঘকালের চেয়ে স্বল্পকালে কম। এর কারণ হল সময় বেশী হলে উৎপাদন ক্ষেত্রে ফার্মগুলি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ সাধন করতে পারে এবং ইচ্ছামত যোগানের হ্রাস বৃদ্ধি করে। অধ্যাপক মার্শাল যোগানের তিনটি সময়কালের কথা উল্লেখ করেন, যথা : ক. মুহূর্তকাল, খ. স্বল্পকাল, গ. দীর্ঘকাল। এদের প্রচলিত সংজ্ঞাগুলি হল –

ক. **মুহূর্তকাল :** একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে উৎপাদনকারী উৎপাদন বাড়াতে বা কমাতে পারে না বলে যোগানেরও কোন পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ যোগান স্থিতিস্থাপকতা মুহূর্তকালে শূন্য হয়।

খ. **স্বল্পকাল :** স্বল্পকালে যোগানের কিছুটা বৃদ্ধি করা সম্ভব। কারণ স্বল্পকালে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি, কারখানা, আয়তন, ইত্যাদি পরিবর্তন করা যায় না বলে উৎপাদন ক্ষমতাও সীমিত থাকে। তখন শুধুমাত্র অধিকসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে বা পুরাতন শ্রমিকগণকে অতিরিক্ত সময় কাজে নিয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। এরপর দাম আরও বৃদ্ধি পেলে যোগান মোটেই সাড়া দেয় না।

গ. **দীর্ঘকালীন :** দীর্ঘকালে যোগানের ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায়, কারণ দীর্ঘকালে সব ব্যয়ই পরিবর্তনশীল এবং নতুন ফার্ম শিল্পে যোগদান করতে এবং পুরাতন ফার্ম বের হয়ে যেতে পারে। ফলে উৎপাদন বাড়ে এবং বাজার দাম হ্রাস পায়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন নির্দিষ্ট কারণে আমাদের দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ শূন্য হয়ে গেল। ফলে হারিকেনের চাহিদা হঠাৎ করে বেড়ে যাবে এবং হারিকেনের দাম বেড়ে যাবে। কারণ মুহূর্তকালে হারিকেনের যোগান বাড়ান সম্ভব নয়। এরপর স্বল্পকালে হারিকেন শিল্পে নতুন লোক নিয়োগ করে বা পুরাতন শ্রমিকদেরকে বেশী সময় কাজ করিয়ে হারিকেনের যোগান কিছুটা বাড়ানো সম্ভব। যদি বিদ্যুৎ সরবরাহের এই ঘাটতি চিরস্থায়ী বলে মনে করা হয় তবে হারিকেনের উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন কারখানা স্থাপন করা হবে। এতে হারিকেনের যোগান বাড়লে তার বাজার দাম হ্রাস পাবে। অতএব আমরা দেখতে পেলাম যে, যোগানের পরিমাণ নির্ধারণে সময় একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান।

অনুশীলনী ৬.৫.১

১. সময়ের সাথে যোগানের সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

দাম নির্ধারণ

ইউনিট ৭

পাঠ ১ : চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ

f wg Kv

ভারসাম্য হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যে অবস্থায় দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি মিলিত হয় এবং ঐ অবস্থা হতে কোন শক্তির বিচ্যুৎ হওয়ার প্রবণতা থকে না। যেমন- কোন দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হলে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ পাওয়া যায়। ভারসাম্য দু'ধরনের ; স্থিতিশীল ভারসাম্য ও অস্থিতিশীল ভারসাম্য। স্থিতিশীল ভারসাম্য হচ্ছে এমন এক ধরনের ভারসাম্য কোন কারণে বিঘ্নিত হলে পুনরায় তা অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে অস্থিতিশীল ভারসাম্য হচ্ছে এমন ভারসাম্য যা কোন কারণে বিঘ্নিত হলে পুনরায় তা অর্জিত হওয়ার সুযোগ নেই। আমরা এ পর্যায়ে ভারসাম্য দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়া ও কোন শক্তির পরিবর্তনের কারণে ভারসাম্য কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা আলোচনা করব। স্থিতিশীল বা অস্থিতিশীল ভারসাম্য নিয়ে আলোচনা করব না।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়া (Price determination)

আমরা চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে পৃথক পৃথক আলোচনা করেছি। এখন উভয়ের ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার বাজারে কোন দ্রব্য বা সেবার দাম ও পরিমাণ কিভাবে নির্ধারিত হয় তা আলোচনা করব। এক্ষেত্রে উভয়েরই ভূমিকা রয়েছে। এদের কোনটিই পৃথকভাবে দাম নির্ধারণে বা তার পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে না। ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ প্রক্রিয়াটি নিম্নোক্ত সূচীর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

সূচি ৭.১

একক প্রতি দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ	যোগানের পরিমাণ	উদ্বৃত্ত চাহিদা (+) উদ্বৃত্ত যোগান (-)
৫	৩০	১২	(+) ১৮
৬	২৫	১৫	(+) ১০
৭	২০	২০	০
৮	১৮	২৫	(-) ৭
৯	১৫	৩০	(-) ১৫

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তনীয় থাকলে কোন দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে আর দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যকার এ বিপরীত সম্পর্কটি উপরোক্ত সূচীতে প্রতিফলিত হয়েছে। আবার অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে। দাম ও যোগানের পরিমাণের এ ধনাত্মক সম্পর্কটি উল্লেখিত সূচীতে লক্ষণীয়। এখন উভয়ের ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে কিভাবে ভারসাম্য দাম নির্ধারণ হয় তা আলোচনা করব।

দাম যখন ৫ টাকা তখন যোগানের তুলনায় চাহিদার পরিমাণ ১৮ একক বেশি, ক্রেতাগণ এ দামে তাদের সম্পূর্ণ চাহিদা পূরণে ব্যর্থ বলে দ্রব্যটির দাম ৫ টাকায় স্থির থাকবে না। ক্রেতাদের কেউ কেউ উচ্চতর দামে দ্রব্যটি ক্রয় করতে চাইবে। ফলে ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হবে এবং বিক্রেতারা উচ্চতম দাম চাইতে শুরু করবে। মনে করি বিক্রেতারা একক প্রতি ৬ টাকা দাম চায় ফলে কোন কোন ক্রেতা বাজার থেকে সরে দাঁড়াবে অথবা অনেকেই চাহিদার পরিমাণ কমিয়ে দেবে। অন্যদিকে যোগানের পরিমাণ বাড়বে। ৬ টাকা দামে চাহিদার পরিমাণ কমে দাঁড়াল ২৫ এককে আর যোগানের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াল ১৫ এককে। এ প্রক্রিয়ায় উদ্বৃত্ত চাহিদার পরিমাণ কমে এবং যোগানের পরিমাণ বেড়ে এক পর্যায়ে উভয়ে পরস্পরের সমান হবে। অর্থাৎ উদ্বৃত্ত চাহিদার পরিমাণ শূন্যে নেমে আসবে, উপরের তালিকায় দ্রব্যটির দাম ৭ টাকা হলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ দামকে বলা হয় ভারসাম্য দাম এবং এদামে দ্রব্যের পরিমাণকে বলা হয় ভারসাম্য পরিমাণ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভারসাম্য দাম অন্য কোন পর্যায়ে হতে পারে কি। উত্তর হলো- না। কেননা অন্য কোন দামে চাহিদা বা উদ্বৃত্ত যোগান শূন্য হয় না। চলুন দ্রব্যটির দাম ৭ টাকার চেয়ে বেশি হলে কি হয় তা লক্ষ্য করি। দ্রব্যটির দাম যখন ৯ টাকা তখন তার চাহিদার পরিমাণ ১৫ একক এবং যোগানের পরিমাণ ৩০ একক। এমতাবস্থায় উদ্বৃত্ত যোগানের পরিমাণ ১৫ একক। এক্ষেত্রে বিক্রেতাগণের ইচ্ছা পুরোপুরি পূরণ হচ্ছে না। তাই বিক্রেতাদের কেউ কেউ বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য দাম কমিয়ে দেবে। দাম কমানোর ফলে চাহিদার পরিমাণ বাড়বে এবং যোগানের পরিমাণ কমবে। ফলে উদ্বৃত্ত যোগানের পরিমাণও কমবে। মনে করি দাম ৮ টাকা হল। ৮ টাকা দামে উদ্বৃত্ত যোগানের পরিমাণ কমে ৭ এককে দাঁড়াল। এ অবস্থায়ও বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অব্যাহত থাকবে এবং দাম আরও কমবে। এভাবে দাম যখন ৭ টাকায় নেমে আসবে তখন উদ্বৃত্ত যোগানের পরিমাণ শূন্য হবে, অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান হবে। এ দামই হবে ভারসাম্য দাম। সুতরাং চাহিদা এবং যোগানের সমতার মাধ্যমেই ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়। কোন না কোন কারণে এই বিপরীত মুখী ক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর সমতা বিঘ্নিত না হওয়া পর্যন্ত এই ভারসাম্য বজায় থাকবে। ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ প্রক্রিয়াটি চিত্র ৭.১ এর সাহায্যে দেখানো যায়।

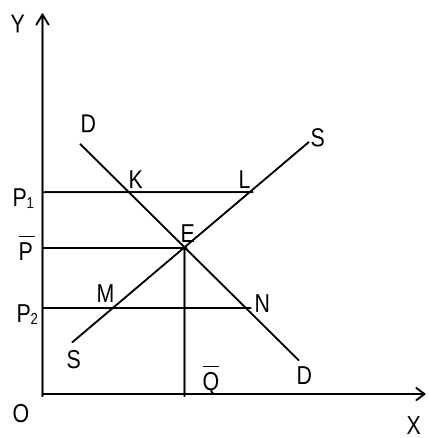

চিত্র ৭.১ : চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ

চিত্রে OX অক্ষে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগনের পরিমাণ এবং OY অক্ষে দ্রব্যের দাম নির্দেশিত হলো। দ্রব্যের চাহিদা রেখা DD ডানদিকে নিম্নগামী (চাহিদা বিধির প্রতিফলন) এবং যোগান রেখা SS ডানদিকে উর্ধ্বগামী। চাহিদা রেখা DD এবং যোগানরেখা SS পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। তাই এখানে চাহিদা ও যোগনের পরিমাণ পরস্পর সমান।

চাহিদা ও যোগনের সমতা বিন্দুতে দাম হলো $O\overline{P}$। সুতরাং $O\overline{P}$ হলো ভারসাম্য দাম। এ ভারসাম্য দামে দ্রব্যের ভারসাম্য পরিমাণ হলো $O\overline{Q}$। শুরুতে দাম $O\overline{P}$ এর চেয়ে বেশি হলে উদ্বৃত্ত যোগানের কারণে তা কমে $O\overline{P}$ এর দিকে নেমে আসবে এবং $O\overline{P}$ এ এসে স্থির হবে, আবার দাম $O\overline{P}$ এর চেয়ে কম হলে উদ্বৃত্ত চাহিদার দরুন তা বেড়ে $O\overline{P}$ এর দিকে অগ্রসর হবে এবং $O\overline{P}$ গিয়ে স্থির হবে। যেমন- শুরুতে দাম OP_1 ($O\overline{P}$ এর চেয়ে বেশি) হলে চাহিদার পরিমাণ P_1K এবং যোগানের পরিমাণ P_1L, এ অবস্থায় উদ্বৃত্ত যোগানের পরিমাণ KL। ফলে দাম কমতে থাকবে। এতে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে এবং যোগানের পরিমাণ কমে উদ্বৃত্ত যোগানের পরিমাণ কমতে থাকবে। এক পর্যায়ে দাম OP এ পৌঁছবে যেখানে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান হবে। আবার দাম OP_2 ($O\overline{P}$ এর চেয়ে কম) হলে চাহিদার পরিমাণ P_2N এবং যোগানের পরিমাণ P_2M_1। এ দামে উদ্বৃত্ত চাহিদার পরিমাণ MN। উদ্বৃত্ত চাহিদার কারণে দাম বাড়তে থকবে। ফলে চাহিদার পরিমাণ কমে এবং যোগানের পরিমাণ বেড়ে উদ্বৃত্ত চাহিদার পরিমাণ কমতে থকবে। এভাবে দাম বাড়তে বাড়তে OP-এ পৌঁছবে যেখান চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ সমান। সুতরাং E-ই ভারসাম্য বিন্দু যার সাথে সংশ্লিষ্ট ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ যথাক্রমে $O\overline{P}$ এবং $O\overline{Q}$।

অনুশীলনী ৭.১

১. চাহিদা ও যোগানের পরিমাণের সমতার মাধ্যমে কিভাবে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর।

পাঠ ২ : ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের পরিবর্তনের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।

ভারসাম্য অবস্থায় পরস্পরের বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলোতে সমতা আসে এবং কোন না কোন কারণে এই সমতা বিঘ্নিত না হওয়া পর্যন্ত তা বজায় থাকে। চাহিদা এবং যোগানের সমতার মাধ্যমে অর্জিত ভারসাম্য ততক্ষণ অটুট থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তা বিঘ্নিত হবার মত কিছু না ঘটে। দাম ও চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক দেখানোর সময় অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত ধরে নেয়া হয়েছে। অনুরূপ দাম ও যোগানের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ধরা হয়েছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই অন্যান্য অবস্থা অহরহ পরিবর্তিত হয়। ফলে চাহিদা রেখা ও যোগান রেখা ডানে বা বামে সরে যায়। এ কারণে ভারসাম্য দাম এবং পরিমাণও পরিবর্তিত হয়। আমরা এ পাঠে অন্যান্য অবস্থা পরিবর্তনের কারণে চাহিদা/যোগান রেখার স্থানান্তরের ফলে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের কি ধরনের পরিবর্তন হয় তা আলোচনা করব। দ্রব্যের দাম ঠিক থেকে ক্রেতার আয়, রুচি, অভ্যাস, অন্যান্য দ্রব্যের দাম ইত্যাদির পরিবর্তনের কারণে চাহিদার পরিবর্তন হয় এবং চাহিদা রেখা ডানে বা বামে স্থানান্তরিত হয়। দ্রব্যের দাম ঠিক থেকে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, উপাদানের দামের পরিবর্তন, প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন, করের প্রভাব ইত্যাদি কারণে যোগানের হ্রাস বৃদ্ধি এবং যোগান রেখা স্থানান্তরিত হয়।

চাহিদা বৃদ্ধি

চাহিদা বৃদ্ধি জনিত ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের পরিবর্তন চিত্র ৭.২ এ দেখানো হলো :

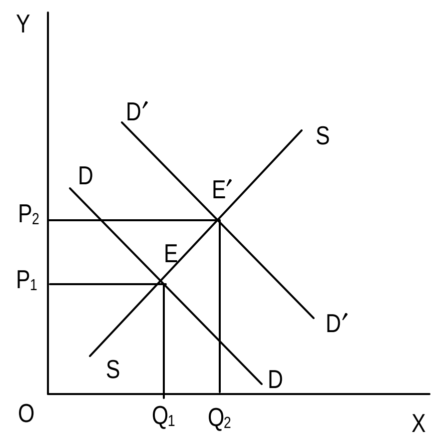

চিত্র ৭.২ : ভারসাম্যবস্থার পরিবর্তন

চিত্রে প্রাথমিক চাহিদা রেখা DD এবং যোগান রেখা SS পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। ভারসাম্য বিন্দু E এর সাথে সংশ্লিষ্ট দাম OP_1 এবং পরিমাণ OQ_1। সুতরাং ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ যথাক্রমে OP_1 এবং OQ_1 এখন মনে করি ভোক্তার আয় বেড়ে গেল। এখানে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে চাহিদা রেখা ডানদিকে সরে গিয়ে D′D′ অবস্থানে এসেছে। তবে যোগন রেখা অপরিবর্তনীয়। D′D′ ও SS রেখাদ্বয় E′ বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করেছে। ফলে নতুন ভারসাম্য দাম হলো OP_2 এবং পরিমাণ হলো OQ_2। এখানে $OP_2 > OP_1$ এবং $OQ_2 > OQ_1$। সুতরাং যোগান ঠিক থেকে চাহিদা বৃদ্ধির কারণে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ উভয়েই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চাহিদা হ্রাস

যোগান অপরিবর্তনীয় থেকে চাহিদা হ্রাস পেয়ে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ উভয়েই হ্রাস পায়। চিত্র ৭.২-এ D′D′ এবং SS কে মূল চাহিদা ও যোগান রেখা হিসেবে বিবেচনা করি। এদের ছেদ বিন্দু হলো E′। ফলে প্রাথমিক ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ হলো যথাক্রমে OP_2 এবং OQ_2। মনে করি ভোক্তার আয় কমে গেছে। ফলে চাহিদা হ্রাস পাবে এবং চাহিদা রেখা বাম দিকে সরে যাবে। ধরি চাহিদা রেখা D′D′ বামদিকে সরে গিয়ে DD অবস্থানে এসেছে। যোগান রেখা অপরিবর্তনীয়, DD রেখা এবং SS রেখা পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। তাই নতুন ভারসাম্য দাম OP_2 থেকে কমে OP_1 হয়েছে এবং ভারসাম্য পরিমাণ OQ_2 থেকে কমে OQ_1 হয়েছে।

যোগান বৃদ্ধি

চিত্র ৭.৩-এ যোগান বৃদ্ধির কারণে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের পরিবর্তন দেখান হলো:

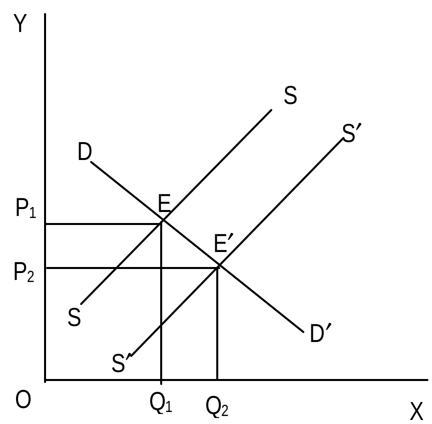

(চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ)
চিত্র ৭.৩ : ভারসাম্যের পরিবর্তন

চিত্রে মূল চাহিদা রেখা DD এবং যোগান রেখা SS। ভারসাম্য বিন্দু E এবং ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ যথাক্রমে OP_1 এবং OQ_1। মনে করি উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে, ফলে যোগান বৃদ্ধি পেল এবং যোগান রেখা ডানদিকে সরে গিয়ে S′S′ এ অবস্থান নিল। চাহিদা অপরিবর্তনীয় অবস্থায় S′S′ রেখা DD রেখাকে E′ বিন্দুতে ছেদ করেছে। ফলে ভারসাম্য দাম কমে OP_2 তে নির্ধারিত হলো এবং ভারসাম্য পরিমাণ বেড়ে OQ_2 হলো। সুতরাং চাহিদা অপরিবর্তনীয় থেকে যোগান বৃদ্ধির ফলে ভারসাম্য দাম কমে এবং ভারসাম্য পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

যোগান হ্রাস

চাহিদা অপরিবর্তনীয় থেকে যোগান হ্রাস পেলে ভারসাম্য দাম বৃদ্ধি পায় এবং ভারসাম্য পরিমাণ হ্রাস পায়। বিষয়টি চিত্র ৭.৩ এর মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা যায়। মনে করি মূল চাহিদা রেখা DD এবং যোগান রেখা S′S′। এমতাবস্থায় ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ যথাক্রমে OP_2 এবং OQ_2। কোন কারণে যোগান হ্রাস পাওয়ায় যোগান রেখা S′S′ থেকে বামে সরে SS হল। চাহিদা অপরিবর্তিত অবস্থায় নতুন যোগান রেখা চাহিদা রেখা DDকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে ফলে ভারসাম্য দাম বেড়ে OP_1 এবং ভারসাম্য পরিমাণ কমে OQ_1 হলো।

চাহিদা ও যোগানের যুগপৎ পরিবর্তন

ভারসাম্য দাম পরিমাণের পরিবর্তন চাহিদা ও যোগানের যুগপৎ্য পরিবর্তনের কারণে-ও হতে পারে। চিত্র ৭.৪-এ এমন একটি ঘটনা দেখান হলো :

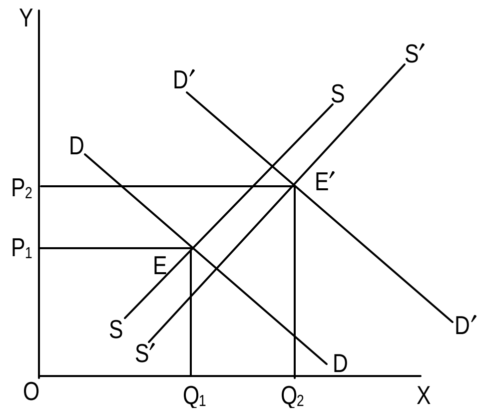

(চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ)

চিত্র ৭.৩ : ভারসাম্যের পরিবর্তন

চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় চাহিদা রেখা DD অবস্থান থেকে D′D′ অবস্থানে সরে গেছে। অন্যদিকে যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় যোগান রেখা SS থেকে ডানদিকে সরে গিয়ে S′S′ অবস্থানে গেল। ফলে ভারসাম্য বিন্দু E থেকে সরে E′-এ হলো। এমতাবস্থায় ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারসাম্য দাম OP_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OP_2 এবং ভারসাম্য পরিমাণ OQ_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OQ_2 হলো। তবে চাহিদা ও যোগানের যুগপৎ পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের পরিবর্তন কি ধরনের (হ্রাস বা বৃদ্ধি) হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তা নির্ভর করছে রেখাদ্বয়ের পরিবর্তনের দিক ও মাত্রার উপর। শুধু তাই নয়, চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়।

অনুশীলনী ৭.২

১. ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ কিভাবে নির্ধারিত হয় তা চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

পাঠ ৩ : দাম নির্ধারণের গাণিতিক বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- ভারসাম্য দাম নির্ধারণের গাণিতিক বিশ্লেষণ বর্ণনা করতে পারবেন।

আমরা ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ প্রক্রিয়া সুচী ও রেখা চিত্রের মাধ্যমে আলোচনা করেছি। বিষয়টি গাণিতিকভাবেও বিশ্লেষণ করা যায়। আমরা এ পর্যায়ে তা-ই করব। বিষয়টিকে সহজ করার জন্য আমরা চাহিদা ও যোগান ফাংশানদ্বয়কে সরল রৈখিক বিবেচনা করব।

দাম নির্ধারণের গাণিতিক মডেল:

বাজার মডেলটি নিম্নোক্ত তিনটি সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

$Qd = a - bP$ .... (১) (চাহিদা ফাংশান)

$Qs = -c + dP$ .... (২) (যোগান ফাংশান)

$Qd = Qs$ .... (৩) (ভারসাম্য শর্ত)

যেখানে Qd = চাহিদার পরিমাণ

Qs = যোগানের পরিমাণ

P = দ্রব্যের দাম

a, b, c, d প্রত্যেকেই ধনাত্মক পরামিতি।

সমীকরণ ও পরামিতিসমূহের ব্যাখ্যা

এখানে প্রথম দুটো সমীকরণ ব্যবহারসূচক, কারণ এগুলো যথাক্রমে ক্রেতা ও বিক্রেতার দাম পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করছে। তৃতীয়টি হচ্ছে ভারসাম্য শর্ত। এর বক্তব্য হচ্ছে ভারসাম্য অবস্থায় চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান।

পরামিতি "b" হচ্ছে চাহিদা রেখার ঢাল। দামের সাথে চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক ঋণাত্মক যা –b দ্বারা প্রদর্শিত হল। দাম কমতে থাকলে চাহিদার পরিমাণ বাড়বে (এবং বিপরীতক্রম); কিন্তু শূন্য দামে চাহিদার পরিমাণ হবে "a"। পরামিতি "a" হচ্ছে Qd-অক্ষের (ভূমিঅক্ষের) ছেদক। যোগান বিধি অনুযায়ী যোগান রেখার ঢাল ধনাত্মক। তাই $d>o$, আমরা জানি দাম একটি বিশেষস্তরের নিচে নেমে আসলে ঐ দ্রব্যের আদৌ কোন যোগান হবে না, কেননা ঐ দাম উৎপাদন খরচের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই যোগান রেখার ক্ষেত্রে Qs-অক্ষের (ভূমি অক্ষের) ছেদাংশ ঋণাত্মক। অর্থাৎ যখন $P=O$, তখন $Qs= -C$। কিন্তু অর্থনৈতিক চলক গুলোর মান সচরাচর অঋণাত্মক অনুমান করা হয়; এখানেও তা অনুমান করা হয়েছে $(P,Q \geq O)$। কাজেই $Qs<O$ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। দাম পরিমেয়ভাবে ধনাত্মক না হলে কোন যোগান হবে না। অর্থাৎ দাম শূন্যের বেশি না হলে কোন যোগান হবে না।

সমাধান

এখানে সমাধান বলতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয়ের কথা বলা হয়েছে। যে দামে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ সমান তা হলো ভারসাম্য দাম। ভারসাম্য দামে যে পরিমাণ পাওয়া যাবে তা হলো ভারসাম্য পরিমাণ।

আমরা জানি ভারসাম্য শর্ত হচ্ছে-

$Qd = Qs$

$\therefore a - bp = - c + dp$ (Qd এবং QS এর মান বসিয়ে)

বা $bp + dp = a + c$ (পক্ষান্তর করে)

বা $P (b + d) = a + c$

$$\therefore \bar{p} = \frac{a+c}{b+d}$$

এখানে $\bar{p}$ হচ্ছে ভারসাম্য দাম, $\bar{p}$ যে সকল পরামিতির উপর নির্ভর সেগুলো ধনাত্মক, তাই $\bar{p} > O$।

এখন $\bar{p}$ এর মান ১নং বা ২নং সমীকরণের যে কোন একটিতে বসালে ভারসাম্য পরিমাণ $\bar{Q}$ এর মান পাওয়া যাবে। আমরা $\bar{p}$ এর মান ১নং সমীকরণে বসিয়ে পাই-

$$\bar{Q}d = a - b\bar{p}$$

$$= a - b\left(\frac{a+c}{b+d}\right)$$ ($\bar{p}$ এর মান বসিয়ে)

$$= a - \frac{ab+bc}{b+d}$$

$$= \frac{a(b+d) - ab - bc}{b+d}$$

$$= \frac{ab + ad - ab - bc}{b+d}$$

$$= \frac{ad - bc}{b+d}$$

$$\therefore \bar{Q}d = \frac{ad - bc}{b+d} = \bar{Q}s \Rightarrow$$ ভারসাম্য পরিমাণ

অর্থনৈতিকভাবে অর্থবহ হতে হলে $\bar{Q}d = \bar{Q}s$ অবশ্যই ধনাত্মক হতে হবে। আর তা হওয়ার জন্য আমাদেরকে একটি শর্ত আরোপ করতে হবে। সে শর্তটি হচ্ছে $ad>bc$ আর তাই যদি হয় তবেই $\bar{Q} = \frac{ad-bc}{b+d} > o$ হবে।

সুতরাং চাহিদা ও যোগান ফাংশানের পরামিতিসমূহের মান আমরা ইচ্ছামত নির্ধারণ করতে পারি না। কেননা তাতে এমন সমাধান চলে আসবে যা অর্থনৈতিকভাবে অর্থবহ নয়। যেমন-ঋণাত্মক দাম বা পরিমাণ। এ জন্য পরামিতিগুলোর মানের উপর অবশ্যই সীমাবদ্ধতা (শর্ত) আরোপ করতে হবে। নয়ত অর্থবহ সমাধান পাওয়া যাবে না।

অনুশীলনী ৭.৩

১. ভারসাম্য দাম নির্ধারণের গাণিতিক পদ্ধতি বিশ্লেষণ কর।

উৎপাদন ও উৎপাদনের উপকরণ

ইউনিট ৮

ভূমিকা

আগের পাঠসমূহে আমরা চাহিদা, যোগান ও দাম নির্ধারণ নিয়ে যে আলোচনা করেছি তা বস্তুতঃ উৎপাদনকে নিয়ে। মানুষের নানান ধরনের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যেই অসংখ্য পণ্য উৎপাদন ও সেবাকর্মের যোগান দেয়। একটি দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ বিচার করা হয় তার উৎপাদনের ক্ষমতার উপর অর্থাৎ ঐ দেশের জ্ঞান, প্রতিষ্ঠান এবং মূলধনকে কাজে লাগিয়ে কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনে সক্ষম তার উপর নির্ভর করে। আধুনিক শিল্পোন্নত দেশসমূহে জনগণের জীবনের মান উঁচু এজন্য যে সেখানে শ্রমিকের গড় পড়তা উৎপাদন অনেক বেশি (উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা ধারণাটি দ্রষ্টব্য)।

পাঠ ১ : উৎপাদন : উপকরণ ও শ্রেণী বিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- উৎপাদন কি তা বলতে পারবেন।
- উপযোগের শ্রেণী বিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

উৎপাদন কাকে বলে ?

আপনি একটি চেয়ারে বসে পড়াশুনা করেন। প্রকৃতিতে তৈরি অবস্থায় চেয়ারটি পাওয়া যায় না। গাছ কেটে, প্রয়োজনমত চিরে, কাঠমিস্ত্রির সহায়তায় এটি তৈরি করতে হয়েছে। প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত গাছ থেকে সংগৃহীত কাঠের ধরন পরিবর্তন করে চেয়ার উৎপাদন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ কোন পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে না। যদিও সাধারণতঃ উৎপাদন বলতে কোন দ্রব্য সৃষ্টি করা বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে উৎপাদন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন বলতে অর্থনীতিতে উপযোগ সৃষ্টি বুঝায়। বস্তুতঃ মানুষ কোন পদার্থ সৃষ্টি করতে পারেনা, ধ্বংসও করতে পারে না। মানুষ শুধু প্রকৃতি প্রদত্ত কোন বস্তু বা পদার্থের রূপান্তর বা আকারগত পরিবর্তন ঘটিয়ে উপযোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধি করতে পারে। অধ্যাপক মার্শাল বলেন, "এই বস্তুজগতে মানুষ যাহা করিতে পারে তা শুধু এই যে, সে বস্তুকে অধিকতর কার্যোপযোগী করিবার জন্য উহার পুনর্বিন্যাস করিতে পারে কিংবা বস্তুকে এমনভাবে স্থাপন করিতে পারে যাহাতে প্রকৃতি উহাকে অধিকতর কার্যোপযোগী করিয়া তোলে।" যেমন কৃষক বীজ হতে ফসল উৎপাদন করে; তাঁতী তুলা হতে কাপড় উৎপাদন করে। এ সকল দ্রব্যের বেশীরভাগ প্রকৃতির দান। মানুষ নিজের শ্রম, মেধা ও পুঁজি কাজে লাগিয়ে প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তুকে অধিকতর উপযোগী করে তোলে। তাই উৎপাদন মানে উপযোগ বা কাম্যতা সৃষ্টি। অন্যকথায় উৎপাদন মানে হচ্ছে,

দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য সৃষ্টি করা। উপযোগ সৃষ্টি বিভিন্ন ধরনের হতে পরে। তুলাকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে কাপড়ের কল যে রঙিন শাড়ী তৈরি করে তার মূল্য তুলার মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি। এভাবে তুলার মূল্যের সাথে শাড়ীর মূল্য সংযোজিত হয়ে অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে লোহার টিনের সিট থেকে শিল্প শ্রমিক আলমারি তৈরি করে, কৃষক জমিতে আধুনিক উপকরণ (পানি সেচ ব্যবস্থা, সার, উফসী বীজ ইত্যাদি) ব্যবহার করে অধিক কৃষিপণ্য উৎপন্ন করে, শিক্ষক শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানুষকে উন্নত জীবনের পথ নির্দেশ করে। এগুলো সবই উৎপাদনের কাজ।

উপযোগের শ্রেণীবিভাগ

মানুষ প্রধানত প্রকৃতি-প্রদত্ত পদার্থের আকার, স্থান, সময় ও মালিকানা পরিবর্তন ঘটিয়ে উপযোগ সৃষ্টি করে। তাই উপযোগকে প্রধানতঃ চারভাগে ভাগ করা হয়। যথা (১) রূপগত উপযোগ, (২) স্থানগত উপযোগ, (৩) সময় বা কালগত উপযোগ এবং (৪) হস্তান্তরযোগ্য উপযোগ।

১. **রূপগত উপযোগ :** প্রকৃতি প্রদত্ত কোন বস্তুর রূপ বা আকার পরিবর্তন করে যে উপযোগ সৃষ্টি করা হয় তাকে রূপগত উপযোগ বলা হয়। যেমন, কাঠের রূপ বা আকৃতি পরিবর্তন করে চেয়ার বা আসবাবপত্র তৈরি, তুলার রূপ পরিবর্তন করে কাপড় তৈরি করাকে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি বলা হয়।

২. **স্থানগত উপযোগ :** কোন দ্রব্যকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করে উপযোগ সৃষ্টি করা যায়। একে স্থানগত উপযোগ বলা হয়। যেমন, গ্রামাঞ্চল থেকে শাকসব্জি শহরে এনে এর উপযোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধি করা যায়। নদী থেকে মাছ শহরের বাজারে আনলে বেশি দামে বিক্রি হয়।

৩. **সময় বা কালগত উপযোগ :** কোন কোন দ্রব্যের উপযোগ সময়ের ব্যবধানের জন্য বিভিন্ন হয়ে থাকে। কোন দ্রব্য উৎপাদনের পর কিছুকাল মজুদ রাখলে উপযোগ বৃদ্ধি পায়। এরূপ উপযোগকে সময়গত বা কালগত উপযোগ বলে যেমন, ফসল কাটার পর কিছুকাল সংরক্ষণের পর বিক্রি করলে বেশি মূল্য পাওয়া যায়।

৪. **হস্তান্তরযোগ্য বা মালিকানার উপযোগ:** কোন এক ব্যক্তির কাছে কোন পণ্যের উপযোগ কম, অথচ ঐ পণ্যটির উপযোগ আরেক ব্যক্তির কাছে বেশি। এমতবস্থায়, পণ্যটি হস্তান্তর হলে উপযোগ বৃদ্ধি পায়। যেমন-গৃহস্থের বাড়ীতে নারিকেলের ছোবড়ার তেমন মূল্য নেই, কিন্তু ছোবড়া শিল্পের মালিকের কাছে এর মূল্য অনেক বেশি।

পণ্যের উৎপাদনের আলোচনার সঙ্গে সেবা কর্মের সৃষ্টি ও বৃদ্ধির আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত। মানুষ তার শ্রম ও সেবা কর্মের দ্বারা যে উপযোগ বৃদ্ধি বা সৃষ্টি করে তাকে সেবাগত উপযোগ বলে।

উৎপাদনের উপাদান

কোন কিছু উৎপাদনের জন্য যে সকল বস্তু বা সেবাকর্ম প্রয়োজন হয় ঐগুলিকে উৎপাদনের উপাদান বলা হয়। এগুলি হল ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। যেমন-ধান উৎপাদন করতে হলে শুধু ভূমি হলেই চলবে না, অন্য তিনটি উপাদানেরও প্রয়োজন হয়। তেমনি শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে কেবলমাত্র কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি থাকলেই হবে না, একই সঙ্গে ভূমি, শ্রম, নগদ টাকা ও সংগঠন আবশ্যক। অবশ্য আধুনিককালে উপাদান হিসেবে শ্রমের সংগে সংগঠনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নিম্নে উৎপাদনের উপাদানসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১. **ভূমি :** সাধারণতঃ পৃথিবীর উপরিভাগকে ভূমি বলা হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে ভূমি বলতে শুধু ভূ-পৃষ্ঠকেই বুঝায় না, বরং প্রাকৃতিক সকল সম্পদকে বুঝায়। অর্থাৎ মাটির উর্বরাশক্তি, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, তাপ, জল, বাতাস, সূর্যের আলো, খনিজ সম্পদ, বন, মৎস্যক্ষেত্র, খাল-বিল, নদ-নদী, সমুদ্র প্রভৃতি যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমির অন্তর্গত। এ সমস্ত কিছুই প্রকৃতির দান। ইহা উৎপাদনের একটি আদি ও মৌলিক উপাদান।

২. **শ্রম :** উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। শ্রমের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে সেগুলিকে ব্যবহারের জন্য আরো উপযোগী করে তোলে। শ্রমও উৎপাদনের একটি আদি ও অপরিহার্য উপাদান। স্যার উইলিয়াম পেটি (Sir Willian Petty) বিষয়টিকে আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করে বলেছেন, " উৎপাদনের শ্রমিক হল পিতা এবং ভূমি হল মাতা।'

৩. **মূলধন :** মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপাদিত হয়ে যে বস্তু সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত না হয়ে পুনরায় উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধন বলে। যেমন, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, ঘর,বাড়ী, কলকারখানা প্রভৃতি মানুষের উৎপাদিত দ্রব্য যা উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে মূলধন বলা হয়।

৪ **সংগঠন :** আধুনিককালে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে একত্রিত করে এগুলিকে উৎপাদন কার্যে নিয়োগ করার উদ্যোগকে সংগঠন বলে। উৎপাদন পদ্ধতির জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সংগঠনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই দক্ষ সংগঠনের প্রয়োজন বেড়ে চলছে। যারা একাজ করে তাদেরকে উদ্যোক্তা বা সংগঠক বলে। সংগঠককে উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়, পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হয় এবং ব্যবসায়ের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করতে হয়।

অনুশীলনী ৮.১

১. উৎপাদন কাকে বলে? উৎপাদনের উপকরণসমূহ কি কি? বর্ণনা করুন।

পাঠ ২ : ভূমির বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ভূমি কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- ভূমির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- উৎপাদনে ভূমির ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ভূমির সংজ্ঞা

উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হল ভূমি। সাধারণ অর্থে ভূমি বলতে মৃত্তিকা বা ভূ-ত্বক বা ভূ-পৃষ্ঠকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে 'ভূমি' ধারণাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে ভূমি বলতে উৎপাদনের সহায়ক সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদকে বুঝায়। পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ, জল-স্থল, আলো-বাতাস, বৃষ্টিপাত, মাটির উর্বরা শক্তি, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, খনিজ দ্রব্য, খাল-বিল প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমির অন্তর্ভুক্ত। মানুষ এগুলি সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং উৎপাদন কার্যে সহায়ক প্রাকৃতিক সকল সম্পদকে অর্থনীতিতে 'ভূমি' বলে।

ভূমির বৈশিষ্ট্য

ভূমি উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান থেকে ভিন্ন। ভূমির বৈশিষ্ট্যসমূহই একে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানসমূহ থেকে পৃথক করে রেখেছে। নিম্নে ভূমির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল :

১. **ভূমি প্রকৃতির দান :** ভূমি প্রকৃতির দান, মানুষ ভূমি সৃষ্টি করেনি। এর কোন উৎপাদন খরচ বা দাম যোগান নেই। ফলে ভূমি সৃষ্টির জন্য মূলতঃ কোন প্রচেষ্টা বা ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। তবে এ ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। কারণ বন কেটে বসতি বা মরুভূমিতে জলসেচ করে বা সমুদ্র উপকূলে বাঁধ দিয়ে জমি উদ্ধার প্রভৃতি কাজে যে সফলতা অর্জিত হচ্ছে এটি অবশ্যই মানুষের চেষ্টার দান এবং এর যোগান দামও আছে। কিন্তু এরূপ প্রয়াস খুবই সীমিত। এজন্যই স্বল্পকালীন ভিত্তিতে জমির যোগান সীমাবদ্ধ ধরা হয়। আবার অনেক জমিকে চাষযোগ্য বা উর্বরা করে গড়ে তুলতে খরচ করতে হয়।

২. **ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ :** ভূমির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে এর যোগান সীমাবদ্ধ। পৃথিবীতে ভূমিসহ প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। মানুষের চেষ্টায় এর হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব নয়। তবে ব্যবহারযোগ্য ভূমির পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটতে পারে। মানুষের অবহেলা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ যেমন হ্রাস পেতে পারে, তেমনি মানুষের প্রচেষ্টায় পতিত জমি পুনরুদ্ধার করে পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে।

৩. **উর্বরাশক্তির তারতম্য :** ভূমির অপর বৈশিষ্ট এই যে, সকল ভূমি সমজাতীয় বা একই গুণ সম্পন্ন নয়। অর্থাৎ সকল ভূমির উর্বরতা শক্তি একরূপ নয়। তেমনি সকল কয়লাখনিতে

বা তেলকূপে একই জাতীয় কয়লা বা তেল পাওয়া যায় না। তাছাড়া অবস্থানের দিক থেকেও তারতম্য রয়ে গেছে। কোন জমি অবস্থানের দিক অন্যটির চেয়ে উন্নত থাকে।

৪. **ভূমি স্থানান্তরযোগ্য নয় :** ভূমি স্থানান্তর করা যায় না অর্থাৎ এক যায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অন্যান্য উপাদান যেমন শ্রম ও মূলধন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায়। ভূমির ক্ষেত্রে ভৌগোলিক গতিশীলতা নেই।

৫. **ভূমি স্থায়ী উপাদান :** ভূমি অবিনশ্বর, এর কোন ক্ষয় নেই। তাই এটি একটি স্থায়ী উপাদান। কিন্তু অন্যান্য উপাদান যেমন, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি অস্থায়ী।

৬. **ভূমিতে হ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর :** কোন এক খন্ড জমিতে বেশি উৎপাদনের লক্ষ্যে অধিক পরিমাণ শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করলেও উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পায়। এটাই হল ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি। অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রে এমনটি প্রযোজ্য হলেও ভূমির ক্ষেত্রেই এই বিধি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

অনুশীলনী ৮.২

১. ভূমি কি? ভূমির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ ৩ : শ্রম : শ্রমের দক্ষতা ও গতিশীলতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- শ্রমের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- শ্রমের যোগান কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা বলতে পারবেন।
- শ্রমের দক্ষতা কি এবং কিসের উপর নির্ভর করে তা বলতে পারবেন।

শ্রমের সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থে শ্রম বলতে মানুষের কায়িক পারিশ্রমকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে শ্রম শব্দটি বিশেষ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন কাজে নিয়োজিত সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক কাজ ও সেবাকর্ম এবং যার বিনিময়ে পরিশ্রমিক পাওয়া যায় তাকেই শ্রম বলা হয়। একজন কৃষক, শিল্প শ্রমিক, বা রিকসা চালকের শারীরিক পরিশ্রম যেমন শ্রম, তেমনি একজন শিক্ষকের শিক্ষাদান বা ডাক্তারের পরামর্শ তেমনি তার বুদ্ধিজাত শ্রম। বস্তুত : মানুষ পরিশ্রমের বিনিময়ে যা কিছু অর্জন করে তাকেই শ্রম বলে। অবশ্য মানুষের সব কাজই শ্রম রূপে গণ্য নয়। কোনরূপ অর্থ উপার্জন ছাড়া কেবল স্নেহের জন্য বা আনন্দ লাভের জন্য যে পরিশ্রম করা হয় তা শ্রম নয়। তাই সন্তান প্রতিপালনের জন্য মাতা-পিতার পরিশ্রম বা কষ্টকে শ্রম বলা হয় না।

শ্রমের বৈশিষ্ট্য

শ্রম উৎপাদনের একটি আদি ও মৌলিক উপাদান। উৎপাদনের উপাদান হিসেবে শ্রমের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে।

নিচে এগুলো আলোচনা করা হল :

১. **শ্রম একটি জীবন্ত উপাদান :** শ্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি ভূমি ও মূলধনের মতো প্রাণহীন একটি জড় পদার্থ নয়। শ্রম শ্রমিকের দৈহিক ও মানসিক শক্তি একটি জীবন্ত উপাদান। পারিশ্রমিকের জন্য শ্রমিক পরিশ্রম দিলেও তার অনুভূতি সত্ত্বা থাকে। শ্রমিকের জীবদ্দশায় তার শ্রম জীবন্ত ও কর্মক্ষম থাকে।

২. **শ্রম ও শ্রমিক অবিচ্ছেদ্য :** শ্রমের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল যে শ্রমিক ও শ্রম অবিচ্ছেদ্য। ভূমি ও ভূমির মালিক, মূলধন ও মূলধনের মালিক এক নয়, এরা স্বতন্ত্র। কিন্তু শ্রমিক থেকে শ্রমকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

৩. **শ্রম গতিশীল :** শ্রমের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এটি অন্যান্য উৎপাদনের তুলনায় গতিশীল। ভূমির কোন ভৌগোলিক গতিশীলতা নেই, মূলধনের গতিশীলতাও কম। কিন্তু শ্রম অত্যন্ত গতিশীল। কারণ, বিশেষ করে বর্তমানকালে শ্রমিক একস্থান থেকে অন্যস্থানে, এক পেশা থেকে অন্য পেশায় চলে যেতে পারে।

৪. **শ্রম ক্ষণস্থায়ী :** শ্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে, এটি ক্ষণস্থায়ী এবং এর সঞ্চয় সম্ভব নয়। অন্যান্য উপাদান যেমন, ভূমি ও মূলধন কিছুকাল ব্যবহার না করলেও তা ধ্বংস হয়ে যায় না; কিন্তু শ্রম উৎপাদন কাজে ব্যবহার না করলে নষ্ট হয়ে যায়। কোন শ্রমিক একদিন বা এক ঘন্টা কাজ না করলে ঐ সময় নষ্ট হয়ে যায়, যা কোনদিন ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়।

৫. **শ্রমিকের দর কষাকষির ক্ষমতা কম :** উদ্বৃত্ত শ্রমিকের দেশে বিশেষ করে শ্রমের ক্ষণস্থায়ী চরিত্রের কারণে দর কষাকষিতে শ্রমিকদের অবস্থান সুবধিাজনক হয় না। বেশি দিন বেকার

থাকার ঝুঁকি অনেকে নিতে চান না। এজন্য স্বল্প মজুরীতে অনেক শ্রমিক কাজ করেন। অবশ্য শ্রমিকগণ ট্রেড-ইউনিয়নের মাধ্যমে মালিক পক্ষের সাথে দর কষাকষি করতে পারে।

৬. **উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমিকের উপস্থিতি অপরিহার্য :** জমিতে ফসল ফলাতে জমির মালিকের উপস্থিতি অপরিহার্য নয়। কিন্তু উৎপাদনের সময় শ্রমিকের উপস্থিতি অপরিহার্য। স্বশরীরে উপস্থিত থেকেই তাকে শ্রমের যোগান দিতে হয়।

৭. **শ্রমের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি সময় সাপেক্ষ :** শ্রমের যোগান ভূমির মতো একেবারে নির্দিষ্ট না হলেও এর হ্রাস বৃদ্ধি সময় সাপেক্ষ। তাই শ্রমের চাহিদা পরিবর্তনের সাথে সাথে এর যোগানের পরিবর্তন সম্ভব নয়। কারণ, শ্রমের যোগান একটি দেশের জন্মহার, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। তাই মজুরী বাড়লেও শ্রমের যোগান দ্রুত বাড়ে না, আবার মজুরী কমলেও যোগান দ্রুত কমেনা। তাই স্বল্পকালে শ্রমিকের যোগান সীমাবদ্ধ থাকে।

উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল শ্রম

শ্রমকে উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তবে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায় এ নিয়ে অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে মতভেদ আছে। নিচে বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

ফিজিওক্র্যাটদের ধারণা : অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে ফিজিওক্র্যাট নামে পরিচিত এক শ্রেণীর লেখকদের আর্বিভাব ঘটে।তাঁদের মতে, যে শ্রম অতিরিক্ত কিছু উৎপাদন করে তাকে উৎপাদনশীল শ্রম বলা হয়। অপরপক্ষে যে শ্রম অতিরিক্ত কোন কিছু উৎপাদন করে না তাকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলা হয়। এ ধারণা অনুযায়ী কেবল যে সমস্ত শ্রমিক কৃষি ক্ষেত্রে ও শিল্প কারখানায় নিয়োজিত আছে তাদের শ্রমকে উৎপাদনশীল বলা হয়। পক্ষান্তরে ব্যবসায় বা অন্যান্য কাজে নিয়োজিত শ্রমিক যারা নতুন কিছু উৎপাদন করে না সেগুলি অনুৎপাদনশীল শ্রম।

ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদ : এ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো, জে,এস,মিল প্রমুখ ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের মতে, যে শ্রমের দ্বারা বস্তুজাত কোন দ্রব্য উৎপাদন করা হয় তাকে উৎপাদনশীল শ্রম বলা হয়। অর্থাৎ কৃষক, তাঁতী, শ্রমিক বস্তুগত দ্রব্য উৎপাদন করে বলে তাদের শ্রমকেই উৎপাদনশীল শ্রম বলে। পক্ষান্তরে, যে শ্রমের সাহায্যে দৃশ্যমান বা বস্তুজাত কোন দ্রব্য উৎপাদিত হয় না সেই শ্রমকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলে গণ্য করা হয়। এই সংজ্ঞানুযায়ী, শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী, গায়ক প্রভৃতির কাজকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলা হয়।

আধুনিক মতবাদ : আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ ফিজিওক্র্যাট বা ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের মতবাদ সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে, যে শ্রম কোন উপযোগ সৃষ্টি করে তাকেই উৎপাদনশীল শ্রম বলা হয়। এ ধারণা অনুযায়ী, শ্রম বস্তুজাত ও অবস্তুজাত যাই উৎপন্ন করুক না কেন, যদি তা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে তা হলে সেটা উৎপাদনশীল শ্রম। উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি বুঝায়। সুতরাং ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল, গায়ক, কবি প্রভৃতি সকলের শ্রমই উৎপাদনশীল। কারণ, সমাজে তাদের সেবার চাহিদা অছে। অপরপক্ষে যে শ্রম, কোন উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে না, যার কোন বিনিময় মূল্য নেই, তাকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলা হয়।

শ্রমের যোগান ও দক্ষতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?

শ্রমের যোগান বলতে একটি দেশের অভ্যন্তরে কাজ করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক ব্যক্তিদেরকে বুঝায়। অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যার সেই অংশকে বুঝায় যারা উৎপাদনে শ্রম দানে সক্ষম। শ্রমের যোগান দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা : (১) জনসংখ্যা ও (২) শ্রমের দক্ষতা

১. **জনসংখ্যা :** জনসংখ্যাই সকল শ্রমের উৎস। কোন দেশের শ্রমের যোগান সেই দেশের মোট জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। যে দেশে যত বেশি লোক বাস করে সে দেশে শ্রমের যোগান তত অধিক। পক্ষান্তরে, যে দেশে লোকসংখ্যা কম সেখানকার শ্রমের যোগান তুলনামূলকভাবে তত কম। তবে শ্রমের যোগান হিসেব করতে জনসমষ্টির যে অংশ কর্মক্ষম তাদেরকেই ধরতে হবে। অতি বৃদ্ধ, শিশু, উন্মাদ ইত্যাদি শ্রম হিসেবের সময় বিবেচনায় আসে না।

২. **শ্রমের দক্ষতা :** শ্রমের দক্ষতা ও নিপুণতা শ্রমের যোগান বাড়ায়। একই পরিমাণ শ্রম সম্পন্ন দুটি দেশের যে দেশের শ্রমের দক্ষতা বেশি সেই দেশের শ্রমের যোগান বেশি বিবেচিত হবে। শ্রমের দক্ষতা না বাড়ায়ে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ালেই যে শ্রমের যোগান বাড়বে এমন নয়। শ্রমের সংখ্যা কম থাকলেও তারা যদি দক্ষ হয় তবে শ্রমের যোগান বাড়বে। আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতিতে শ্রমিকের দক্ষতার গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই শ্রমিকের দক্ষতার উপর শ্রমের যোগান বহুলাংশে নির্ভরশীল।

শ্রমের যোগান কাজের সময়ের উপরও নির্ভর করে। দুটি দেশে যদি শ্রমিকের সংখ্যা একই হয় কিন্তু একটি দেশের শ্রমিক সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা এবং অপর দেশে সপ্তাহে ৪৪ ঘন্টা কাজ করে তবে শেষোক্ত শ্রমিকের যোগান বেশি হবে।

শ্রমের দক্ষতা

শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতাকে শ্রমের দক্ষতা বলা হয়। বস্তুত: দক্ষ শ্রম শক্তি যে কোন দেশের একটি মূল্যবান সম্পদ। শ্রমিকের যোগান কেবল জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে না, বরং শ্রমিকের কর্মদক্ষতার উপরও নির্ভর করে। সুতরাং শ্রমিকের সংখ্যা না বাড়িয়ে কেবল তাদের দক্ষতা বাড়িয়ে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়। এভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে সমস্যা সৃষ্টি না করে শ্রমের দক্ষতা বাড়িয়ে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায়।

শ্রমের দক্ষতা অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এগুলি হল :

১। কাজ করার যোগ্যতা
২। কাজ করার ইচ্ছা
৩। সংগঠনের দক্ষতা
৪। কারখানার পরিবেশ

নিম্নে বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো-

১. কাজ করার ক্ষমতা

শ্রমিকের কাজ করার ইচ্ছা আবার কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা : (ক) দৈহিক যোগ্যতা, (২) কারিগরি যোগ্যতা, (গ) বুদ্ধিগত যোগ্যতা এবং (ঘ) নৈতিক যোগ্যতা।

ক. **দৈহিক যোগ্যতা :** শ্রমিকের দক্ষতা বহুলাংশে তার দৈহিক যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। একজন সুস্থ ও সবল শ্রমিক একজন অসুস্থ ও দুর্বল শ্রমিক অপেক্ষা অধিক কাজ করতে সক্ষম। দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু, উন্নত খাদ্য, ভাল পোষাক পরিচ্ছদ, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান প্রভৃতি শ্রমিকদের কর্মনৈপুণ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, শীত প্রধান দেশে শ্রমিকগণ অধিক কাজ করতে পারে। তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে না। অন্যদিকে, গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শ্রমিকগণ অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দীর্ঘসময় ধরে কাজ করতে সক্ষম হন না। তাছাড়া জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণেও শ্রমিকদের দৈহিক যোগ্যতা অধিক হয়। যেমন, ইংরেজরা বংশগত কারণে বাংলাদেশীদের তুলনায় দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী।

খ. **কারিগরি যোগ্যতা :** কারিগরি যোগ্যতা বলতে বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ কর্মদক্ষতাকে বুঝায়। কারিগরি যোগ্যতা গড়ে তুলতে কারিগরি জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এই কারিগরি

যোগ্যতা শ্রমিকদের দক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করতে পারে। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদানের বিষয়টির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ. **বুদ্ধিগত যোগ্যতা :** বুদ্ধিগত যোগ্যতা শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। এই বুদ্ধিগত যোগ্যতা প্রধানতঃ শিক্ষার উপর নির্ভর করে। উপযুক্ত শিক্ষা দিক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত শ্রমিকগণ কর্মে উৎসাহী ও উদ্যোগী হয়। এতে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। এজন্যই নিঃসন্দেহে শিক্ষিত শ্রমিক অশিক্ষিত শ্রমিকের চেয়ে অধিক কর্মদক্ষ।

ঘ. **নৈতিক যোগ্যতা :** শ্রমিকের নৈতিক চরিত্রের উপর তার কর্মদক্ষতা নির্ভর করে। যে শ্রমিক সৎ ও বিশ্বাসী তার কর্মদক্ষতা বেশি। কর্তব্যনিষ্ঠ, দায়িত্ব সম্পন্ন ইত্যাদি গুণের অধিকারী শ্রমিক স্বাভাবিকভাবেই অধিক কর্মদক্ষতার অধিকারী হবে। অপরপক্ষে, নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটলে শ্রমিকগণ ফাঁকিবাজ ও কাজে অমনোযোগী হয়ে পড়ে এবং তাদের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

২. কাজ করার ইচ্ছা

শ্রমিকদের দক্ষতা তাদের কাজ করার ইচ্ছার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। শ্রমিকদের কাজের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত টান ও উৎসাহ না থাকলে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে না। এই ইচ্ছা আবার নির্ভর করে কাজের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা, ভবিষ্যত সফলতা ও উন্নতির সম্ভাবনা এবং ঐ কাজে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, বৈচিত্র্য ও প্রকৃতির উপর। যে সব কাজে ক্রমাগত বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির সুবিধা আছে শ্রমিকগণ সে সব কাজে নিয়োজিত থাকতে উৎসাহ পায়। চাকুরীর স্থায়িত্ব, পুরস্কারের ব্যবস্থা, অবসর ভাতা, নিয়মিত মজুরী, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ প্রভৃতি শ্রমিকগণের কাজ করার ইচ্ছা বৃদ্ধি করে।

৩. সংগঠনের দক্ষতা

সংগঠনের দক্ষতার উপরও শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে। সংগঠক (বা মালিক) উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। মালিকের সংগঠন ক্ষমতা উচ্চমানের হলে বা উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হলে তার অধীনে শ্রমিকগণ সহজেই দক্ষ হয়ে উঠে।

৪. কারখানার পরিবেশ

কারখানার পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিচ্ছন্নতা, প্রচুর আলো বাতাস, ব্যক্তি স্বাধীনতা, অংশীদারিত্বে ব্যবস্থাপনা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি বিষয়ও শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। তাছাড়া, উন্নতমানের আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তিগত উত্তরণ শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দেয়।

৫. সামাজিক নিরাপত্তা

সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দেয়। অসুস্থতা, বেকারত্ব, দুর্ঘটনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের সুবিধা থাকলে শ্রমিকগণ কাজে উৎসাহ পায় এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে। ফলে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

শ্রমের গতিশীলতা

শ্রমের গতিশীলতা বলতে শ্রমিকদের একস্থান থেকে অন্য স্থানে গমন, এক পেশা ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ, এক প্রতিষ্ঠান ছেড়ে অন্য প্রতিষ্ঠানে যোগদান, এমন কি একই প্রতিষ্ঠানের একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে নিয়োগপ্রাপ্তি ইত্যাদিকে বুঝায়। অর্থাৎ শ্রমিকগণের নিজেদের সুবিধামত প্রতিষ্ঠান, পেশা, কর্মস্থান পরিবর্তনের সুবিধা থাকা। শ্রমিকদের এই স্থানান্তরকে শ্রমের গতিশীলতা বলে। যেমন একজন যশোরের গ্রামাঞ্চল থেকে ঢাকায় চাকুরী গ্রহণ, আইন ব্যবসা ত্যাগ করে সহকারী জজের চাকুরী গ্রহণ, ব্যাংকের অফিস সহকারী থেকে অফিসার পদে উন্নীত

হওয়া, সাটলিপিকার থেকে কম্পিউটার অপারেটর হওয়া এভাবে স্থান, প্রতিষ্ঠান, অবস্থান পরিবর্তন করাই শ্রমের গতিশীলতা নামে পরিচিত।

শ্রমের গতিশীলতা চার প্রকারের হতে পারে যথা- (১) ভৌগোলিক গতিশীলতা, (২) শিল্পগত গতিশীলতা (৩) পেশাগত গতিশীলতা এবং (৪) স্তরগত গতিশীলতা।

১. **ভৌগোলিক গতিশীলতা :** কোন শ্রমিক চাকুরীর জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচলকে ভৌগোলিক গতিশীলতা বলে। যেমন, মাগুরা বস্ত্রকলের একজন শ্রমিক নারায়ণগঞ্জের একটি বস্ত্রকলে চাকুরী গ্রহণ করতে পারে। শ্রমিকের এরূপ স্থান পরিবর্তনকে ভৌগোলিক বা স্থানগত গতিশীলতা বলা হয়।

২. **শিল্পগত গতিশীলতা :** কোন শ্রমিক যখন এক শিল্প ত্যাগ করে অন্য একটি শিল্পে যোগদান করে তখন তাকে শিল্পগত গতিশীলতা বলে। যেমন, একজন পাটকল শ্রমিক বস্ত্রকলে কাজে যোগদান করে এরূপ এক শিল্প ত্যাগ করে অন্য শিল্পে যোগদান করাকে শিল্পগত গতিশীলতা বলে।

৩. **পেশাগত গতিশীলতা :** যখন কোন শ্রমিক একটি পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশা গ্রহণ করে তখন তাকে পেশাগত গতিশীলতা বলে। যেমন, একজন অধ্যাপক তাঁর অধ্যাপনা ছেড়ে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক অফিসারের দায়িত্ব গ্রহণ করে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে, তখন এরূপ পরিবর্তনকে পেশাগত গতিশীলতা বলে। অথবা একজন রিকশা চালক নিজ পেশা ছেড়ে যদি বস্ত্র কলের শ্রমিকের পেশা গ্রহণ করে তবে শ্রমিকের এই পেশা পরিবর্তনকে পেশাগত গতিশীলতা বলে। এরূপ পরিবর্তন আবার দু'ধরনের হতে পারে। যদি একজন কম্পিউটার অপারেটর সরকারী অফিস ছেড়ে বেসরকারী অফিসে ঐ একই কাজ গ্রহণ করে এরূপ পরিবর্তনকে অনুভূমিক গতিশীলতা বা সমান্তরাল গতিশীলতা বলে। এখানে কাজের ধরনে তেমন পরিবর্তন আসে না। অপরপক্ষে, যদি শ্রমিক কোন প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার অপারেটর পদ থেকে নতুন প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার প্রোগ্রামারের পদে আসীন হয় তবে এরূপ পরিবর্তনকে উল্লম্ব গতিশীলতা বলা হয়।

৪. **স্তরগত গতিশীলতা :** কোন শ্রমিক যখন একই উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে গমন করে তখন এরূপ পরিবর্তনকে স্তরগত গতিশীলতা বলে। যেমন, গার্মেন্টস কারখানার একজন শ্রমিক সেলাই কাজে দক্ষতা প্রদর্শন করে সুপারভাইজারের কাজে নিয়োজিত হতে পারে যা স্তরগত গতিশীলতা বলা হয়।

অনুশীলনী ৮.৩

১. শ্রম কি? শ্রমের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।
২. উৎপাদনশীল ও অনুপাদনশীল শ্রমের মধ্যে তফাৎ বর্ণনা করুন।
৩. শ্রমের দক্ষতা বলতে কি বুঝায়? শ্রমের দক্ষতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? বর্ণনা করুন।
৪. শ্রমের গতিশীলতা কি? শ্রমের গতিশীলতা কি কি রকমের হতে পারে? বর্ণনা করুন।

পাঠ ৪ : পুঁজি বা মূলধন : সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পুঁজির বা মূলধনের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পুঁজির বৈশিষ্ট্য কি কি তা বলতে পারবেন।
- পুঁজিগঠন কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মূলধনের দক্ষতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা বলতে পারবেন।

পুঁজি বা মূলধন কি?

সাধারণ অর্থে, পুঁজি বা মূলধন বলতে ব্যবসায়ে নিয়োজিত টাকা পয়সাকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে মূলধন শব্দটি বিশেষ অর্থ জ্ঞাপন করে। মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যয়িত না হয়ে পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় এবং নতুন আয় প্রবাহ সৃষ্টি করে তাকে মূলধন বলে। মূলধন মানব সৃষ্ট, প্রকৃতি প্রদত্ত নয়। যেমন, বঙ্গবন্ধু বহুমুখী যমুনা সেতু, রেল লাইন, কারখানা, কাঁচামাল, কৃষকের লাঙ্গল, অফিস, গুদাম, ওয়ারলেস সেট ইত্যাদি মূলধন। অর্থনীতিবিদ বম ওয়ার্কের ভাষায়, মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান। (Capital is the produced means of production)। অর্থনীতিবিদ চ্যাপম্যান বলেন, "যে সম্পদ কোন আয় সৃষ্টি করে অথবা উপার্জনে সহায়তা করে তা-ই হল মূলধন। (Capital is wealth which yields an income or aids in the production of an income)। কোন দ্রব্য মূলধন হিসেবে গণ্য হবে কিনা তা ঐ দ্রব্যের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বাড়ী-ঘর যখন বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন এটা মূলধন নয়। কিন্তু ঐ বাড়ী-ঘর যদি অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন এটা মূলধন। সুতরাং যে সব দ্রব্য সামগ্রী মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপাদিত এবং যা বর্তমান ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে অধিক উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকেই অর্থনীতিতে পুঁজি বা মূলধন বলা হয়।

মূলধনের বৈশিষ্ট্য

মূলধন হল উৎপাদনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নিম্নে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্য মূলধনকে অন্যান্য উপাদান থেকে পৃথক বলে গণ্য করা হয়। যথা :

১. **মূলধন উৎপাদনশীল :** আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা মূলধনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। পুঁজি উৎপাদন ক্ষেত্রে মূলধনের গুরুত্ব আরো অধিক। যেমন, খালি হাতের চেয়ে জাল দিয়ে অধিক পরিমাণ মাছ ধরা যায়। অত্যাধুনিক জালের সাহায্যে আরো অধিক পরিমাণ মাছ ধরা হয়। সুতরাং পুঁজি নতুন পণ্য ও সেবা উৎপাদন করতে সাহায্য করে।

২. **মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান :** মূলধনের অপর বৈশিষ্ট্য হল যে, এটি উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান। ভূমি বা শ্রমের ন্যায় মূলধন কোন মৌলিক উৎপাদন নয়। মানুষের শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদের যৌথ প্রচেষ্টায় মূলধন সৃষ্টি হয় যা মানুষ সরাসরি ভোগ না করে ভবিষ্যৎ উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করে।

৩. **মূলধন অতীত শ্রমের ফল :** মূলধন মানুষের অতীত শ্রমের পুঞ্জিভুত ফল। যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, কাঁচামাল প্রভৃতি দ্রব্যাদি যা মূলধন হিসেবে গণ্য হয় তা মানুষের পরিশ্রমের দ্বারা সৃষ্টি। জমির মতো এটি প্রাকৃতিক উপাদান নয়।

৪. **মূলধন সঞ্চয়ের ফল :** মূলধন হল সঞ্চয়ের ফল। মূলধন বৃদ্ধির জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। মূলধন গঠন করতে হলে বর্তমান আয় বা উৎপাদনের একটি অংশ ভোগে না লাগিয়ে উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয়। তাই মূলধন সৃষ্টি করতে মানুষকে তার আয়ের একাংশ বর্তমান ভোগে ব্যবহার না করে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে হবে।

৫. **মূলধন অস্থায়ী :** মূলধন স্থায়ী সম্পদ নয়-এর ক্ষয়ক্ষতি আছে। যন্ত্রপাতি বা ঘরবাড়ীর আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট। দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে মূলধন দ্রব্যসামগ্রী ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং অকেজো হয়ে পড়ে। ফলে এর পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়।

৬. **মূলধনের উৎপাদন খরচ আছে :** মূলধন মানুষ দ্বারা উৎপাদিত। মূলধন প্রাকৃতিক সম্পদ নয়। তাই মূলধনের উৎপাদন খরচ আছে।

৭. **মূলধন সমজাতীয় নয় :** সকল মূলধন একই গুণসম্পন্ন নয়। বিভিন্ন মূলধনের গুণগত পার্থক্য আছে। এটি স্বতন্ত্র ক্রিয়াসম্পন্ন বিবিধ বস্তুর একটি জটিল সমষ্টি।

৮. **মূলধন আয়ের উৎস :** মূলধন ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যৎ আয়ের পথ সৃষ্টি করা। মূলধন ব্যবহার করলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হয়। এজন্য অধ্যাপক মার্শাল মূলধনকে আয়ের উৎস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূলধনকে নানাভাবে ভাগ করা যায়। নিম্নে এসব শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করা হল :

১. **ব্যক্তিগত মূলধন ও জাতীয় মূলধন :** মালিকানার ভিত্তিতে মূলধনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়: যথা - (ক) জাতীয় মূলধন এবং (খ) ব্যক্তিগত মূলধন। যে সকল মূলধন কোন ব্যক্তি বিশেষের মালিকানায় থাকে তাকে ব্যক্তিগত মূলধন বলা হয়। যেমন – ব্যক্তির মালিকানাধীন কল-কারখানা, ঘর-বাড়ী, শেয়ার ইত্যাদি। যে মূলধনে সমষ্টিগত মালিকানা থাকে অর্থাৎ রাষ্ট্রের অধীনে যে সকল মূলধন থাকে তাকে জাতীয় মূলধন বলা হয়। জাতীয় মূলধন সরকারী মূলধন ও ব্যক্তিগত মূলধন উভয়কে নিয়েই গঠিত হয়।

   অর্থাৎ একটি দেশের সরকারী ও বেসরকারী মূলধন মিলিয়েই জাতীয় মূলধন গড়ে উঠে। যেমন, রাষ্ট্রায়ত্ত বা রাষ্ট্র মালিকানাধীন কলকারখানা, ব্যাংক, রেলওয়ে, বিমান এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সকল প্রকার কলকারখানা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সব কিছুই জাতীয় মূলধনের অন্তর্গত।

২. **ভোগ্য মূলধন ও উৎপাদক মূলধন :** ব্যবহারের ভিত্তিতে মূলধনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা (ক) ভোগ্য মূলধন এবং (খ) উৎপাদন মূলধন। উৎপাদন চলাকালে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের ভরণ পোষণ ও জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য যে মূলধন ব্যবহৃত হয় তাকে ভোগ্য মূলধন বলে। যেমন – শ্রমিকদের খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র ইত্যাদি। অপরপক্ষে, যে সকল মূলধন উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে তাকে উৎপাদক মূলধন বলে। যেমন, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি।

৩. **স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধন :** স্থায়িত্বের ভিত্তিতে মূলধনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় – যথা (ক) স্থায়ী মূলধন ও (খ) চলতি মূলধন। যে মূলধন উৎপাদন কাজে একবার ব্যবহারেই শেষ হয়ে যায় না; বরং তা বহুদিন ধরে বারবার ব্যবহৃত হয় তাকে স্থায়ী মূলধন বলে। যেমন – কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, বাড়ীঘর, গুদাম প্রভৃতি স্থায়ী মূলধনের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে, যে মূলধন মাত্র একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হয়ে যায় তাকে চলতি মূলধন বলে। যেমন, তুলা, পাট, কাঠ, কয়লা প্রভৃতি। এ সকল দ্রব্য একবার ব্যবহারের

ফলেই এদের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কয়লা একবার পুড়ালে ছাই হয়ে যায় – এর অস্তিত্ব থাকে না। তুলা থেকে সুতা প্রস্তুত করলে তুলার আকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং যে সকল মূলধন মাত্র একবার ব্যবহারের ফলেই শেষ হয়ে যায় তাকে চলতি মূলধন বলে।

৪. **নিমজ্জমান মূলধন ও ভাসমান মূলধন :** ব্যবহরের ভিত্তিতে মূলধনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা – (ক) নিমজ্জমান মূলধন ও (খ) ভাসমান মূলধন। যে সব মূলধন মাত্র একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় এবং যা অন্য কাজে ব্যবহার করা যায় না তাকে নিমজ্জমান বা আবদ্ধ মূলধন বলে। যেমন- রেল ইঞ্জিন, লোহা গলাবার চুল্লী ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, যে সব মূলধন বিভিন্ন উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয় বা এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পে স্থানান্তর করা যায় তাকে ভাসমান মূলধন বলে। যেমন – কয়লা, বিদ্যুৎ, কাঁচামাল, ইঞ্জিন ইত্যাদি।

মূলধনের গুরুত্ব ও কার্যাবলী

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধন হ'ল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মূলধন ছাড়া কোন কিছু উৎপাদন করা সম্ভব নয়। শিল্প বিপ্লবের আগে মূলধনের গুরুত্ব এতটা ছিল না। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পর হতেই উৎপাদন ক্ষেত্রে মূলধনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সব উপাদান উৎপাদনশীল হলেও মূলধনের উৎপাদনশীলতা সর্বাধিক। বস্তুতঃ আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে মূলধন নির্ভর। মূলধনের প্রাচুর্যই পশ্চিমের দেশসমূহের উন্নত দেশরূপে গণ্য হবার কারণ। তাই মূলধনের প্রাচুর্য উন্নয়নের চাবিকাঠি। আমেরিকা, বৃটেন, জাপান, জার্মান, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের উন্নয়নের পশ্চাতে প্রধান অবদান রয়েছে মূলধনের প্রাচুর্য।

নিম্নে মূলধনের কার্যাবলী আলোচনা করা হল :

১. **মূলধন উৎপাদন বৃদ্ধি করে :** মূলধন উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান সহায়ক। মূলধন ব্যবহারের ফলে প্রত্যেকটি উৎপাদনের উপাদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক যখন আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তখন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি ও উন্নতমানের দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। তাই মূলধন ব্যবহারের ফলে দ্রব্যের পরিমাণ শুধু বৃদ্ধি পায় না, সেই সঙ্গে উৎকৃষ্টমানের দ্রব্যও উৎপাদিত হয়। ফলে সার্বিকভাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

২. **শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে :** মূলধন শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমিকদের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। মূলধন শ্রমিকদের দৈহিক শ্রম লাঘব করে। ভারী ও কঠিন কাজ যা শ্রমিকদের দৈহিক শক্তির উপর চাপ প্রদান করতো তা এখন যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে সম্পন্ন করা যায়।

৩. **মূলধন যন্ত্রপাতি যোগান দেয় :** মূলধন বৃদ্ধির মাধ্যমে কারখানায় উন্নতমানের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে সাহায্য করে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য মোটা অংকের অর্থের প্রয়োজন হয়। মূলধন এই অর্থ যোগান দিয়ে তা সম্ভব করে।

৪. **মূলধন কাঁচামাল যোগান দেয় :** মূলধন শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ করতে সাহায্য করে। কোন শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করতে কাঁচামাল প্রয়োজন। এই কাঁচামাল যোগান দিতে মূলধন অপরিহার্য। অতএব, কাঁচামাল সরবরাহ করা মূলধনের অন্যতম কাজ।

৫. **মূলধন বৃহদায়তন উৎপাদনে সহায়তা দেয় :** মূলধন ব্যবহারের ফলেই বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। মূলধন ব্যতীত বৃহদায়তন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করা

অসম্ভব। মূলধনের সাহায্যেই উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং শ্রম বিভাগের সুবিধা লাভ সম্ভবপর হয়েছে। এর ফলে স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

৬. **মূলধন উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সমন্বয় ঘটায় :** মূলধন ব্যবহারের দ্বারা উৎপাদন ও শ্রমের মধ্যে সমন্বয় ঘটে। পূর্বে শ্রমিক কোন দ্রব্য উৎপাদন করে বিক্রয় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। কিন্তু শ্রম বিভাগ প্রবর্তনের পর কোন শ্রমিকের কাজ শেষ হবার পরপরই তার দৈনন্দিন ভরণ পোষণের জন্য পারিশ্রমিক পরিশোধ করা হয় এবং আর্থিক মূলধন থেকেই তা সম্ভব হয়। তাছাড়া মূলধন একটি দ্রব্য উৎপাদনের কাজ আরম্ভ এবং তা সম্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে-ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

৭. **মূলধন সময় সংক্ষেপ করে :** মূলধন ব্যবহারের ফলে সময় সংক্ষেপ করা সম্ভবপর হয়েছে। শ্রম বিভাগের ফলে প্রত্যেকটি শ্রমিককে যেহেতু একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে হয় তাই প্রত্যেকটি স্তরের কাজ স্বল্প সময়েই সম্পন্ন করা সম্ভব হয় এবং সময়ের অপচয় রোধ করা যায়।

৮. **মূলধন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে :** মূলধনের সাহায্যে দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব হয়েছে। মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে যায়। এর ফলে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। বিকাশমান দেশগুলোতে বেকার সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ মূলধনের অভাব। মূলধনের যোগান বৃদ্ধি করতে পারলে এসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা যাবে।

মূলধন গঠন কাকে বলে ?

অর্থনীতিতে মূলধন গঠন বলতে মূলধন বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বুঝায়। কোন দেশ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার মূলধন সম্পদ বা পুঁজিদ্রব্যের যে বৃদ্ধি সাধন করে তাকে মূলধন গঠন বলে। অধ্যাপক বেনহাম (Benham) বলেন "The amount which a community adds to its capital during a period is known as capital formation during that period." মানুষ তার আয়ের সবটুকু অংশই ভোগ করে না; সে এর থেকে কিছু অংশ সঞ্চয় করে। এই সঞ্চয় থেকে মূলধন সৃষ্টি হয়। তবে সঞ্চয় মানেই মূলধন নয়। সঞ্চয়ের যে অংশ নতুন শিল্প-কারখানা, যন্ত্রপাতি, রাস্তাঘাট যানবাহন ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করা হয় তাই হল মূলধন গঠন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা কালে কোন দেশ তার বর্তমান পুঁজি যে পরিমাণ বাড়াতে পারে বা সমর্থ হয় সেটাই তার পুঁজিগঠন বা বিনিয়োগের পরিমাণ।

মূলধন গঠন কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

মূলধন গঠন সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল। মূলধন গঠন প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে; যথা – (১) সঞ্চয়ের সামর্থ, (২) সঞ্চয়ের ইচ্ছা এবং (৩) বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা।

১. সঞ্চয়ের সামর্থ

মানুষের সঞ্চয়ের সামর্থ তার আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। আয় যত বেশি হবে সঞ্চয়ের সামর্থ তত বেশি হবে। মানুষের আয় থেকে তাঁদের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের পরও যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে সঞ্চয় সম্ভব হয়। অতিরিক্ত আয় থেকে সঞ্চয় এবং সেই সঞ্চয়ই মূলধন গঠনে সাহায্য করে। সুতরাং সঞ্চয়ের সামর্থের উপরই মূলধনের পরিমাণ নির্ভর করে। বাংলাদেশের মত গরীব দেশের লোকের মাথাপিছু আয় কম, তাই তাদের সঞ্চয়ের সামর্থও কম। যে কোন দেশের আয়ের পরিমাণ, মূল্যস্তর, পরিবারের আয়তন, রুচি, অভ্যাস, কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি সঞ্চয়ের সামর্থ নির্ধারণ করে।

২. সঞ্চয়ের ইচ্ছা

সঞ্চয়ের পরিমাণ শুধুমাত্র সঞ্চয়ের সামর্থের উপর নির্ভর করে না; সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপরও নির্ভর করে। সঞ্চয় করবার ইচ্ছা না থাকলে কখনও সঞ্চয় হতে পারে না। কারণ, বাস্তবে দেখা যায় যে, কোন লোকের আয় অনেক, কিন্তু সে অমিতব্যয়ী, অপরিণামদর্শী। তাই তার কোন সঞ্চয় নেই, সঞ্চয়ের প্রতি কোন গুরুত্ব সে দেয় না। অথচ নিম্ন আয়ের লোক, যেমন গ্রামীন ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত মহিলাদের ইচ্ছা থাকার কারণে এবং বাধ্যবাধকতা থাকায় তারা সঞ্চয় করতে আগ্রহী হন। দূরদৃষ্টি, পারিবারিক স্নেহ মমতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মর্যাদা লাভের ইচ্ছা, জানমালের নিরাপত্তা, সুদের হার, কর ব্যবস্থা, কৃচ্ছতা অবলম্বন, পরিবেশগত অবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলি সঞ্চয়ের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে। নিচে এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

ক) **দূরদৃষ্টি :** মানুষের ভবিষ্যত সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ভবিষ্যতে সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা, বিবাহ, নিজের অবর্তমানে সংসারের ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তা, ভবিষ্যত বিপদ-আপদে কোন কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লে বা বার্ধক্যের কারণে অক্ষম হয়ে পড়লে – এসব বিপদ মোকাবিলা করতে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লোক সঞ্চয় করে। ফলে তাকে কারো গলগ্রহ হতে হবে না। সুতরাং যারা দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ তারা অধিক সঞ্চয় করে।

খ) **পারিবারিক স্নেহ মমতা :** পারিবারিক স্নেহ মমতা যে সমস্ত লোকের বেশি, তাদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা তত প্রবল। এভাবে মাতাপিতা সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতার বসবর্তী হয়ে তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখতে অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করে। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অধিক সহায় সম্পত্তি রেখে যাবার জন্যে লোকে বর্তমানে ত্যাগ স্বীকার করেই সঞ্চয় করে।

গ) **উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও মর্যাদা লাভের ইচ্ছা :** সমাজে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের আশায় মানুষ সঞ্চয় করে। বিশেষ করে বর্তমান যুগে যার টাকা পয়সা যত বেশি তার সামাজিক পরিচিতি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি তত বেশি। ধনবান লোক সমাজে মর্যাদাবান। অনেকে মনে করেন পৃথিবী টাকার বশ। তাই উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পন্ন ব্যক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে তার ইচ্ছা পূরণ করে।

ঘ) **জানমালের নিরাপত্তা :** জানমালের নিরাপত্তার উপর সঞ্চয় অনেকাংশে নির্ভর করে। অনেক কষ্টে অর্জিত সঞ্চয় যদি সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে নষ্ট হয়, এরূপ সমাজে সঞ্চয় গড়ে উঠা বিঘ্নিত হয়। তাই আইন-শৃঙ্খলা ও জানমালের নিরাপত্তা সঞ্চয় গড়ে তোলার পূর্বশর্ত।

ঙ) **সুদের হার :** সঞ্চয়ের পরিমাণ অনেকটা সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। সাধারণত: সুদের হার বেশি হলে সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। সুদের হার কমে গেলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা কমে যায়।

চ) **কর ব্যবস্থা ও সরকারী নীতি :** কর ব্যবস্থা ও সরকারী নীতিও সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর প্রভাব বিস্তার করে। কর ব্যবস্থা ও সরকারী নীতি যদি এরূপ হয় যে, সঞ্চিত অর্থের উপর কর দিতে হবে না তাহলে লোকে অধিক সঞ্চয় করতে আগ্রহী হবে। পক্ষান্তরে, সঞ্চয়ের উপর সরকার যদি কর বেশি করে ধার্য করে তবে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি হ্রাস পাবে।

ছ) **শিক্ষা ও সামাজিক রীতি-নীতি :** সঞ্চয়ের পরিমাণ দেশের সামাজিক রীতি-নীতি, শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। সাধারণত: শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে লোকে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে। তার ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

জ) **কৃচ্ছতা অবলম্বন :** সামাজিক পরিবেশ, কৃষি ও জীবন যাত্রার ধরন সব মিলিয়ে যদি কোন সমাজ মিতব্যয়ী সমাজ হয়, অর্থাৎ কৃচ্ছতা পালনে আগ্রহী হয় তবে সে সমাজে সঞ্চয়ের

পরিমাণ বেশি হবে। যেমন, নেপালের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের চেয়ে কম অথচ সেখানে সঞ্চয়ের হার বেশি।

৩. বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা

বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধার উপর সঞ্চয় অনেকখানি নির্ভরশীল। দেশের মূলধনের নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা যত বেশি হবে সঞ্চয়ের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পাবে। ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, যৌথ মূলধনী কারবার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগের সুবিধা যত বাড়বে সঞ্চয়ের প্রতি লোকের আগ্রহ তত বাড়বে। সামগ্রীকভাবে দেশের মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

সুতরাং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উপরিল্লিখিত কারণসমূহের উপর মূলধন গঠন নির্ভরশীল।

মূলধনের দক্ষতা

মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতাকে মূলধনের দক্ষতা বুঝায়। মূলধন নিয়োগের ফলে দ্রব্যের উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাকে মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা বলে। উৎপাদনের আয় থেকে অন্যান্য উপাদান ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাদ দিয়ে মূলধন ব্যবহারের জন্য যে লাভ পাওয়া যায় তা হল মূলধনের উৎপাদনের ক্ষমতা। তবে প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনে প্রত্যেকটি উপাদানের অবদান কতটুকু তা নির্ধারণ শক্ত ব্যাপার। যে মূলধন পণ্যের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা সর্বাধিক, উৎপাদনকারী সেই মূলধন পণ্য ব্যবহারে তত আগ্রহী।

কোন কোন বিষয়ের উপর মূলধনের ক্ষমতা নির্ভর করে।

নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহের উপর মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে

১) **উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা :** উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার উপর মূলধনের দক্ষতা নির্ভর করে। উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে সেখানে উৎপাদনকারী আরো মনোযোগী হয়, বৈচিত্র্যময় দ্রব্য উৎপাদন করে এবং মূলধনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

২) **উন্নত প্রযুক্তি ও উৎপাদন পদ্ধতি :** উন্নত প্রযুক্তি ও উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের উপর মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে। পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তে আধুনিক ও নতুন যন্ত্রপাতি অধিকতর উৎপাদনশীল ও দক্ষ।

৩) **শ্রমিকের কর্মদক্ষতা :** শ্রমিকের কর্মদক্ষতার উপর উৎপাদনের দক্ষতা নির্ভর করে। একই যন্ত্রপাতির সাহায্যে দক্ষ শ্রমিক অদক্ষ শ্রমিকের চাইতে অধিক উৎপাদন করে। বস্তুত: দক্ষ শ্রমিক ও আধুনিক যন্ত্রপাতি একত্রে মিলিয়েই এরূপ উৎপাদন সম্ভব হয়।

৪) **মূলধনের পরিমাণ :** উৎপাদন কাজে মূলধনের পরিমাণ পর্যাপ্ত হলে মূলধনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। মূলধনের পরিমাণ অপর্যাপ্ত হলে উৎপাদিকা শক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার বিঘ্নিত হয়। ফলে উৎপাদন কম হয়। সুতরাং মূলধনের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হলে মূলধনের পরিমাণ যথোপযুক্ত হতে হবে।

৫) **মূলধনের মান :** মূলধনের মান উন্নত হলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। উন্নত ও নতুন যন্ত্রপাতি পুরাতন যন্ত্রপাতি অপেক্ষা অধিক উৎপাদনশীল।

৬) **মূলধনের উপযুক্ত বিনিয়োগ :** মূলধনের উপযুক্ত বিনিয়োগের দ্বারা এর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। মূলধনের ব্যবহার যথার্থ না হলে তার উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

৭) **উৎপাদনে বৈচিত্র্য প্রবর্তন :** উৎপাদন ক্ষেত্রে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হচ্ছে, বৈচিত্র্যময় উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে এবং মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে উপাদানের নতুন আবিষ্কার, কাঁচামালের নতুন উৎস আবিষ্কার, শিল্প কারখানাকে নতুনভাবে সংগঠিত করা হলে মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৮) **ব্যবসায়ীদের মনোভাব :** মূলধন বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীগণ আশাবাদী হলে, ঝুঁকি গ্রহণে ইচ্ছুক হলে মূলধনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, নৈরাশ্য মূলধন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।

পরিশেষে বলা যায়, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার উপর মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে। ব্যবসা পরিচালনার দক্ষতা মূলধনের যথোপযুক্ত ব্যবহারকে নিশ্চিত করে।

অনুশীলনী ৮.৪

১. পুঁজি কি? পুঁজির বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।
২. মূলধন কত প্রকারের হতে পারে? মূলধনের গুরুত্ব ও কার্যাবলী বর্ণনা করুন।
৩. মূলধন গঠন কাকে বলে? কি কি বিষয়ের উপর মূলধন গঠন নির্ভর করে?
৪. মূলধনের দক্ষতা কি? কি কি বিষয়ের উপর মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে?

পাঠ ৫ : সংগঠন - একক, অংশীদারী ও যৌথমূলধনী মালিকানা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সংগঠন কি তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠকের ভূমিকা কি তা বলতে পারবেন।

উৎপাদনে চতুর্থ ও সর্বশেষ উপাদান হল সংগঠন। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপদানগুলিকে একত্রিত করে তাদেরকে একত্রিত ও সমন্বয় সাধনের কাজ যে করে তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে। সমন্বয় সাধনের কাজকে সংগঠন বলে এবং এ কাজ যে করে তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে। শুধুমাত্র ভূমি, শ্রম ও মূলধন কোন কিছু উৎপাদন করতে পারে না। আধুনিককালে উৎপাদন ব্যবস্থা জটিলতর ও ঝুঁকিপূর্ণ আকার ধারণ করছে। একদিকে আধুনিক প্রযুক্তি ও কলকারখানার আবিষ্কার বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার ঘটাচ্ছে, অন্যদিকে শ্রমিকদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, শ্রম বিভাগ সম্প্রসারিত হচ্ছে, শ্রমিক সংগঠন মালিক বা উদ্যোক্তাগণের জন্য জটিলতা সৃষ্টি করছে। এসব মিলিয়ে সংগঠনের দায়িত্ব ও গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্প উৎপাদনে বিনিয়োগ, মূলধন সংগ্রহ, দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ, তত্ত্বাবধান, যন্ত্রপাতি ও জনবল নির্বাচন ও সংগ্রহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। উৎপাদনের সকল উপাদান একত্রিতকরণ, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনে যে ব্যক্তি নিয়োজিত থাকে তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা এবং যে প্রতিষ্ঠান এসব কাজ করে তাকে সংগঠন বলা হয়। নয়া ক্লাসিকেল অর্থনীতিবিদগণ সংগঠনকে উৎপাদনের একটি আলাদা উপাদান হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁদের মতে সংগঠনের একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু অনেক অর্থনীতিবিদ সংগঠনকে পৃথক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেন না। তাঁদের মতে সংগঠক ও এক বিশেষ ধরনের শ্রম মাত্র। সংগঠকদের মধ্যে যে বিচক্ষণতা ও কর্মনৈপূণ্যতা বিদ্যমান তা কমবেশি অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে আছে, সুতরাং সংগঠক ও শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্য পরিমাণগত, গুণগত নয়।

সংগঠক বা উদ্যোক্তার গুরুত্ব ও কার্যাবলী

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায়, গঠনের গুরুত্ব ও দায়িত্ব অপরিসীম। উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন প্রকার কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হল:

১) **উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি গ্রহণ :** উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ উদ্যোক্তার অন্যতম প্রধান কাজ। কি ধরনের পণ্য উৎপাদিত হবে, কি পরিমাণে হবে, দ্রব্যের উৎকর্ষ কি মানে হবে, কোথায় কারখানা স্থাপিত হবে, ভূমি ও মূলধন নিয়োগে কি পরিমাণ ব্যয় হবে, যন্ত্রপাতি কেমন হবে, কোন ধরনের শ্রমিক নিয়োগ করা হবে, ব্যবস্থাপনা কেমন হবে ইত্যাদি ব্যবসায়ের নীতি নির্ধারণী বিষয়াদি সংগঠনের পরিচালক মণ্ডলীর সদস্যগণ বা উদ্যোক্তা বা ব্যক্তি মালিকানায় মালিককে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

এসব কাজে পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। যদি সংগঠনের কোন নীতি পরিবর্তন করতে হয় সে ব্যাপারেও উদ্যোক্তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

২) **উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানসমূহের সমন্বয় সাধন :** সংগঠক বা উদ্যোক্তাকে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ সংগ্রহ ও সমন্বয় সাধন করতে হয়। উৎপাদনের জন্য জমি সংগ্রহ করা, কারখানার জন্য গৃহ নির্মাণ করা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল সংগ্রহ করা, উৎপাদিত পণ্যের বাজার খুঁজে বের করা, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা উদ্যোক্তাকেই সম্পন্ন করতে হয়। উদ্যোক্তাকে প্রয়োজনানুযায়ী শ্রমিক সংগ্রহ করে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ ভাগ করে দিতে হয় এবং ব্যবস্থাপক নিয়োগ করতে হয়।

৩) **উৎপাদন কাজের তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ :** সংগঠক কেবলমাত্র উৎপাদনের উপাদানগুলি কাজে লাগিয়েই ক্ষান্ত থাকতে পারে না, তাকে উৎপাদন চলাকালে সঠিকভাবে বিভিন্ন উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা, শ্রমিকগণ ঠিকমত কাজ করছে কিনা তার তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করতে হয়, যাতে কোন ফাঁকি দেবার সুযোগ না পায় এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

৪) **ঝুঁকি বহন :** উদ্যোক্তা বা সংগঠকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করা। বাজারের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে পণ্যের ধরন ও পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়। যে কোন পণ্য উৎপাদনের জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়। যদি এই সময়ের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে লোকসান হতে পারে বা লাভ হতে পারে। চাহিদা বেড়ে গেলে, পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাবে এবং সংগঠকের মুনাফার পরিমাণ বেড়ে যাবে। কিন্তু যদি পণ্যের চাহিদা হ্রাস পায় তবে, তাহলে এর মূল্য কমে যাবে এবং ফলে লোকসান হতে পারে। ব্যবসায়ের এই লাভ ক্ষতি সংগঠককেই বহন করতে হয়। এজন্য তাকে সকল সময় বাজারের অবস্থা সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। বর্তমানে উৎপাদন ব্যবস্থা জটিলতর। তাছাড়া মানুষের অভ্যাস, রুচি, বাজারের অবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এ কারণে উৎপাদন ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং উদ্যোক্তাকেই এটা বহন করতে হয়।

৫) **অন্যান্য উৎপাদনের পারিশ্রমিক প্রদান :** উৎপাদনে নিয়োজিত সকল উপাদানগুলির পারিশ্রমিক প্রদান করা উদ্যোক্তার কাজ। ভূমি, শ্রম ও মূলধনের সহযোগিতায় যে একটি পণ্য উৎপাদিত হয় তার বিক্রি করে সংগঠকের আয় হয়। এই আয় থেকে ভূমির জন্য খাজনা, শ্রমিকের জন্য মজুরী ও মূলধনের জন্য সুদ প্রদান করার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাই সংগঠকের আয়। ফলে এখানে লাভের ও লোকসানের উভয়েরই আশঙ্কা থাকে।

৬) **নতুনত্ব প্রবর্তন :** অর্থনীতিবিদ জে. বি. ক্লার্কের মতে উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হ'ল নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন এবং এর প্রবর্তন করা। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে উদ্যোক্তা নতুন নতুন যন্ত্র, উন্নত কলাকৌশল, নতুন নিয়মকানুন বা পদ্ধতি প্রবর্তন করতে সচেষ্ট থাকে। ফলে কখনো কখনো ব্যয় হ্রাস পায় এবং মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এভাবে উদ্যোক্তা নতুন কলাকৌশলের প্রবর্তন করে উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়ন করে।

সুতরাং আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্যোক্তার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য যৌথ মূলধনী কারবার গড়ে উঠার ফলে উদ্যোক্তার কার্যাবলীতে কিছু পরিবর্তন এসেছে। যৌথ মূলধনী কারবারের প্রকৃত মালিক হ'ল শেয়ার হোল্ডারগণ। তাদের পক্ষ থেকে ম্যানেজার ব্যবসা পরিচালনা করেন, তবে তিনি ঝুঁকি গ্রহণ করেন না। তাই কোন কোন অর্থনীতিবিদের মতে সংগঠনকারীই হল আর্থিক উন্নয়নের অগ্রদূত। মার্শাল এদেরকে শিল্পের চালক (Captain of the Industry) হিসেবে অভিহিত করেছেন।

ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপ

অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে পৃথিবীতে নানা প্রকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন গড়ে উঠেছে। এগুলোকে ৫টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা; (১) এক-মালিকানা কারবার, (২) অংশীদারী কারবার, (৩) যৌথ মূলধনী কারবার, (৪) সমবায় কারবার এবং (৫) রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী কারবার।

(১) **একক বা এক মালিকানা কারবার :** যে কারবারে একজন মাত্র মালিক থাকেন, নিজেই ব্যবসায় উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন এবং এর লাভ-লোকসানের জন্য তিনি দায়ী থাকেন, তাকে এক মালিকানা কারবার বলা হয়। ব্যবসায়ে অতিপ্রাচীন কাল থেকে এক মালিকানা কারবার প্রচলিত আছে। তাই আদি রূপ হল একক বা এক মালিকানা কারবার। শিল্প বিপ্লবের বহু আগে থেকেই এ ধরনের কারবার প্রচলিত আছে।

এক মালিকানা কারবারে মালিক নিজেই মূলধন সংগ্রহ করে, ব্যবসা পরিচালনা করে, ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে বহন করে।

এক মালিকানা কারবারের সুবিধা

ক. **দক্ষ পরিচালনা :** একমালিকানা কারবারে মালিক নিজেই আগ্রহ সহকারে ব্যবসায়ের কার্যকলাপ পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করেন। ব্যবসায়ে লাভ হলে সেটা একমাত্র তারই প্রাপ্য এবং লোকসান হলেও তাকেই বহন করতে হবে। তাই তিনি সকল প্রকার অপচয় রোধ করতে সচেষ্ট থাকেন এবং ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তিনি বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে, অধিক যত্ন নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে লাভের পরিমাণ সর্বাধিক করার চেষ্টা করেন।

খ. **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** এক-মালিকানা কারবারের মালিক ও পরিচালক একই ব্যক্তি তাই যে কোন ব্যাপারে তিনি দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন। তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কারো মুখাপেক্ষী থাকতে হয় না। তাই সংকট নিরসনে তিনি অতি দ্রুত নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

গ. **ভোক্তার রুচি অনুযায়ী উৎপাদনে পরিবর্তন আনয়ন :** এক-মালিকানা কারবার সাধারণতঃ ক্ষুদ্রায়তনের হয়ে থাকে। তাই মালিক ভোক্তাগণের সংস্পর্শে এসে তাদের রুচি ও পছন্দ-অপছন্দ জানতে পারেন এবং লোকের রুচি অনুসারে পণ্য উৎপাদন করতে পারেন। ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন করে মালিক ব্যবসায়ে অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হন।

ঘ. **অপচয় কম :** এক-মালিকানা কারবারে শ্রম, কাঁচামাল, বিদ্যুত প্রভৃতি উপাদানের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করে অপচয় রোধ করতে পারে। যেহেতু মালিক নিজেই তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন তাই অপচয় রোধ করতে চেষ্টা করেন।

ঙ. **উৎকৃষ্ট উৎপাদন :** এক-মালিকানা কারবারে মালিক উৎপাদনের প্রতি নজর দিতে পারেন। ভোক্তাদের রুচি মাফিক যেখানে যে পরিবর্তন করে উৎকৃষ্ট মান বজায় রাখা যায় তা করতে পারেন। এভাবে মালিক ভোক্তার সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট উৎপাদন সম্ভব হয়।

চ. **মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক :** এক-মালিকানা কারবারে মালিক শ্রমিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে এবং একে অপরের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন। অসুবিধা দূরীকরণে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়। শ্রমিক মালিকের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

ছ. **উৎসাহ ও উদ্দীপনা :** এক-মালিকানা কারবারে ব্যবসায়ের সকল মুনাফা মালিক ভোগ করেন। এর ফলে ব্যবসায়ে সাফল্যের জন্য যে উদ্দীপনা, উৎসাহ ও আন্তরিকতা প্রয়োজন তা বিদ্যমান থাকে যা ব্যবসায়ের উন্নতি ত্বরান্বিত করে।

জ. **ব্যবসায়ের গোপনীয়তা :** এক-মালিকানা কারবারে মালিক সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ একাই সম্পাদন করেন তাই ব্যবসায়ের গোপন তথ্য কেউ সহজে জানতে পারে না। ব্যবসায়ের এরূপ গোপনীয়তা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সহায়তা প্রদান করে।

এক মালিকানা কারবারের অসুবিধা

ক. **মূলধনের স্বল্পতা :** আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয়। এক মালিকানা কারবারে একজনের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না। এক-মালিকানা কারবারের মালিক যতই ধনী হউক, তিনি ঝুঁকি নিয়ে বেশি মূলধন এক কারবারে নিয়োগ করতে চান না।

খ. **ঝুঁকির আধিক্য :** এক-মালিকানা কারবারে অন্যতম অসুবিধা এই যে, যে কোন একজনের পক্ষে সব ঝুঁকি গ্রহণ খুবই বিপজ্জনক। যদি ব্যবসায়ে লোকসান হয়, তবে মালিককে দেউলিয়া হতে হয়। ব্যবসায়ের ঋণের জন্য পাওনাদার মালিকের সম্পত্তি, ঘর-বাড়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সব কিছু নিয়ে যেতে পারে।

গ. **বৃহদায়তন উৎপাদনের অন্তরায় :** এক-মালিকানা কারবারে একজন মালিকের আর্থিক শক্তি সীমাবদ্ধ বলে তার পক্ষে বৃহদায়তন উৎপাদনে যাওয়া সম্ভবপর হয় না। তাই সাধারণতঃ এক-মালিকানা কারবার ক্ষুদ্রাকার। ফলে বৃহদায়তন শিল্পের যে সুবিধা তাও গ্রহণ করতে পারে না।

ঘ. **উৎপাদন ব্যয় অধিক :** এক-মালিকানা কারবারের আয়তন ক্ষুদ্রাকার হয় বিধায় উৎপাদন ব্যয় অধিক হয়। এরূপ সংগঠন প্রতিযোগিতায় বৃহদায়তন উৎপাদনকারীগণের সাথে কেটে উঠতে পারে না; অনেক সময় তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

ঙ. **স্বল্প অস্তিত্ব :** এক-মালিকানা কারবারের মালিকের মৃত্যুতে বা প্রতিকূল অবস্থার কারণে স্থায়িত্ব স্বল্প সময়ের জন্য। মালিকের অনুপস্থিতিতে বা অযোগ্য উত্তরাধিকারের হাতে পড়ে কারবার বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

চ. **অপর্যাপ্ত তত্ত্বাবধান :** এক-মালিকানায় কারবারে মালিক যত দক্ষই হউন না কেন, উৎপাদনের সকল পর্যায়ে ও দিকে নজর রাখা তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। এই অপর্যাপ্ত তত্ত্বাবধানের ফলে ব্যবসায়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

অংশীদারী কারবার

যে কারবারে পরস্পরের সাথে পরিচিত কয়েকজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে মূলধন সংগ্রহ করে যুক্তভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে তাকে অংশীদারী কারবার বলা হয়। অংশীদারীগণ একক এবং যৌথভাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য এবং ব্যবসায়ের ঋণের জন্য দায়ী থাকে। অংশীদারী কারবারে সকলের সমান অংশীদারী হবার প্রয়োজন নেই। তাঁরা নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন

করে এর ভিত্তিতে বা শর্ত অনুযায়ী মূলধন দিয়ে থাকে এবং সেই অনুসারে লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। এই কারবারের তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে: (ক) অংশীদারীগণ সকলেই যুক্তভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে, (খ) অংশীদারগণের দায়িত্ব অসীম এবং (গ) অংশীদারগণের মধ্য থেকে কেউ মারা গেলে, পাগল হয়ে গেলে বা দেউলিয়া হয়ে গেলে এ ধরনের কারবার বন্ধ হয়ে যায়; ফলে এর স্থায়ীত্ব খুব কম। এরূপ কারবারে পাওনাদারগণ ইচ্ছা করলে যে কোন অংশীদারের কাছ থেকে সমস্ত ঋণের টাকা আইনত: আদায় করতে পারে। উল্লেখ্য যে অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এ ধরনের সংগঠন কাজ করে।

অংশীদারী কারবারের সুবিধাসমূহ

ক. **গঠনের সুবিধা :** অংশীদারী কারবার গঠনে আইনগত কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নেই; ফলে সহজেই এ ধরনের কারবার গড়ে তোলা যায়।

খ. **মূলধনের পর্যাপ্ততা :** অংশীদারী কারবারের সকল অংশীদারগণ মূলধনের যোগান দেন, তাই ব্যক্তিগত কারবারের তুলনায় সকলের সমবেত চেষ্টায় পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় যা দিয়ে বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়। এতে ব্যবসায়ী ও ভোক্তা উভয়েরই সুবিধা হয়।

গ. **অসীম দায়িত্ব ও ঋণের সুবিধা :** অংশীদারী ব্যবসায় অংশীদারগণ একক ও সম্মিলিতভাবে ব্যবসায়ের অসীম দায়ভার বহন করে বলে অংশীদারী কারবারে সহজে ঋণ পাওয়া যায়।

ঘ. **শ্রম বিভাগের সুবিধা :** এ ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তির সমাবেশ ঘটতে পারে। তাদের দক্ষতা অনুযায়ী ব্যবসায়ের কাজ ভাগ করে দেওয়া যায়। যেমন – কেহ ব্যবসা পরিকল্পনা, কেহ উৎপাদন কাজ, কেহ বাজারজাত করণের কাজ, কেহ প্রশাসন প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করলে গোটা ব্যবসা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে।

ঙ. **অধিক গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত :** অংশীদারগণের আলাপ অলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এজন্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত এবং নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়।

চ. **ব্যবসায়ের সুনাম ও দক্ষতা :** অংশীদারী কারবারে প্রত্যেক অংশীদারগণ তাদের দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করে। এজন্য ব্যবসায়ের সুনাম ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং অধিক মুনাফা অর্জনের পথ সুগম করে।

ছ. **স্থিতিস্থাপকতা :** এ ধরনের কারবারে প্রয়োজনে অংশীদারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। বিশেষ করে ব্যবসা সম্প্রসারণের তাগিদে নতুন অংশীদার গ্রহণ করা যায়।

অংশীদার কারবারের অসুবিধা

ক. **অসীম দায়িত্ব :** অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণের অসীম দায়িত্ব এ ব্যবসায়ের প্রধান অসুবিধা। যদি ব্যবসায়ে লোকসান হয় তাহলে ঋণদাতা যে কোন অংশীদারের কাছ থেকে ঋণের সমস্তটাই আইনগতভাবে আদায় করতে পারে। অনেক সময় কোন অংশীদার কেবল তার মূলধন হারায় তাই নয় তার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিও হারাতে পারে। সুতরাং এ ব্যবসায়ের ঝুঁকি অসীম।

খ. **স্থায়ীত্বের অভাব :** অংশীদারী কারবারের স্থায়ীত্ব কম। কোন অংশীদার মারা গেলে, উন্মাদ বা দেউলিয়া হলে আইনগতভাবে কারবার বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে বর্তমানে অংশীদারী কারবার সীমিত হয়ে পড়েছে এবং বর্তমানে যেগুলি আছে তা বিলুপ্ত হবার পথে।

গ. **অপ্রচুর মূলধন :** অংশীদারী কারবারে যদিও এক-মালিকানা কারবারের তুলনায় বেশি মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব, তথাপিও বতর্মানে বৃহদায়তন শিল্পের মূলধনের প্রয়োজনে অপর্যাপ্ত। মূলধনের অপর্যাপ্ততার জন্য এ ধরনের করবার ক্রমশ: অপ্রিয় হয়ে পড়ছে।

ঘ. **মতানৈক্য :** অংশীদারগণের মধ্যে যে কোন কারণে মত বিরোধ দেখা দিতে পারে। তার ফলে ব্যসায়ের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে বা কখনো কখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসুবিধা হতে পারে।

ঙ. **অদক্ষতা অংশীদার :** অংশীদারী কারবারে সকল অংশীদার সমযোগ্যতা সম্পন্ন নাও হতে পারে। ফলে এমন হতে পারে যে, একজন অংশীদারের অদক্ষতা গোটা ব্যবসাকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারে এবং এর দায়ভার সকলকে নিতে হতে পারে।

যৌথ মূলধনী কারবার

বর্তমানকালে বৃহদায়তন উৎপাদনের যুগ। তাই যুগোপযোগী কারবার সংগঠন হ'ল যৌথ মূলধনী কারবার যেখানে অনেকগুলি লোক সম্মিলিতভাবে মূলধন যোগান দিতে পারে। প্রায় সকল দেশেই যৌথ মূলধনী কারবারের প্রচলন রয়েছে। যৌথ মূলধনী কারবারের মূলধনকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে সেগুলোকে এক একটি শেয়ার বলা হয়।

যৌথ মূলধনী কারবার গঠন প্রণালী ও মূলধন সংগ্রহ পদ্ধতি

কারবারের উদ্যোক্তাগণ কোম্পানির নাম, উদ্দেশ্য, মূলধনের পরিমাণ প্রভৃতি সংক্রান্ত স্মারকলিপি (Article of Memorandum) জনসাধারণের কাছে প্রচার করে। তারপর এসব সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিয়ে ব্যবসায়ের কাজ শুরু করে। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান সব সময় অনুমোদিত মূলধনের সবটুকু শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করে না। অনুমোদিত মূলধনের যে পরিমাণ মূল্যের শেয়ার বাজারে বিক্রির জন্য ছাড়া হয় তাকে ইস্যু মূলধন (Subrcribed capital) বলে। বিক্রীত মূলধনের যে অংশ শেয়ার ক্রেতাদের থেকে নগদে আদায় করা হয়েছে তাকে আদায়ীকৃত মূলধন (Paid up Capital) বলে।

যৌথমূলধনী কারবার সাধারণতঃ তিন উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। যথা –(১) শেয়ার বিক্রি করে, (২) ঋণপত্র (Debenture) বিক্রি করে এবং (৩) ঋণ গ্রহণ করে।

১. শেয়ার বিক্রয়

শেয়ার বিক্রয়ই যৌথমূলধনী কারবারের মূলধন সংগ্রহের সবচেয়ে বড় উপায়। শেয়ার প্রধানত: দু'প্রকার - (ক) অগ্রগণ্য শেয়ার ও (খ) সাধারণ শেয়ার।

ক. **অগ্রগণ্য শেয়ার :** ব্যবসায়ের মুনাফা থেকে যে শেয়ারের প্রাপ্য সর্বপ্রথম মিটিয়ে দেয়া হয় তাকে অগ্রগণ্য শেয়ার বলা হয়। অগ্রগণ্য শেয়ারের লভ্যাংশ নির্দিষ্ট। ব্যবসায়ের মুনাফা না হলে সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের মত কিছুই পায় না। যদি এ প্রকার শেয়ার ক্রমবর্ধমানশীল অগ্রগণ্য শেয়ার (Cumulative preferential share) হয় তবে যখনই কোম্পানির মুনাফা হবে তখনই পূর্ববর্তী এবং বর্তমান বৎসরের মুনাফা নির্দিষ্ট হারে একই সঙ্গে বুঝে পাবে। এ ধরনের শেয়ার কম ঝুঁকি বহুল।

খ. **সাধারণ শেয়ার :** সাধারণ শেয়ারের মুনাফা নির্দিষ্ট থাকে না। অন্যান্য সকলের পাওনা মিটাবার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই সাধারণ শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে বন্টিত হয়। মুনাফার পরিমাণ বেশি হলে লভ্যাংশ বেশি এবং মুনাফা কম হলে লভ্যাংশ কম হবে। এমনকি যদি ব্যবসায়ে কোন ক্ষতি হয় তবে ক্ষতিপূরণ সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদেরই করতে হয়। এরূপে তাদেরকে সর্বাপেক্ষা বেশি ঝুঁকি বহন করতে হয়।

২. ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার

ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার বিক্রি করেও যৌথ মূলধনী কারবার মূলধন সংগ্রহ করে। ঋণপত্রের উপর একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করা হয়। ডিবেঞ্চার এক প্রকার বন্ড যাতে কোম্পানির সম্পত্তি জামিন থাকে। প্রয়োজন হলে কোম্পানির সম্পত্তি বিক্রি করেও ডিবেঞ্চার হোল্ডারদের প্রাপ্য পরিশোধ করতে হয়। কারবারের মুনাফার সাথে ডিবেঞ্চারের সম্পর্ক নেই। ডিবেঞ্চার ক্রেতাগণ যৌথমূলধনী কারবারের মালিক নন, তারা কোম্পানির ঋণদাতা। যদি কোন সময় কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায় তবে ডিবেঞ্চার হোল্ডারদের দাবি সর্বপ্রথম মিটাতে হয়।

৩. ঋণ গ্রহণ

যৌথ মূলধনী কারবারে চলতি মূলধনের জন্য ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করতে পারে।

যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

১. **বৃহদায়তন উৎপাদন :** যৌথ মূলধনী কারবারের ফলে বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। বৃহদায়তন উৎপাদনে যে প্রচুর পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন হয় তা যৌথ মূলধনী কারবারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। ফলে এই প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয় সংকোচের সুবিধা ভোগ করতে পারে।

২. **মূলধনের আধিক্য :** যৌথ মূলধনী কারবারে নানা প্রকার অল্প মূল্যের শেয়ার, ঋণপত্র ধনী-দরিদ্র সকলের মধ্যে বিক্রি করে মূলধন গড়ে তোলা যায়। ফলে যাদের অল্প সঞ্চয় আছে তারাও সাধ্যানুযায়ী ব্যবসায়ে অংশ নিতে পারে। এভাবে বিরাট পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ সম্ভবপর হয়।

৩. **প্রতিভা ও মূলধনের সমন্বয় :** সমাজে অনেক বিত্তশালী ব্যক্তি আছেন যাদের ব্যবসায়িক আকাঙ্ক্ষা বা কর্মকুশলতা নেই। অপরপক্ষে, ব্যবসায়ের বুদ্ধি সম্পন্ন অনেক প্রতিভাধর ব্যক্তি আছেন যাদের প্রয়োজনীয় মূলধন নেই। যৌথমূলধনী কারবার এই দু'শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ সৃষ্টি করে এবং উভয়ের যৌথ প্রয়াসকে সাফল্য মন্ডিত করে তোলে।

৪. **স্থায়িত্ব :** স্থায়ীত্ব যৌথ কারবারের একটি অন্যতম সুবিধা। এক মালিকানা বা অংশীদারী কারবারের মত কারো মৃত্যু ঘটলে বা উন্মাদ হয়ে গেলে যেমন ব্যবসা অচল হয়ে পড়ে, যৌথ মূলধনী কারবারে এরূপ কোন ক্ষতি হয় না। পুরাতন অংশীদারগণ তাদের শেয়ার বিক্রি করে প্রতিষ্ঠান যেমন ত্যাগ করতে পারে, তেমনি নতুন অংশীদার কারবারে যোগদান করতে পারে। ফলে কারবারের ধারা অব্যাহত থাকে।

৫. **সীমাবদ্ধ দায়:** যৌথ মূলধনী কারবারে অংশীদারগণের দায় সীমাবদ্ধ। কোন কারণবশতঃ এ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্য বন্ধ হয়ে গেলেও অংশীদারগণ এর ঋণদাতাদের কাছে শেয়ারের আনুপাতিক পরিমাণ ঋণের জন্য দায়ী থাকবে। এ কারণে বিনিয়োগকারীগণ এরূপ প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হয়।

৬. **সঞ্চয় ও বিনিয়োগ :** যৌথ মূলধনী কারবার সাধারণ লোককে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ করতে সুযোগ ও উৎসাহ যোগায়। তাদের সামান্য সঞ্চয় দিয়ে এ ধরনের সংগঠনের অল্প মূল্যের শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয়ের মধ্য দিয়ে তারা ব্যবসায়ে অংশ নিতে পারে এবং মুনাফা ভোগ করতে পারে।

৭. **শেয়ারের হস্তান্তরযোগ্যতা :** যৌথমূলধনী কারবারের শেয়ারগুলি হস্তান্তরযোগ্য এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার যোগ্য। এ ব্যবস্থা কারবারটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। বিনিয়োগকারীগণ প্রয়োজনবোধে শেয়ার বিক্রি করে টাকা ফেরত পেতে পারে।

৮. **ঝুঁকির শ্রেণী বিভাগ :** যৌথমূলধনী কারবারে বিভিন্ন শ্রেণী ঝুঁকিসম্বলিত শেয়ার থাকে। বিনিয়োগকারীগণের মধ্যে যে যেমন ঝুঁকি গ্রহণে ইচ্ছুক সেরূপ শেয়ার ক্রয় করতে পারে।

৯. **সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিচালনা :** যৌথমূলধনী কারবারে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিচালকগণের সমাবেশ ঘটিয়ে ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। প্রয়োজনবোধে পুরাতন পরিচালক পরিবর্তন করে নতুন পরিচালকমন্ডলীর সদস্য নিয়োগ করা যায় এবং পরিচালনায় গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের অধিকতর আস্থা অর্জন করা সম্ভব।

১০. **লোকের আস্থা :** যৌথমূলধনী কারবার দেশের আইন দ্বারা সৃষ্ট সংগঠন। কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। সুতরাং এ ধরনের কারবারে মানুষের আস্থার পরিমাণ বেশী।

যৌথমূলধনী কারবারের অসুবিধা

যৌথমূলধনী কারবারের অনেকগুলি অসুবিধা আছে। এগুলি নিম্নে আলোচিত হল ঃ

১. **অংশীদার এবং পরিচালকদের মধ্যে সংযোগের অভাব :** যৌথমূলধনী কারবারের শেয়ারহোল্ডার সংখ্যা অগণিত এবং তাদের অংশগুলি আবার হস্তান্তরযোগ্য। কারবারের পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিতদের সাথে অংশীদারদের কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ থাকে না। কখনো কখনো পরিচালকগণ নিজ স্বার্থে নানান ধরনের অসদুপায় অবলম্বন করে এবং অংশীদারগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

২. **সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অপচয় :** যৌথমূলধনী কারবারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদনার দায়িত্ব থাকে বেতনভুক্ত কর্মচারীদের উপর। তাদের সততা ও আন্তরিকতার অভাবে ব্যবসা সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না। এই সাংগঠনিক দুর্বলতা দক্ষ পরিচালনার পথে একটি অন্তরায়। ফলে অপচয় হয়।

৩. **সংগঠন জটিলতা :** এ ধরনের কারবারে গঠন-প্রণালী খুবই জটিল। অনেক আইনগত ঝামেলা পোহাতে হয় বলে সাধারণ লোক শেয়ারহোল্ডার হতে আগ্রহী নয়।

৪. **শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক :** যৌথমূলধনী কারবারের শ্রমিক মালিক সম্পর্ক সবসময় ভাল থাকে না। উভয়ের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা বেশী। ফলে ধর্মঘট, লক-আউট, শ্রমিক সংঘর্ষ প্রভৃতি কারবারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

৫. **অসাধু লোকের হাতে পরিচালনার দায়িত্ব যাবার সম্ভাবনা :** অনেক সময় কারবারের দায়িত্ব অসাধু ও অনভিজ্ঞ ডিরেক্টরদের হাতে চলে যায়। দলীয়করণ, কোন্দল ও কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে অসাধু লোক প্রভাব ও প্রতিপত্তি খাটায়। যার ফলে কোম্পানি বিপদের সম্মুখীন হয়।

৬. **ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ :** যৌথমূলধনী কারবারের গণতান্ত্রিক পরিচালনার কথা বলা হলেও কার্যতঃ সেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ লক্ষণীয়। কতিপয় শেয়ারহোল্ডার বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন নামে মোট শেয়ারের বৃহৎ অংশের মালিকানা অর্জন করে এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ামক হয়ে উঠে এবং নিজেদের স্বার্থে প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে। সুতরাং সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়ে। বস্তুত: অগণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

৭. **শেয়ারের ফটকা ব্যবস্থা ঃ** যেহেতু যৌথমূলধনী কারবারে শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য এবং এধরনের প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়। এই সুযোগ অসাধু ও চতুর লোক শেয়ার বাজারে ফটকা ব্যবসায়ে জেঁকে বসে। যখন মুনাফার সম্ভাবনা বেশি তখন তারা নিজেরা অধিক সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করে কিন্তু যখন লোকসানের আভাস পায় তখন জনসাধারণকে লোভ দেখিয়ে তাদের কাছে শেয়ার বিক্রি করে। ফলে নিরীহ শেয়ারহোল্ডারগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৮. **দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি ঃ** যৌথমূলধনী কারবারে অনেক সময় দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি দেখা যায়। পরিচালকগণ তাদের আত্মীয়-স্বজনদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছাড়াই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ করে। এ ধরনের কাজের ফলে কারবারের দক্ষতার হানি হয় এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়।

৯. **ক্ষতির সম্ভাবনা ঃ** যৌথমূলধনী কারবারে শেয়ারহোল্ডার বা বিনিয়োগকারীগণ প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অসাধু ও অযোগ্য ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কারবারে অর্থ বিনিয়োগ করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

১০. **সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট ঃ** এ ধরনের কারবারে মুষ্টিমেয় বিত্তশালী শেয়ারহোল্ডারগণ কারবারের নিয়ন্ত্রণ কুক্ষিগত করে। মুষ্টিমেয় লোকের মালিকানায় সম্পদ যায় বলে ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পায় ও সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়।

উপসংহারে বলা যায় যে, এ সকল অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও যৌথমূলধনী কারবারের সুবিধা অনেক বেশি ; এ জন্য এ ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। বর্তমান যুগে এধরনের ব্যবসাই অধিক গড়ে উঠেছে - তাদের সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনুশীলনী ৮.৫

১. সংগঠন কি? সংগঠকের গুরুত্ব ও কার্যাবলী বর্ণনা করুন।
২. ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপ বর্ণনা করুন।
৩. একক মালিকানা ব্যবসায় সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ-৬ : উৎপাদন অপেক্ষক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- উৎপাদন-অপেক্ষক বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- উৎপাদন-অপেক্ষকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

উৎপাদন অপেক্ষক (Production Function)

কোন একটি পণ্যের উৎপাদন কিছু উপকরণের উপর নির্ভর করে। উৎপাদনের পরিমাণের সাথে উপকরণের পরিমাণের কারিগরী সম্পর্ককেই বলা হয় উৎপাদন অপেক্ষক। যেমন যদি এ ক্ষেত্রে X কে (X) দ্রব্যের উৎপাদন Y উপকরণের উপর নির্ভরশীল হয় (Y) এর অপেক্ষক বলে বীজগণিতে যেভাবে প্রকাশ করা হয় তাহল ঃ $X= f(Y)$

যেকোন উৎপাদনকারীর মূল লক্ষ্য হল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা এবং এলক্ষ্যে সর্বনিম্ন খরচে উৎপাদন করা। তাই উৎপাদনকারীকে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কাম্য অনুপাত স্থির করে সর্বনিম্ন খরচে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করতে হয়। সুতরাং প্রত্যেক উৎপাদনকারীকে দু'টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়- (ক) উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের কি করে সর্বনিম্ন ব্যয়ে উৎপাদন সম্ভব হয় এবং (খ) সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। এজন্য প্রত্যেক উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকে দু'টি বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যথা– কারিগরি এবং অর্থনৈতিক তথ্য। সুতরাং কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উপাদানসমূহ এবং উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে যে ক্রিয়াগত সম্পর্ক বিদ্যমান তাকে উৎপাদন অপেক্ষক বলে। অন্যকথায়, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে কারিগরি সম্পর্কের এই সূত্রকে উৎপাদন অপেক্ষক বলে। অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণের পরিমাণের বিভিন্ন সমন্বয় দ্বারা বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব তা যে কারিগরি সম্পর্ক দ্বারা জানা যায় তাকে উৎপাদন অপেক্ষক বলে। উৎপাদনের পরিমাণের সাথে উপাদান-সমষ্টির এই ক্রিয়াগত সম্পর্কটি বুঝাবার জন্যই উৎপাদন অপেক্ষক কথাটি ব্যবহার করা হয়। Professor Leontief এর মতে "A Production function is a description of the quantitative relation between the inputs absorbed and the output energing from a particular production process." অর্থাৎ 'কোন একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ এবং উৎপাদনের পরিমাণের কার্যগত সম্পর্কই উৎপাদন অপেক্ষক।' যদি উপকরণগুলি X, Y, Z হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ Q হয় তাহলে এক্ষেত্রে উৎপাদন অপেক্ষক হল $Q = f(X,Y,Z)$। এই সমীকরণ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হলে উপাদানসমূহের অনুপাতের পরিবর্তন প্রয়োজন অথবা যে অনুপাতে উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে তা অক্ষুন্ন রেখে সবগুলি উপাদানের নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। সুতরাং উৎপাদনের উপাদানসমূহ এবং উৎপাদিক দ্রব্যের পরিমাণের মধ্যে ক্রিয়াগত সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক বলা হয়। অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েলসন বলেন, "উৎপাদনের উপাদানসমূহের প্রত্যেক এবং নির্দিষ্ট পরিমাণের সমন্বয়ে যে উৎপাদন সম্ভব হয় তা যে কারিগরি সম্পর্ক থেকে জানা যায় তাকেই উৎপাদন অপেক্ষক বলে। (Production function is the technical relationship telling the amount of output capable of being produced by each and every set of specified inputs. – Samuelson)"

উৎপাদন অপেক্ষকের গুরুত্ব

যে কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের কাছে উৎপাদন অপেক্ষক ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে লিপ্ত বিভিন্ন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন খরচে উৎপাদনে সচেষ্ট থাকে। তাই উৎপাদনের সাথে উৎপাদন খরচের বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন-ব্যয় সর্বনিম্ন করতে হলে সর্বাধিক দক্ষ উৎপাদন-অপেক্ষক এবং উপকরণের সংমিশ্রণের সমন্বয়ে উৎপাদনকার্য পরিচালনা করা প্রয়োজন। তাই প্রত্যেক উৎপাদনকারী সর্বদাই সর্বাধিক দক্ষ উৎপাদন-অপেক্ষকের অনুসন্ধানে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই সে দামী উপাদানগুলো কম পরিমাণে এবং তুলনামূলকভাবে সস্তা উপাদানগুলো অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে। প্রয়োজনে একটি উপাদানের পরিমাণ স্থির রেখে অন্যগুলো অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে। এধরনের প্রয়াসের একটিই উদ্দেশ্য তা হ'ল উৎপাদন ব্যয় সর্বনিম্ন রাখা।

অনুশীলনী ৮.৬

১. উৎপাদন অপেক্ষক কি? উৎপাদন অপেক্ষকের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

পাঠ ৭ : একটি পরিবর্তনীয় উপকরণঃ ক্রমহ্রাসমান, ক্রমবর্ধমান ও সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উৎপাদন বিধি বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির ব্যতিক্রম কি কি তা বলতে পারবেন।
- ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা বলতে পারবেন।
- ক্রমবর্ধমান এবং সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি ব্যাখা করতে পারবেন।

কোন দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে উৎপাদনের উপাদানসমূহ যথা– ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের প্রয়োজন। উৎপাদনকারী যখন উৎপাদন বাড়াতে চায় তখন উপকরণের পরিমাণও বাড়াতে হবে। কিন্তু দ্রব্যের উৎপাদন সকল ক্ষেত্রে উপকরণ ব্যবহারের অনুপাতে বৃদ্ধি পায়না। উৎপাদনের পরিমাণ কখনও কম হারে বাড়ে, আবার কখনো সমহারে বাড়ে। উপকরণের নিয়োগ বৃদ্ধির সাথে উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়মগুলোকেই বলা হয় উৎপাদন বিধি। উৎপাদন বিধিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন –

(১) ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি,

(২) ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি এবং

(৩) সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি (Law of Diminishing Return)

অন্যান্য উপকরণকে স্থির রেখে কোন একটি উপকরণের নিয়োগ বাড়াতে থাকলে একটি পর্যায়ের পরে অতিরিক্ত প্রতিটি একক থেকে প্রাপ্তির হার বা উৎপাদনের হার হ্রাস পেতে থাকে – এটাকেই বলা হয় ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি। যেমন জমিতে ক্রমাগতভাবে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা শ্রম ও মূলধন যে হারে বৃদ্ধি পায় উৎপাদন সে তুলনায় কম হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন এবং গড় উৎপাদন ক্রমশ: হ্রাস পায়। এই বিধি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি নামে পরিচিত। অধ্যাপক মার্শালের সংজ্ঞা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার ভাষায় - "An increase in capital and labour applied in the cultivation of land causes in general a less than proportionate increase in amount of produced raised." অর্থাৎ- "কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে চাষের জন্য অধিক হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করতে থাকলে সাধারণত; আনুপাতিক হার অপেক্ষা কম হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।"

কৃষিক্ষেত্রে যেহেতু জমির যোগান স্থির অথচ লোকসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলছে তাই প্রাচীন অর্থনীতিবিদগণ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য মনে করতেন। বর্ধিত জনগোষ্ঠির জন্য খাদ্যের যোগান দিতে একই জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয়। ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, কিন্তু শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির আনুপাতিক হারের চেয়ে কম হারে। অর্থাৎ খরচের তুলনায় উৎপাদন ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। উৎপাদন বিধির এই নিয়মকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। নিম্নে এই বিধিটি একটি তালিকার সাহায্যে প্রদর্শন করা হ'ল ঃ

তালিকা

জমির পরিমাণ	শ্রম ও মূলধন (টাকায়)	মোট উৎপাদন	গড় উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ একর	১০০০.০০	২০ কুইন্টাল	২০ কুইন্টাল	২০ কুইন্টাল
১ একর	২০০০.০০	৪৪ ”	২২ ”	২৪ ”
১ একর	৩০০০.০০	৫৭ ”	১৯ ”	১৩ ”
১ একর	৪০০০.০০	৬৮ ”	১৭ ”	১১ ”

উপরিউক্ত তালিকার উদাহরণে দেখা যাচ্ছে যে, এক একর জমিতে ১০০০ টাকার সমান শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে ২০ কুইন্টাল ধান উৎপাদিত হয়। যেহেতু প্রথম একক শ্রম ও মূলধন নিয়োজিত তাই প্রান্তিক ও গড় উৎপাদনও ২০ কুইন্টাল। ঐ একই জমিতে ২০০০ টাকার সমান শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন হয় ৪৪ কুইন্টাল এবং গড় উৎপাদন ২২ কুইন্টাল এবং প্রান্তিক উৎপাদন ২৪ কুইন্টাল। দ্বিতীয়বারে খরচের তুলনায় উৎপাদন বেশি হারে বৃদ্ধির কারণ এই যে পূর্বের তুলনায় জমি ভালভাবে চাষ করা হয়েছে। তৃতীয়বার ঐ একই জমিতে ৩০০০ টাকার সমান শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন হয় ৫৭ কুইন্টাল এবং গড় উৎপাদন ১৯ কুইন্টাল এবং প্রান্তিক উৎপাদন ১৩ কুইন্টাল। এক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ আনুপাতিক হারে কম হয়েছে। চতুর্থবার ঐ একই পরিমাণ জমিতে ৪০০০ টাকার সমান শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৯ কুইন্টাল এবং গড় উৎপাদন ১৭ কুইন্টাল ও প্রান্তিক উৎপাদন ১১ কুইন্টাল। অতএব এ উদাহরণ থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথমদিকে জমির তুলনায় নিয়োজিত শ্রম ও মূলধন কম হবার জন্য দ্বিতীয়বার গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন না কমে বরং কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থবারে দেখা যাচ্ছে যে, মোট উৎপাদন ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমছে। এটাই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি। এই বিধিটি একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হ’ল ঃ

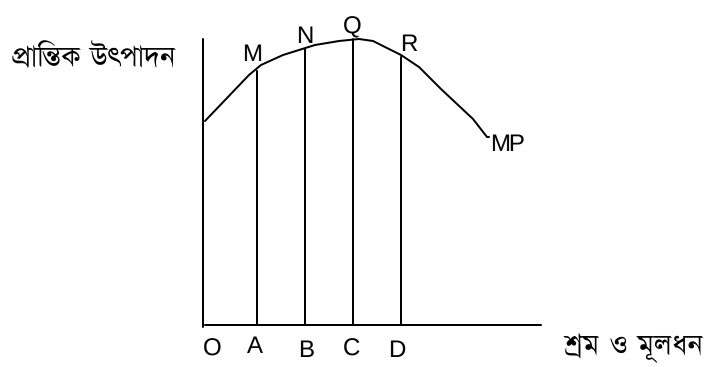

উপরের চিত্রে OX অক্ষরেখায় শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ এবং OY অক্ষরেখায় উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। MP রেখাটি প্রান্তিক উৎপাদন পরিমাণ সূচক। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে যখন OA পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয়, তখন প্রান্তিক উৎপাদন AM এর সমান হয়। যখন OB পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয় তখন প্রান্তিক উৎপাদন BN এর সমান হয়। BN AM এর চেয়ে কিছু বেশি। এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে উৎপাদন কিছু বেশি হয়েছে। যখন OC পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয়, তখন প্রান্তিক উৎপাদন দাঁড়ায় CQ পরিমাণ, যা BN থেকে কম। সর্বশেষে যখন শ্রম ও মূলধন OD পরিমাণ বাড়ানো হয়, তখন প্রান্তিক উৎপাদন দাঁড়ায় RD এর সমান; যা CQ এর চেয়ে কম। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এই জমিতে যত বেশি শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয় প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশঃহ্রাস পাবে। উৎপাদন বৃদ্ধির এ প্রবণতাকে বলা হয় ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি।

বিধিটির ব্যতিক্রম ঃ

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির ব্যতিক্রমগুলি নিম্নরূপ ঃ

১) **উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে ঃ** উৎপাদনের প্রথম স্তরে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি কার্যকরী নাও হতে পারে। প্রথম দিকে যদি শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ কোন নির্দিষ্ট জমি উত্তমরূপে চাষের জন্য যথেষ্ট না হয় তবে অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হলে প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেতে পারে।

২) **চাষ পদ্ধতির আধুনিকীকরণ ঃ** ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটির কার্যকারীতা চাষ পদ্ধতির উপরও নির্ভর করে। কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের করে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটির প্রবণতা কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখা যায়। উন্নত ধরনের চাষাবাদ, সেচ, বীজ ও সার ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে না বেড়ে বরং ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেতে পারে।

৩) **প্রাকৃতিক কারণ ঃ** হঠাৎ কোন প্রাকৃতিক কারণে যদি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় তাহলে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি কার্যকরী হবে না।

৪) **জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ঃ** শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির সাথে সাথে যদি জমির পরিমাণ ও বৃদ্ধি পায়, তবে এ বিধিটি কার্যকরী হবে না।

৫) **সকল উপাদানের একসঙ্গে বৃদ্ধি ঃ** যদি উৎপাদনের সকল উপাদান একই সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, তবে এ বিধিটি কার্যকরী হবে না।

উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি কার্যকরী হয় না। সাময়িকভাবে এই বিধিটির কার্যকারীতা স্থগিত থাকতে পারে কিন্তু এমন এক সময় আসবে যে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কৃষিক্ষেত্রে কার্যকরী হবেই – এজন্য এ বিধিটি চূড়ান্ত বিধি।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি শুধুমাত্র কৃষি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি যে কৃষিক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়। তবে বিধিটি যে শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয়, বরং উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। শিল্প প্রতিষ্ঠান, মৎস্যক্ষেত্র, খনিজক্ষেত্রসহ সকল উৎপাদন ক্ষেত্রেই বিধিটি প্রযোজ্য। নিম্নে এ সকল ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করা হ'ল।

১) **শিল্প ক্ষেত্র ঃ** শিল্প ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকরী হয় তবে প্রথম কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করে অর্থাৎ বিলম্বে। কেননা, শিল্পক্ষেত্রে প্রথমদিকে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকরী হয়ে থাকে। শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির ফলে শিল্প অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের সুবিধাসমূহ পেতে পারে। ফলে একক প্রতি উৎপাদন খরচ কমে যায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি লাভজনক হয়। কিন্তু কোন কারখানার আয়তন সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি করা যায় না। এমতাবস্থায়, একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে না বেড়ে ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়তে থাকবে। সুতরাং দেখা যায় যে, দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্প ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকরী হবে।

২) **খনিজ ক্ষেত্র ঃ** খনিজ ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি প্রযোজ্য। খনিজ পদার্থ যেমন কয়লা, লৌহ ইত্যাদি উত্তোলনের জন্য ক্রমশ: খনির গভীরে যেতে হয় এবং ওর মধ্যে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু এসব কাজ সম্পন্ন করাতে অনেক ব্যয় হয় এবং উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ব্যয়ের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধির হার কম হয়। এভাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধি খনিজ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

৩) **মৎস্য ক্ষেত্রে ঃ** মৎস্যক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকরী হয়ে থাকে। নদী, বিল, পুকুরের মত মৎস্যক্ষেত্রে ইচ্ছা করলেই বেশি মাছ ধরা যায় না। ক্রমাগতভাবে অধিক সংখ্যক মাছ ধরতে হলে বেশি পরিমাণ শ্রম, নৌকা, জাল ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করতে হয়। ফলে ধৃত মৎসের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু মৎস্য সংগ্রহের হার মোট উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় কম হবে। সুতরাং মৎস্য ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি প্রযোজ্য।

ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি (Law of Increasing Return)

কোন উৎপাদন ক্ষেত্রে বর্ধিত হারে উপকরণ বা শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হলে মোট উৎপাদন যদি শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পায় তাহলে তাকে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলা হয়। এরূপ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা শিল্পক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। শিল্পক্ষেত্রে অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হলে শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুবিধাসমূহ ভোগ করে। শিল্পে অধিক মূলধন নিয়োগ করা হলে দক্ষ উদ্যোক্তা, নিপুণ শ্রমিক, অতি আধুনিক ও উন্নত যন্ত্রপাতির সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হয়। এর ফলে উপাদানগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অল্প খরচে ও অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয় এবং উৎপাদনের গড় খরচ হ্রাস পায়। সুতরাং খরচের অনুপাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির একটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হল।

তালিকা

শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন	গড় উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১০০০.০০	২০ কুইন্টাল	২০ কুইন্টাল	২০ কুইন্টাল
২০০০.০০	৬০ "	৩০ "	৪০ "
৩০০০.০০	১২০ "	৪০ "	৬০ "
৪০০০.০০	২৪০ "	৬০ "	১২০ "

উপরের তালিকায় দেখানো হয়েছে যে, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ১০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন হয় ২০ কুইন্টাল এবং গড় ও প্রান্তি উৎপাদন হয় যথাক্রমে ২০ কুইন্টাল। দ্বিতীয়বার ২০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হলে তখন মোট উৎপাদন হয় ৬০ কুইন্টাল এবং গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৩০ কুইন্টাল ও ৪০ কুইন্টাল। তৃতীয়বার ৩০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১২০ কুইন্টাল এবং গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৪০ কুইন্টাল ও ৬০ কুইন্টাল। চতুর্থবার যখন ৪০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয় তখন মোট উৎপাদন বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়ায় ২৪০ কুইন্টাল এবং গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৬০ কুইন্টাল ও ১২০ কুইন্টাল। এভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হলে উৎপাদন খরচের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ উচ্চতর হারে বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বৃদ্ধির এই প্রবণতাকে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলা হয়।

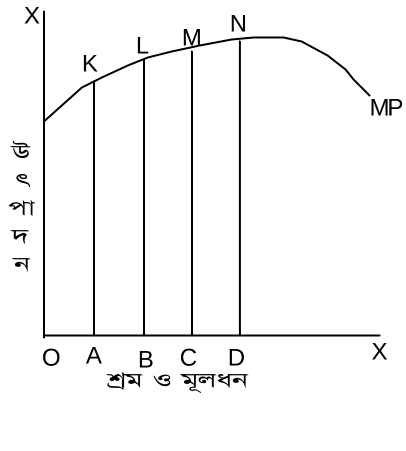

উপরের রেখাচিত্রের সাহায্যে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধির ব্যাখ্যা দেয়া হ'ল ঃ

চিত্রে OX রেখা শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ এবং OY রেখা উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করে। যখন OA পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয়, তখন প্রান্তিক উৎপাদন হয় AK পরিমাণ। যখন আরো একটি অতিরিক্ত একক শ্রম ও মূলধন AB পরিমাণ নিয়োগ করা হয়, তখন প্রান্তিক উৎপাদন BL পরিমাণ হয়। এভাবে যখন শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ CD হয় তখন প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় DN। প্রান্তিক উৎপাদন সূচক রেখা MP উর্দ্ধগামী হয়ে N পর্যন্ত যায়, এরপর অবশ্য নিম্নগামী হয়েছে। ক্রমাগত অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগের ফলে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকরী হয়। এ বিধিটি শিল্পে অধিক প্রযোজ্য। তবে উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিধিটি একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কার্যকরী হয়। তবে এই নির্দিষ্ট সীমার পরে বিধিটি কার্যকরী হয় না।

সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি

কোন উৎপাদনক্ষেত্রে যে হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয়, ঠিক সেই একই হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বৃদ্ধির এই প্রবণতাকে সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলা হয়। এক্ষেত্রে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন খরচ সর্বদা একই থাকে এবং বিক্রেতা একই দামে অতিরিক্ত উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করতে পারে। সাধারণত এবং যে সব শিল্পে অধিক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শ্রমিক এবং কাঁচামাল পর্যাপ্ত, একই দামে পাওয়া যায় সেসব ক্ষেত্রে এ বিধি প্রযোজ্য। এধরনের পরিস্থিতি বিরল। নিম্নে একটি তালিকার সাহায্যে সমানুপাতিক উৎপাদন বিধিটি ব্যাখ্যা করা হ'ল ঃ

তালিকা

শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন	গড় উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১০০.০০	১০ কুইন্টাল	১০ কুইন্টাল	১০ কুইন্টাল
২০০.০০	২০ "	১০ "	১০ "
৩০০.০০	৩০ "	১০ "	১০ "
৪০০.০০	৪০ "	১০ "	১০ "

তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম যখন ১০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয়, তখন মোট উৎপাদন ১০ কুইন্টাল। গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনও ১০ কুইন্টাল। দ্বিতীয়বার যখন ২০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয়, তখন মোট উৎপাদন হয় ২০ কুইন্টাল কিন্তু গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন থেকে যায় ১০ কুইন্টাল। তৃতীয়বার ৩০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয়, তখন মোট উৎপাদন হয় ৩০ কুইন্টাল। গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন আগের মতোই ১০ কুইন্টাল থেকে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে ঐ একই হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার সমানুপাতিক। এজন্য এরূপ অবস্থাকে সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি বলা হয়। নিম্নে একটি রেখা চিত্রের সাহায্যে সমানুপাতিক উৎপাদন বিধিটি ব্যাখ্যা করা হল :

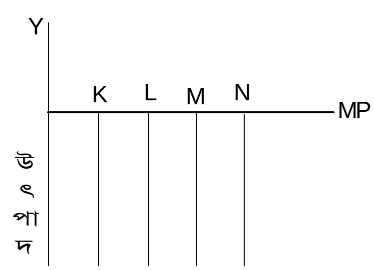

উপরের চিত্রে OX অক্ষে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ এবং OY অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করে। চিত্রে MP হল প্রান্তিক উৎপাদন রেখা। যখন প্রথম একক OA পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয় তখন প্রান্তিক উৎপাদন রেখা AK, যখন দ্বিতীয় একক অর্থাৎ AB পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয় তখন প্রান্তিক উৎপাদন হল BL, যখন তৃতীয় একক অর্থাৎ BC পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয় তখন প্রান্তিক উৎপাদন রেখা CM। এরূপ চতুর্থ এককে প্রান্তিক উৎপাদন দাঁড়ায় DN। উৎপাদনের সকল স্তরেই প্রান্তিক উৎপাদন অর্থাৎ AK, BL, CM & DN পরস্পর সমান। এমতাবস্থায়, প্রান্তিক উৎপাদন রেখাটি ভূমির সাথে সমান্তরাল হয়। অর্থাৎ উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলেও প্রান্তিক উৎপাদন সমানুপাতিক হারে বাড়ছে। এটাই সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি।

অনুশীলনী ৮.১

১. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি সমালোচনাসহ বর্ণনা করুন।
২. ক্রমবর্ধমান ও সমানুপাতিক উৎপাদন বিধিসমূহ বর্ণনা করুন।

উৎপাদন ব্যয়

ইউনিট ১

ভূমিকা

কোন দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে উৎপাদনকারীকে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে সেগুলো ব্যবহার করতে হয়। উপাদানসমূহ উৎপাদন কাজে লাগাতে তাকে যে খরচ করতে হয় এটাকে উৎপাদন ব্যয় বলে। অর্থনীতিতে উৎপাদন খরচের ধারণাটি বিভিন্ন অর্থে (যেমন, আর্থিক ব্যয়, প্রকৃত ব্যয় ও উৎপাদনের সুযোগ ব্যয়) ব্যবহৃত হয়। এসব ব্যয় ধারণা স্বল্পকালীন, দীর্ঘকালীন, স্থির ও পরিবর্তনশীল, মোট ব্যয়, প্রান্তিক ব্যয় ইত্যাদি আঙ্গিকে এ ইউনিটে আলোচনা করা হবে।

পাঠ-১ : উৎপাদন ব্যয় - স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- উৎপাদন ব্যয় বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- উৎপাদনের আর্থিক ব্যয়, প্রকৃত ব্যয় ও সুযোগ ব্যয়ের ধারণাসমূহের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনীয় ব্যয়ের মধ্যে তফাৎ কি তা বলতে পারবেন।
- স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ব্যয়ের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

উৎপাদনের আর্থিক ব্যয়

কোন একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, মূলধন, শ্রমিক প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদান প্রয়োজনানুযায়ী ক্রয় বা সংগ্রহ করতে হয়। এগুলি ক্রয় করতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় সেটাই উৎপাদনের আর্থিক ব্যয়। এগুলো বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন জমি ব্যবহারের দাম খাজনা, শ্রমিকের পারিশ্রমিক মজুরি, মূলধনের জন্য দেয় সুদ এবং সংগঠনের পুরস্কারকে বলা হয় মুনাফা। অর্থাৎ বিভিন্ন উপাদানের সংগ্রহ মূল্যকে উৎপাদনের আর্থিক মূল্য বলে। এই আর্থিক ব্যয়কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা – দৃশ্যমান বা খোলা ব্যয় (Explicit cost) এবং অপ্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন ব্যয় (Implicit cost)। যে উপাদানসমূহ বাজার থেকে ক্রয় করা হয় এবং অর্থের বিনিময়ে পেতে হয় এগুলোকে দৃশ্যমান খরচ বলে। যেমন, মজুরি, সুদ, খাজনা, প্রভৃতি। অন্যদিকে, এমন কিছু উপাদান রয়েছে যেগুলি বাজার থেকে সংগ্রহ করা হয় না যেমন, নিজের এবং পরিবারের সদস্যগণের শ্রম ও মেধা এবং মূলধন প্রভৃতি। এগুলো কিনতে হয় না তাই ব্যয় হয় না; না থাকলে কিনতে হতো। উৎপাদকের এ ধরনের নিজস্ব উপাদানের খরচকে অপ্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন ব্যয় বলে। অর্থনীতিতে এ দু'প্রকার ব্যয় মিলিয়েই মোট ব্যয় ধরা হয়। তাছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য

স্বাভাবিক মুনাফাকে খরচের বা ব্যয়ের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ এই স্বাভাবিক মুনাফা না দিলে উৎপাদকের পক্ষে সংগঠন পরিচালনা বা উৎপাদন চালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

উৎপাদনের প্রকৃত ব্যয়

কোন দ্রব্য উৎপাদনের লক্ষ্যে এর পেছনে যে উদ্যোগ, প্রচেষ্টা, ত্যাগ ও বেদনা বিজড়িত থাকে সেগুলোই হল ঐ দ্রব্য উৎপাদনের প্রকৃত ব্যয়। মার্শাল প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণের মতে কোন দ্রব্য উৎপাদনের প্রকৃত খরচ হল ঐ উৎপাদনে নিয়োজিত মূলধন সঞ্চয়ের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, সংগঠককে যে ঝুঁকি বহন করতে হয়, শ্রমিককে যে মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়, ভূমি ব্যবহারের যে সুযোগ নিতে হয় এসবের সমষ্টি। অবশ্য, মার্শাল ও অন্যান্য ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের মতে ভূমির প্রকৃত কোন খরচ নেই। ভূমি প্রকৃতির দান, ভূমির জন্য শ্রমের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে মূলধনের মতো ভূমিও উৎপাদনের উপাদান। ভূমি উন্নয়নে এবং ব্যবহারেরও ব্যয় আছে। উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন উপাদানকে যে পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তার সমষ্টি হল প্রকৃত খরচ। যেমন, কোন দ্রব্য উৎপাদন করতে গিয়ে শ্রমিক যে কষ্ট সহ্য করে তাই ঐ দ্রব্য উৎপাদনের শ্রমিকের প্রকৃত ব্যয়। মূলধন সৃষ্টি করতে নিয়ে মালিককে ভোগ থেকে বিরত থাকতে যে বেদনা ভোগ করতে হয় তাই মূলধনের প্রকৃত ব্যয়।

সমালোচনা : প্রকৃত ব্যয় তত্ত্বটি একটি অবাস্তব ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত: এই তত্ত্ব জমির খাজনার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারে না। জমি ব্যবহারের জন্য খাজনা দিতে হয় কেন তার কোন ব্যাখ্যা এই তত্ত্বে পাওয়া যায় না।

সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost)

উৎপাদনের উপকরণগুলোর পরিমাণ শুধু সীমাবদ্ধ নয়, এদের বহু বিকল্প ব্যবহারও রয়েছে। কোন একটি উপাদান যখন একটি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন অন্য ক্ষেত্রে এর দ্বারা যে উৎপাদন হতে পারতো তা সম্ভব হয় না। তাই নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের উপাদানকে ব্যবহার করে কোন একটি দ্রব্য উৎপাদিত হয় বটে, কিন্তু এর দ্বারা অন্যান্য যে সকল উৎপাদন করা যেতো তা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এর অর্থ এই যে, একটি উপাদানের সাহায্যে একটি উৎপাদন করতে ঐ উপাদানের ব্যবহারে অন্যান্য উৎপাদনের সুযোগ ত্যাগ করতে হয়। এমতবস্থায়, কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনের ফলে অন্যান্য যেসব দ্রব্য উৎপন্ন হতে পারলো না তা যে দ্রব্যটি উৎপন্ন হল তার সুযোগ খরচ। ধরা যাক, কোন একখণ্ড জমিতে ৫ মণ পাট বা ৫০ মণ ইক্ষু উৎপন্ন করা যায়। যদি ৫ মণ পাট উৎপন্ন করতে হয় তবে ৫০ মণ ইক্ষু উৎপন্ন ছেড়ে দিতে হয়। কিংবা যদি ৫০ মণ ইক্ষু উৎপন্ন করতে গেলে ৫ মণ পাট উৎপাদনের আশা ত্যাগ করতে হয়। তাহলে ৫ মণ পাটের সুযোগ খরচ হচ্ছে ৫০ মণ ইক্ষু কিংবা ৫০ মণ ইক্ষুর সুযোগ খরচ হচ্ছে ৫ মণ পাট। উৎপাদনের ব্যয়কে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : ক. স্থির ব্যয় এবং খ. পরিবর্তনীয় ব্যয়।

ক. স্থির ব্যয় : কোন প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বেশি হোক বা কম হোক, বা সাময়িকভাবে উৎপাদন নাই হোক তা সত্ত্বেও উৎপাদককে প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখতে যে ব্যয় করতে হয় সেগুলোকে

স্থির ব্যয় বলে। যেমন কারখানার জন্য বাড়ী ভাড়া, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতির ক্ষতিপূরণ, দীর্ঘকালীন ঋণের সুদ, সংস্থাপন এর জন্য ব্যয় স্থির ব্যয়ের অন্তর্গত। যতদিন কারখানাটিকে টিকিয়ে রাখতে চাইবেন ততদিন এ ব্যয় বহন করতে হবে।

খ. **পরিবর্তনীয় ব্যয় :** উৎপাদনের পরিমাণ বাড়া কমার সাথে সাথে যে সব ব্যয়ের পরিবর্তন হয় তাদেরকে পরিবর্তনীয় ব্যয় বলে। যেমন শ্রমিকের মজুরী, কাঁচামাল ক্রয় ইত্যাদি ব্যয় এই ধরনের ব্যয়।

স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ব্যয়

স্বল্পকালীন ব্যয় বলতে এমন সব ব্যয় বুঝায় যখন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান তার যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র বা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি পরিবর্তন করতে পারে না। বড় জোর পরিবর্তনীয় খরচগুলি যেমন, শ্রমিক, কাঁচামাল প্রভৃতির পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারে। অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে চাইলে শ্রমিক, কাঁচামাল প্রভৃতির পরিমাণ বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে উৎপাদনের পরিমাণ কমাতে চাইলে এগুলোর পরিমাণ কমিয়ে ফেলে। সুতরাং স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয় হল এর মোট স্থির খরচ ও মোট পরিবর্তনীয় খরচের সমষ্টি।

দীর্ঘকালীন সময় বলতে এমন এক সময় বুঝায় যখন ঘর-বাড়ী, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থির খরচ সমেত সকল ব্যয়ই পরিবর্তন করা যায়। সুতরাং দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যায় বলে এ সময় সকল ব্যয়ই পরিবর্তনীয় অর্থাৎ এই সময় কোন স্থির খরচও পরিবর্তনীয়।

অনুশীলনী ৯.১

১. উৎপাদন ব্যয় বলতে কি বুঝায়? বিভিন্ন প্রকার উৎপাদন ব্যয় বর্ণনা করুন।

পাঠ- ২ : মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মোট ব্যয় বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন
- গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের পার্থক্য চিত্রের সাহায্যে দেখাতে পারবেন।

কোন দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করতে হয়। যেমন, উৎপাদককে জমি ক্রয় করতে হয়, কারখানার ঘর নির্মাণ করতে হয়। যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হয়,কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হয়, শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করতে হয় এবং আরো নানাবিধ উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। যেমন, উৎপাদককে জমি ক্রয় করতে হয়, কারখানার ঘর নির্মাণ করতে হয়, যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হয়, কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হয়, শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করতে হয় এবং আরো নানাবিধ উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। এ সব উপাদান সংগ্রহ করে উৎপাদন কাজে নিয়োগ করতে যে ব্যয় হয় তাকে উৎপাদনের ব্যয় বলে। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে নিয়োগ করতে বা কাজে লাগাতে যে মোট ব্যয় হয় তাকেই উৎপাদনের মোট ব্যয় বলে। যেমন কোন একটি আসবাবপত্র তৈরীর কারখানায় নির্দিষ্ট পরিমাণ আসবাবপত্র (ধরা যাক ১০ খানি চেয়ার) তৈরীর জন্য মোট খরচকে মোট ব্যয় বলে। ধরা যাক, ১০০০ টাকা খরচ হয়েছে। এখানে মোট ব্যয়কে ১০ দিয়ে ভাগ করলে গড়ে প্রতি চেয়ার তৈরীর ব্যয় (১০০ টাকা) পাওয়া যাবে। তাই মোট ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ বা একক দিয়ে ভাগ করলে গড় ব্যয় পাওয়া যায়।

$$\text{গড় ব্যয়} = \frac{\text{মোট ব্যয়}}{\text{উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ}}$$

অন্যদিকে, উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় হল একটি অতিরিক্ত একক উৎপাদনের ব্যয়। একটি দ্রব্যের সর্বশেষ একক বা অতিরিক্ত একটি একক উৎপাদনে যে পরিমাণ অধিক ব্যয় হয়, তাই সে দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়। ধরা যাক, ১০টি বলপেন উৎপাদনে ব্যয় হয় ৪০.০০ টাকা। উৎপাদনের পরিমাণ আর একটি একক বাড়ানোর ফলে অর্থাৎ ১১টি বলপেনের উৎপাদনে মোট ব্যয় হয় ৪৫.০০ টাকা। এখানে অতিরিক্ত একটি বলপেনের জন্য ব্যয় হয়েছে ৪৫.০০ - ৪০.০০) ৫.০০ টাকা। এটাই হল প্রান্তিক ব্যয়। নিচের সারণীতে মোট, গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক দেখানো হল ঃ

উৎপাদন	মোট ব্যয়	গড় ব্যয়	প্রান্তিক ব্যয় (টাকা)
১	২০.০০	২০.০০	২০.০০
২	৩০.০০	১৫.০০	১০.০০
৩	৩৬.০০	১২.০০	৬.০০
৪	৪০.০০	১০.০০	৪.০০
৫	৫০.০০	১০.০০	১০.০০
৬	৭২.০০	১২.০০	২২.০০
৭	১০৫.০০	১৫.০০	৩৩.০০
৮	১৬০.০০	২০.০০	৫৫.০০

উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোট ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোট ব্যয়কে উৎপাদনের একক দ্বারা ভাগ করলে গড় ব্যয় পাওয়া যাচ্ছে। অপরপক্ষে উৎপাদন এক একক বৃদ্ধি করার ফলে মোট ব্যয় যে পরিমাণ বাড়ছে এটাই হল প্রান্তিক ব্যয়। লক্ষণীয় যে, গড় ব্যয় প্রথমদিকে বেশি ছিল তা হ্রাস পায় এবং পরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। প্রান্তিক ব্যয় প্রথমের তুলনায় এক একক বৃদ্ধি পেলে দ্রুত হ্রাস পায় এবং পরে আবার দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।

গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক

গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক এই যে, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে যখন গড় ব্যয় কমতে থাকে তখন প্রান্তিক ব্যয় আরো দ্রুত গতিতে কমতে থাকে। অর্থাৎ এ পর্যায়ে গড় ব্যয় অপেক্ষা প্রান্তিক ব্যয় কম থাকে। উপরের তালিকা অনুযায়ী চতুর্থ একক দ্রব্য উৎপাদন পর্যন্ত গড় ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে এবং এ পর্যায়ে প্রান্তিক ব্যয় ও হ্রাস পাচ্ছে এবং প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের তুলনায় আরো কম। ৫ম এককে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় একই। কিন্তু ৬ষ্ঠ একক থেকে গড় ব্যয় আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এ পর্যায়ে প্রান্তিক ব্যয় অধিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নিচে চিত্রে গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক দেখানো হল।

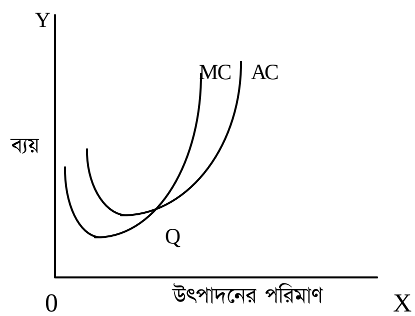

"ক"

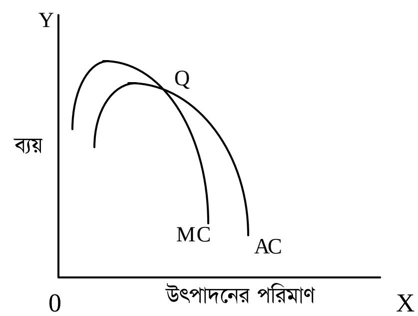

"খ"

চিত্রে AC গড় ব্যয় রেখা এবং MC প্রান্তিক ব্যয় রেখা। গড় ব্যয় রেখা নিম্নগামী হলে প্রান্তিক ব্যয় রেখা আরো নিম্নগামী থাকে। অর্থাৎ এটি গড় ব্যয় রেখার নীচে থাকে। গড় ব্যয় রেখার সর্ব নিম্ন বিন্দু Q তে গড় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পরের সমান হয়। Q বিন্দুর পর গড় ব্যয় রেখা AC উর্দ্ধগামী হয় এবং একই কারণে প্রান্তিক ব্যয় রেখাও উর্দ্ধগামী হয় এবং এটি গড় ব্যয় রেখার উপরে অবস্থান করে। 'ক' চিত্রে প্রান্তিক ব্যয় রেখা Q বিন্দুতে গড় ব্যয় রেখাকে ছেদ করে তুলনামূলকভাবে প্রবল গতিতে উপরে উঠে। গড় ব্যয় রেখা সাধারণত U আকৃত্রির হয় বলে প্রান্তিক ব্যয় রেখা গড় ব্যয় রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে ছেদ করে উপরে উঠে যায়।

কিন্তু গড় ব্যয় রেখা যদি U আকৃতির না হয়ে উপুড় করা U (inverted U) এর মত হয় তবে প্রান্তিক ব্যয় রেখা গড় ব্যয় রেখার সর্বোচ্চ বিন্দুতে ছেদ করে নিচের দিকে নেমে আসবে। 'খ' চিত্রে তা দেখানো হয়েছে।

অনুশীলনী ৯.২

১. মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করুন।

পাঠ ৩ : অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ ব্যয় সংকোচ

ভূমিকা

পূর্বের দুটি পাঠে উৎপাদন ব্যয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উৎপাদনকারীকে অবশ্যই ব্যয় নির্ধারণ ও ব্যয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় উৎপাদনের আয়তনের বিষয়টিও বিবেচনা করতে হয়। অর্থাৎ শিল্প কারখানার উৎপাদন পরিধি কিরূপ হবে সে কথা বলা হচ্ছে। উৎপাদনের আয়তনকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ১. বৃহদায়তন উৎপাদন এবং ২. ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান যখন প্রচুর মূলধন, বহু যন্ত্রপাতি ও প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক নিয়ে বেশি পরিমাণে দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করে তখন তাকে বৃহদায়তন উৎপাদন বলে। অপরপক্ষে, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন বলতে যে সকল শিল্প বা কারখানায় স্বল্প পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগের মাধ্যমে অল্প উৎপাদন করা হয় তাকে বুঝায়।

বৃহদায়তন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের এবং শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি পাবার ফলে কতকগুলো ব্যয় সংকোচ ঘটে। এর ফলে উৎপাদনের ব্যয় বেশ হ্রাস পায়। শিল্পের আয়তন বৃদ্ধির দরুণ এবং কারিগরি জ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এই ব্যয় সংকোচ সম্ভব হয়। আধুনিক বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদনে ব্যয় সংকোচের ফলে উৎপাদনের সকল উপাদান, বিশেষ করে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধ্যাপক মার্শাল বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয় সংকোচের সুবিধাগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন, যথা (ক) অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচ এবং (খ) বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- উৎপাদনের ব্যয় সংকোচের অর্থ কি তা বলতে পারবেন
- অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচের সুবিধাদি বলতে পারবেন।
- বাহ্যিক ব্যয়-সংকোচ ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচ

কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি পেলে এর অভ্যন্তরে যে সমস্ত সুবিধাসমূহের সৃষ্টি হয় তাকে অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচ বলে। যে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়তন যত বড় যে প্রতিষ্ঠান তত অধিক পরিমাণে অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচের সুবিধা ভোগ করে। তবে অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচ বলা হয় এজন্য যে এটা প্রতিষ্ঠানের সু-ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে। অতএব, অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচ কেবলমাত্র শিল্পকারখানাটির আয়তনের সম্প্রসারণের উপর নির্ভর করে না, অভ্যন্তরীণ সুব্যবস্থাপনার এখানে অবদান রয়েছে। যেহেতু এ সকল সুবিধা কারখানার অভ্যন্তর থেকে উদ্ভূত হয় এবং এতে বাইরের কোন প্রভাব থাকে না তাই এসব সুবিধাকে অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচ বলা হয়।

অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচের সুবিধাগুলি নিচে বর্ণনা করা হল ঃ

১. **শ্রম বিভাগের সুবিধা :** বৃহদায়তন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহে একসঙ্গে বহু শ্রমিক কাজ করার সুযোগ পায়। তাই এখানে শ্রমবিভাগ প্রবর্তন সম্ভবপর হয়। শ্রম বিভাগের ফলে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তাদের নৈপুণ্যের বিকাশ ঘটে। ফলে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কাজের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্যপ্রতি খরচ কম পড়ে।

২. **যন্ত্রপাতি কারিগরি সুবিধা :** বৃহদায়তন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান পর্যাপ্ত মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে এবং উন্নত কারিগরি পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে। ফলে গড় উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়।

৩. **ব্যবস্থাপনার সুবিধা :** উৎপাদক প্রতিষ্ঠান আয়তনে বড় হলে ব্যবস্থাপনার সুবিধা গড়ে তোলা যায়। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মীর সংখ্যা সে পরিমাণে বাড়ে না। কম পরিমাণ দক্ষ কর্মীরা বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। এতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়।

৪. **বাণিজ্যিক সুবিধা :** বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান এক সঙ্গে অধিক পরিমাণ কাঁচামাল সুবিধামত সময়ে সস্তায় ক্রয় করতে পারে। ঠিক তেমনিভাবে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য গুদামজাত করা, এজেন্ট নিয়োগ করা, প্রচারণা চালানোর মাধ্যমে সুবিধামত দামে প্রচুর দ্রব্য বিক্রি করতে পারে। এতে বিক্রয় খরচ কম হয় এবং মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

৫. **আর্থিক সুবিধা :** বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সঙ্গতি ও সুনাম অধিক, তাই তারা সহজ শর্তে ঋণ পায় এবং শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রি করে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে পারে এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারে।

৬. **ঝুঁকি হ্রাস :** বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদন বহুমুখীকরণ ও বৈচিত্রমণ্ডিতকরণের মাধ্যমে ব্যবসায়িত ঝুঁকির পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব। নতুন নতুন পণ্য বাজার ছেড়ে গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে পারে। এতে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন সহজতর হয়।

৭. **বিশেষজ্ঞের ব্যয় সংকোচ :** বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে দক্ষ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা সম্ভব হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পায় এবং কারবারের সাফল্য সুনিশ্চিত হয়।

বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ

কোন শিল্পের প্রসার ঘটলে প্রতিষ্ঠান কতকগুলো সুবিধা ভোগ করে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি পেলে ঐ শিল্পের অন্তগত ছোট-বড় সকল প্রতিষ্ঠানই একযোগে যে সুবিধা ভোগ করে তাকে বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ বলে। অর্থাৎ শিল্পের আয়তন বর্ধিত হওয়ার অর্থ কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া বা নতুন নতুন কারখানা স্থাপন হওয়া। একটি শিল্পের আয়তন বাড়লে উক্ত শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানই বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের সুবিধা ভোগ করে। বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের সুবিধাগুলি নিচে অলোচনা করা হল ঃ

১. **স্থানীয়করণজনিত সুবিধা :** শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটলে ঐ শিল্পের অন্তর্গত ছোট-বড় সকল প্রকারের উৎপাদক প্রতিষ্ঠান স্থানীয়করণের সুবিধাসমূহ ভোগ করে। এতে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়।

২. **বিশেষীকরণের সুবিধা :** শিল্পের আয়তন যত বৃদ্ধি পেতে থাকে ঐ শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিভিন্ন অংশ বৈচিত্র্যময় উৎপাদনে নিয়োজিত থেকে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে পারে। যেমন আধুনিক বস্ত্র শিল্পে লক্ষ্য করা যায় যেকোন কোন প্রতিষ্ঠান কেবল সুতা উৎপাদন করে, এই সুতা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, সেই সুতা ক্রয় করে কোন কোন প্রতিষ্ঠান বস্ত্র তৈরি করে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষ ধরনের বস্ত্র উৎপাদনে দক্ষ যেমন তোয়ালে তৈরি, গেঞ্জি তৈরি, চেক তৈরি, শাড়ী তৈরি, সার্টের কাপড় তৈরি প্রভৃতি। এমতাবস্থায় বস্ত্র শিল্পের বিভিন্ন মানের উৎপাদনের নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনে ভোক্তাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং গোটা শিল্প উপকৃত হয়।

৩. **তথ্যের আদান-প্রদানের ব্যয় সংকোচ :** শিল্পের আয়তন বৃদ্ধির ফলে তথ্যের আদান-প্রদান ও সংবাদ সংগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং সহজতর হয়। বিভিন্ন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করতে পারে। ফলে সকল প্রতিষ্ঠান উপকৃত হতে পারে।

অনুশীলনী ৯.৩

১. অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ ব্যয় সংকোচ সুবিধা-অসুবিধাসহ বর্ণনা করুন।

বাজার

ইউনিট ১০

পাঠ ১ : বাজারের সংজ্ঞা ও প্রকরণ

ভূমিকা

অর্থনীতিতে বাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের নিকটই এর গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা এ পাঠে বাজারের সংজ্ঞা বাজারের আয়তনের নির্ধারকসমূহ এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বাজারের শ্রেণীভেদ আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাজারের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- বাজারের আয়তনের নির্ধারকসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাজারের শ্রেণীভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

বাজারের সংজ্ঞা (Definition of Market)

সাধারণ অর্থে বাজার বলতে আমরা এমন একটি স্থানকে বুঝি যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতার সমাগমে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে এরূপ নির্দিষ্ট স্থানকে বাজার হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না। অর্থনীতিতে বাজার বলতে একটি নিদিষ্ট দ্রব্য বা সেবা তার ক্রেতা ও বিক্রেতাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত দামে ক্রয় বিক্রয়কে বুঝায়। যেমন- পাটের বাজার, চায়ের বাজার, শেয়ার বাজার, স্বর্ণের বাজার ইত্যাদি। এক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা একই স্থানে মিলিত হতে পারে কিংবা দূর থেকে টেলিফোন, ফ্যাক্স, পত্র বা দালাল মারফত লেনদেনের কাজ সম্পাদন করতে পারে।

ফরাশী অর্থনীতিবিদ 'কূর্নো'-এর মতে অর্থনীতিবিদগণ বাজার শব্দ দ্বারা দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের নিদিষ্ট স্থানকে বুঝায় না, বরং যে কোন অঞ্চলের সমগ্রটিকে বুঝায়, যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার অবিসংস্রবে দ্রব্যের মূল্য সহজে ও দ্রুততার মানে সমান হবার প্রবণতা দেখা দেয়। 'চ্যাপম্যানের' মতে "বাজার বলতে কোন নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় না, বরং এক বা একাধিক দ্রব্যকে বুঝায় যা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্দিষ্ট দাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে ক্রয়-বিক্রয় হয়"।

সুতরাং বাজারের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলো হলো: (১) ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য একটি দ্রব্য বা সেবা; (২) দ্রব্যের ক্রেতা বা বিক্রেতা; (৩) দ্রব্যটি ক্রয় বিক্রয়ের এক বা একাধিক অঞ্চল; (৪) ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে দর কষাকষির মধ্যেমে দাম নির্ধারণ।

বাজারের আয়তন বা বিস্তৃতি (The Size or Extent of Market): কোন কোন দ্রব্যের বাজারের আয়তন সংকীর্ণ। আবার কোন কোন দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত। আয়তন বা বিস্তৃতির আলোকে বিবেচনা করলে কোন দ্রব্যের বাজার স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক হতে পারে। যে সমস্ত বিষয়ের উপর বাজারের আয়তন বা বিস্তৃতি নির্ভর করে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **দ্রব্যের চাহিদা :** দ্রব্যের চাহিদা যত ব্যাপক সে দ্রব্যের বাজার তত বিস্তৃত, অন্যদিকে দ্রব্যের চাহিদা কম হলে তার বাজারও সংকীর্ণ হয়। যেমন- স্বর্ণের চাহিদা বিশ্বব্যাপী তাই তার বাজার বিশ্বজোড়া। মাছ, দুধ, শুটকী ইত্যাদির বাজার সংকীর্ণ।

২. **দ্রব্যের যোগান :** বাজারের বিস্তৃতি দ্রব্যের যোগানের উপরও নির্ভরশীল। ব্যাপক চাহিদার পাশাপাশি পর্যাপ্ত যোগান না থাকলে বাজার ব্যাপক হয় না।

৩. **দ্রব্যের স্থায়িত্ব :** যে সব দ্রব্য দীর্ঘস্থায়ী এবং টেকসই তাদের বাজার বিস্তৃত হয়। যেমন- সোনা, রূপা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দীর্ঘস্থায়ী বলে এদের বাজার বিস্তৃত। যেমন – ক্ষণস্থায়ী ও পঁচনশীল দ্রব্যের বাজার অল্প সময়ের মধ্যেই ভোগ করে ফেলতে হয়, যেমন – দুধ, মাছ, তরকারীর ইত্যাদির বাজার ছোট।

৪. **পরিবহনযোগ্যতা :** যে সব দ্রব্য হালকা অথচ দামী সেগুলি অতি সহজেই এবং অল্প খরচে স্থানান্তর করা যায়। তাই এদের বাজার বিস্তৃত, সোনা, রূপা ইত্যাদি মূল্যবান এবং স্থানান্তর খরচ কম। তাই এদের বাজার ব্যাপক। সেসব দ্রব্য ভারী এবং স্থানান্তর কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল যেসব দ্রব্যের বাজার সীমিত। যেমন- ইটের বাজার।

৫. **শ্রেণী বিভাগ ও নমুনাকরণ :** যেসব দ্রব্যের গুণাগুন অনুযায়ী শ্রেণীভেদ ও নমুনাকরণ করা যায় সেসব দ্রব্যের বাজার ব্যাপক।

৬. **যাতায়ত ও পরিবহন ব্যবস্থা :** যাতায়ত ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হলে দ্রব্যাদি সহজে এবং সময়মত দূরে পাঠানো সম্ভব হয় বলে বাজার বিস্তৃত হয়।

৭. **শান্তি ও নিরাপত্তা :** দেশের ভিতরে ও বাইরে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকলে নির্বিঘ্নে দ্রব্যসামগ্রী স্থানান্তর করা যায়। ফলে বাজার বিস্তৃত হয়।

৮. **বাণিজ্যনীতি :** সরকারের বাণিজ্য নীতি সহজ ও উদার হলে বাজার বিস্তৃত হয়।

৯. **আর্থিক নীতি :** সরকারের আর্থিক নীতি সহজ হলে (যেমন- সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তি, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল) বাজার বিস্তৃত হয়।

১০. **প্রচার :** বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দ্রব্যের দাম, গুণাগুণ, প্রাপ্তি স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে ক্রেতাদের বেশি তথ্য দেয়ার সুযোগ থাকলে বাজার বিস্তৃত হয়।

১১. **শ্রম বিভাগের মাত্রা :** উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অধিকমাত্রায় শ্রম বিভাগের প্রয়োগ হলে কম খরচে বেশি উৎপাদন সম্ভব। ফলে বাজার বিস্তৃত হয়।

বাজারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Market) : আয়তন, সময় এবং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীভেদ করা যায়-

১. **পরিধি অনুসারে :** স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার।

ক. স্থানীয় বাজার (Local Market): যে দ্রব্যের বাজার দেশের একটি বিশেষ স্থান বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তার বাজারকে স্থানীয় বাজার বলে, যেমন- মাছ, দুধ, শাক-সব্জির বাজার।

খ. জাতীয় বাজার (National Market): কোন দ্রব্যের বাজার সারা দেশ ব্যাপী হলে তাকে জাতীয় বাজার বলে, যেমন- দেশীয় বস্ত্র, প্রসাধনী ইত্যাদির বাজার।

গ. আন্তর্জাতিক বাজার (International Market): কোন দ্রব্যের বাজার দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অন্যান্য দেশেও সম্প্রসারিত হলে সে বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলা হয়। যেমন- সোনা, রূপা, উন্নতমানের তৈরী পোষাক, যন্ত্রপাতির বাজার।

২. **সময়ের ভিত্তিতে :** অতি স্বল্পকালীন, স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন বাজার।

ক. অতিস্বল্পকালীন বাজার (Very Short Period Market): যখন কোন দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় তখন সে বাজারকে অতি স্বল্পকালীন বাজার বলে। এ ধরনের বাজারে দ্রব্যের যোগান অপরিবর্তনীয়, তাই দ্রব্যের দাম নির্ধারণে তার চাহিদার ভূমিকাই মুখ্য। মাছ, শাক-সব্‌জি ইত্যাদির বাজার এর আওতাভূক্ত।

খ. স্বল্পকালীন বাজার (Short Period Market): যে বাজারে পরিবর্তিত চাহিদার সাথে দ্রব্যের যোগানের সামান্যতম সমন্বয় সাধন সম্ভব তবে তা কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল উপকরণ (কাঁচামাল, শ্রম) পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্ভব। স্বল্পকালে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, আয়তন, যন্ত্রপাতির পরিমাণ এর কোনরূপ পরিবর্তন করা যায় না। এ ধরনের বাজারে দ্রব্য মূল্য নির্ধারণে যোগানের তুলনায় চাহিদার ভূমিকা অধিক।

গ. দীর্ঘকালীন বাজার (Long Period Market): যে বাজারে পরিবর্তিত চাহিদার সাথে যোগানের সম্পূর্ণরূপে সমন্বয় সাধন সম্ভব। দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, আয়তন, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন করে দ্রব্যের যোগান এবং চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায়। এ দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল উপাদানই পরিবর্তনশীল, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দীর্ঘকালীন দাম নির্ধারিত হয়।

৩. **প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Perfect Competition): যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি সমজাতীয় দ্রব্য দর কষাকষির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দামে তা ক্রয় বিক্রয় করে তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।

খ. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Imperfect Competition): যে বাজারে অনেক ক্রেতা থাকবেও বিক্রেতার সংখ্যা কম এবং দ্রব্যের দামের উপর বিক্রেতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় তাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার নানা ধরনের। যেমন- একচেটিয়া বাজার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার, অলিগোপলি বাজার, ডুয়োপলি বাজার, মনোপসনি বাজার, বাইলেটারেল মনোপলি বাজার।

i. একচেটিয়া বাজার (Monopoly Market): যে বাজারে দ্রব্যের একজন মাত্র বিক্রেতা এবং দ্রব্যের দামের উপর তার আধিপত্য বিদ্যমান, তাকে একচেটিয়া বাজার বলে। দ্রব্যটির কোন নিকট বিকল্প নেই এবং বাজারে অন্য কোন উৎপাদনকারীর প্রবেশাধিকার নেই। একচেটিয়া কারবারী তার দ্রব্যের জন্য বিভিন্ন বাজার থেকে বিভিন্ন দাম আদায় করতে পারে। এ ধরনের বাজারকে বলে দাম বিভেদমূলক একচেটিয়া বাজার।

ii. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Monopolistic Competition): যে বাজারে একচেটিয়া ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য একই সংগে বিদ্যমান থাকে তাকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। এ বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা অনেক তবে অসংখ্য নয়। এরূপ বাজারে দ্রব্যগুলি সমজাতীয় নয় তবে এরা পরস্পরের নিকট বিকল্প ট্রেডমার্ক, মোড়ক, রং ইত্যাদির সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্রেতাদের নিকট একটি দ্রব্য অন্যটি থেকে পৃথক করা হয়। যেমন- বিভিন্ন রকম টুথপেষ্ট, টয়লেট সাবান।

iii. অলিগোপলি বাজার (Oligopoly): যে বাজারে বিক্রেতা দু'য়ের অধিক কিন্তু খুব বেশি নয় তাকে অলিগোপলি বাজার বলে। একজনের দাম উৎপাদন নীতি অন্যরা সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

iv. ডুয়োপলি বাজার (Duopoly): যে বাজারে বিক্রেতা মাত্র দু'জন কিন্তু ক্রেতা অসংখ্য তাকে ডুয়োপলি বাজার বলে।

v. মনোপসনি বাজার (Monopsony): যে বাজারে বিক্রেতা অসংখ্য কিন্তু ক্রেতা মাত্র একজন তাকে মনোপসনি বাজার বলে।

vi. বাইলেটারেল মনোপলি বাজার (Bilateral Monopoly): যে বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা মাত্র একজন করে সে বাজারকে বাইলেটারেল মনোপলি বাজার বলে।

অনুশীলনী ১০.১

১. বাজার বলতে কি বুঝেন? বাজারের বিস্তৃতি কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

২. বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাজারের শ্রেণীভেদ আলোচনা করুন?

পাঠ ২ : বিক্রয়লব্ধ আয় বা রেভেনিউ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বিক্রয়লব্ধ আয় বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- মোট আয়, গড় আয়, ও প্রান্তিক আয়ের সংজ্ঞা ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

একজন উৎপাদনকারীর মৌল উদ্দেশ্য মুনাফা সর্বোচ্চকরণ। আর তা করার জন্য তাকে উৎপাদন খরচ ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়। অতএব, এ দুটো বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। আমরা এ পাঠে ফার্ম ও শিল্প সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করে মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় ধারণা তিনটি আলোচনা করব। পরিশেষে বাজারের ধরন অনুযায়ী গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে সম্পর্ক তুলে ধরব।

ফার্ম ও শিল্প (Firm and Industry) :

কারখানা, খনি, মাঠ, পণ্যাগার, স্টোর ইত্যাদি নানাবিধ অবস্থানে উৎপাদন কার্য সংগঠিত হতে পারে। এদের প্রত্যেকটিই হলো এক একটি প্ল্যান্ট। কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্ল্যান্টের মালিক হলে সেটাকে ফার্ম বলে। সাধারণতঃ ফার্ম একটি প্ল্যান্টেরই মালিক হয়। তবে কোন কোন বৃহদাকার ফার্মের অধীনে একাধিক প্ল্যান্টও থাকতে পারে। যেসব ফার্ম অভিন্ন ও সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করে সেগুলোকে একই শিল্পের অর্ন্তভুক্ত করা হয়। অবশ্য কোন কোন ফার্ম একাধিক পণ্যও উৎপাদন করে। সেক্ষেত্রে একই ফার্ম বিভিন্ন শিল্পের অর্ন্তগত হওয়াও সম্ভব।

ফার্ম হচ্ছে কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষুদ্রতর ইউনিট। সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত সবকয়টি ফার্ম মিলে হয় শিল্প। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম গোটা শিল্পের তুলনায় এতই ছোট যে দাম নির্ধারণে তার কোন ভূমিকা নেই। বাজারে চাহিদা ও যোগানের (শিল্পের) ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে নির্ধারিত দামেই ফার্মকে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। সে কেবলমাত্র দাম গ্রহীতা হিসেবে কাজ করে। শিল্পে নির্ধারিত দামে একটি ফার্ম তার উৎপাদন খরচের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করে। মনোপলি বাজারে যেহেতু একজন মাত্র বিক্রেতা, সেহেতু সে একাধারে ফার্ম এবং শিল্পের ভূমিকা দুই-ই পালন করে। দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণে সে একক ভূমিকা পালন করে। অবশ্য তাকে ক্রেতাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে শিল্পে ফার্মের সংখ্যা স্থির থাকে। কিন্তু দীর্ঘকালে নতুন ফার্ম ব্যবসায় প্রবেশ করতে পারে এবং কোন ফার্ম ব্যবসা ছেড়ে চলে যেতে পারে।

বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা আয় (Revenue)

কোন উৎপাদক উৎপাদিত দ্রব্য বা সেবা বিক্রি করে যে অর্থ পায় তাকে বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা আয় বলে। বিক্রয়লব্দ অর্থ তিন ধরনের। যেমন :-

মোট আয় - Total Revenue (TR)

গড় আয় - Average Revenue (AR)

প্রান্তিক আয় - Marginal Revenue (MR)

মোট আয় (TR): কোন উৎপাদক তার উৎপাদিত দ্রব্যের সবকয়টি একক বিক্রি করে যে পরিমাণ অর্থ লাভ করে তাকে মোট আয় বলে। বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) কে একক প্রতি দাম (P) দিয়ে গুণ করলে মোট আয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ TR=PXQ। মনে করি একজন উৎপাদক ১০০ একক দ্রব্য উৎপাদন করে একক প্রতি ৫ টাকা দামে বিক্রি করে। এমতবস্থায় উৎপাদকের মোট আয় হবে (১০০×৫) টাকা বা ৫০০ টাকা।

গড় আয় (AR): কোন দ্রব্যের একক প্রতি যে গড়পড়তা আয় হয় তাকে গড় আয় বলে। মোট বিক্রয় লব্ধ অর্থকে বিক্রিত দ্রব্যের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে গড় আয় পাওয়া যায়।

$$\text{অর্থাৎ গড় আয় (AR)} = \frac{\text{মোট আয় (TR)}}{\text{মোট বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)}}$$

গড় আয় সর্বদা দামের সমান হয় (AR=P)।

উপরোক্ত উদাহরণে উৎপাদক ১০০ একক দ্রব্য বিক্রি করে ৫০০ টাকা মোট আয় অর্জন করলে গড় আয় বা দাম হলো (৫০০÷১০০) টাকা বা ৫ টাকা।

প্রান্তিক আয় (MR): উৎপাদিত দ্রব্যের এক একক বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ালে বা কমালে মোট আয়ের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক আয় বলে। যদি ১০০ একক দ্রব্যের মোট আয় ৫০০ টাকা হয় এবং ১০১ একক দ্রব্যের মোট আয় ৫০৪ টাকা হয় তাহলে ১০১ তম এককের প্রান্তিক আয় হবে (৫০৪-৫০০) টাকা বা ৪ টাকা।

$$\text{অর্থাৎ প্রান্তিক আয় (MR)} = \frac{\text{মোট আয়ের পরিবর্তন } (\Delta TR)}{\text{মোট বিক্রয়ের পরিমাণ } (\Delta Q)}$$

এখানে Δ চিহ্নটির অর্থ হলো সূক্ষ্মতম পরিবর্তন। বিষয়টি ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা যায়। ধরি n সংখ্যক এককের মোট আয় TR_n এবং $(n+1)$ সংখ্যক এককের মোট আয় TR_{n+1}।

$\therefore$ $(n+1)$ তম এককের প্রান্তিক আয় $= (TR_{n+1} - TR_n)$।

গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে সম্পর্ক (Relationshing between Average Revenue and Marginal Revenue) : বাজারের ধরনভেদে গড় আয় এবং প্রান্তিক আয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক ভিন্নতর হয়। ফলে বাজারভেদে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখার ধরনও ভিন্নতর হয়। নিম্নে পূর্নপ্রতিযোগিতামূলক বাজার ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গড় আয় এবং প্রান্তিক আয়ের মধ্যকার সম্পর্ক আলোচনা করা হলো।

ক. পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে সম্পর্ক

পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে বহু সংখ্যক বিক্রেতা একটি সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রয় করে বলে কোন বিক্রেতা এককভাবে দ্রব্যের দামের উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। বাজারে চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে যে দাম নির্ধারিত হয় সে দামেই প্রত্যেক উৎপাদককে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। প্রতিটি ফার্ম কেবলমাত্র দাম গ্রহীতা হিসেবে নির্দিষ্ট দামে যে কোন পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করতে পারে। ফলে বিক্রয়ের পরিমাণ যা-ই হউক না কেন দ্রব্যের দাম তথা গড় আয় একই থাকে। এজন্য প্রান্তিক আয় সর্বদা একই থাকে এবং তা গড় আয়ের সমান হয়। অর্থাৎ বিক্রয়ের পরিমাণ পরিবর্তন হলে আয়ের পরিবর্তনও একই হারে হয়। সূচী ১০.১ এ পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে গড় আয়ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হলো :

সূচী ১০.১

বিক্রির পরিমাণ (Q)	মোট আয় (TR)	গড় আয় (AR)	প্রান্তিক আয় (MR)
১ একক	২০ টাকা	২০ টাকা	২০ টাকা
২	৪০	২০	২০
৩	৬০	২০	২০
৪	৮০	২০	২০
৫	১০০	২০	২০

উপরোক্ত সূচীটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে মোট আয় একই হারে বাড়ে, অর্থাৎ বিক্রয়ের সর্বস্তরে গড় আয় এবং প্রান্তিক আয় অপরিবর্তনীয় এবং এরা পরস্পর সমান (২০ টাকা)।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে গড় আয় এবং প্রান্তিক আয়ের মধ্যকার সম্পর্ক নিচের রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :

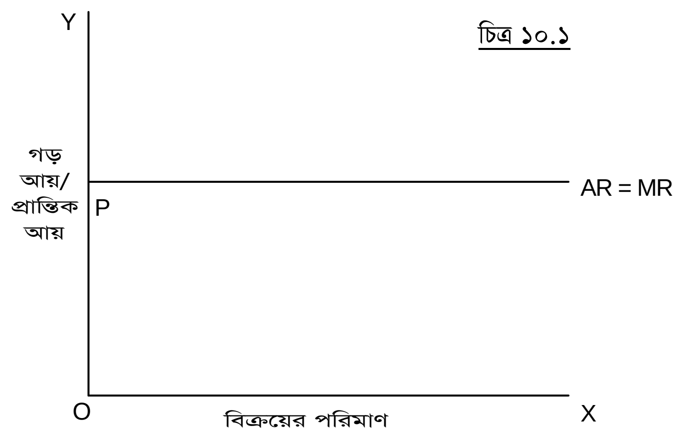

চিত্র ১০.১

চিত্র ১০.১ এ ভূমি অক্ষে বিক্রির পরিমাণ এবং উলম্ব অক্ষে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় দেখান হলো। দ্রব্যের একক প্রতি দাম op হলে বিক্রেতা যে কোন পরিমাণ বিক্রি করতে পারে। ফলে ফার্মের চাহিদা রেখা বা তার আয় রেখা (AR) ভূমি অক্ষের সমান্তরাল। প্রান্তিক আয় রেখা (MR) গড় আয় রেখার সাথে মিলে গেছে। চিত্রে AR =MR হলো গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা। উল্লেখ্য, এ বাজারে শিল্পের ক্ষেত্রে দ্রব্যের চাহিদা রেখা ডান দিকে নিম্নগামী।

খ. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে সম্পর্ক :

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দামের উপর বিক্রেতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াতে হলে দাম কমাতে হয়। বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে দাম কমায় এরূপ প্রবণতার দরুন এ বাজারে গড় আয় ক্রমাগত কমতে থাকে। এরূপ বাজারে বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক আয় গড় আয়ের চেয়ে অধিক হারে কমে। অর্থাৎ বিক্রির কোন স্তরে প্রান্তিক আয় গড় আয় অপেক্ষা কম হয়। নিচের সূচীর সাহায্যে এ সম্পর্কটি তুলে ধরা হলো :

সূচী ১০.২

বিক্রির পরিমাণ (Q)	মোট আয় (TR)	গড় আয় (AR)	প্রান্তিক আয় (MR)

১ একক	২০ টাকা	২০ টাকা	২০ টাকা
২	৩৮	১৯	১৮
৩	৫১	১৭	১৩
৪	৬০	১৫	৯
৫	৬৫	১৩	৫

উপরের সূচীতে দেখা যাচ্ছে বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট আয় ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ছে। অর্থাৎ প্রান্তিক আয় এবং গড় আয় উভয়ই কমছে। তবে গড় অপেক্ষা প্রান্তিক আয় বেশি কমছে। এজন্য প্রান্তিক আয় গড় আয় অপেক্ষা কম।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যকার সম্পর্ক চিত্র ১০.২ এ দেখানো হলো-

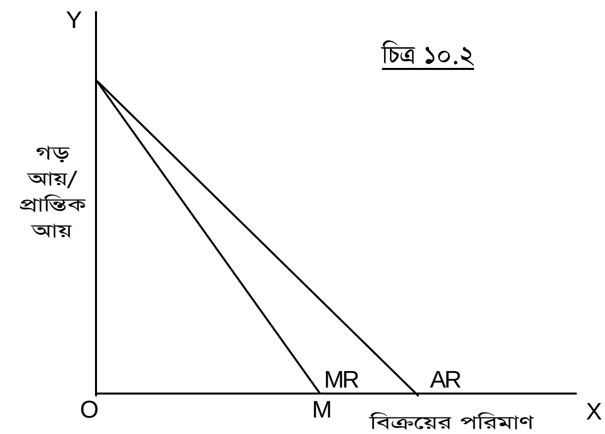

চিত্রে OX অক্ষে বিক্রির পরিমাণ এবং OY অক্ষে গড় ও প্রান্তিক আয় দেখানো হলো। এ ধরনের বাজারে গড় আয় রেখা (AR) ও প্রান্তিক আয় রেখা (MR) উভয়ই ডানদিকে নিম্নগামী। তবে প্রান্তিক আয় রেখা সর্বদা গড় আয় রেখার নিচে অবস্থান করে। কেননা বিক্রি বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক আয় গড় আয়ের চেয়ে অধিক হারে কমে। চিত্রে AR ও MR হলো যথাক্রমে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা। লক্ষণীয় যে, বিক্রির পরিমাণ যখন OM, তখন প্রান্তিক আয় শূন্য। বিক্রির পরিমাণ তার চেয়ে বেশি হলে প্রান্তিক আয় ঋণাত্মক হয়ে যাবে।

অনুশীলনী ১০.২

১. ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন?

২. মোট আয়, গড় আয় এবং প্রান্তিক আয় বলতে কি বুঝেন? বাজারের ধরন ভেদে গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন?

পাঠ ৩ : মুনাফা সর্বোচ্চ করণের শর্তাবলী
(Profit Maximizing Conditions)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- মুনাফা সর্বোচ্চকরণের শর্তাবলী বলতে পারবেন।
- ফার্মের ভারসাম্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা সর্বোচ্চ করণ। মুনাফা হচ্ছে মোট আয় (TR) এবং মোট উৎপাদন ব্যয় (TC)এর পার্থক্য। উৎপাদক তার উৎপাদন স্তর এমন পর্যায়ে স্থির করে যেখানে তার মুনাফা সর্বোচ্চ হয় আর এ উৎপাদনস্তরকে বলা হয় ভারসাম্য উৎপাদন। মোট উৎপাদন খরচের মধ্যে বিভিন্ন উপকরণের জন্য দেয় মজুরী/দাম অর্ন্তভুক্ত থাকে এবং তাতে উৎপাদকের নিজের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা ও তদারকির জন্য হিসাবকৃত মজুরীও অর্ন্তভুক্ত থাকে যা হলো স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit)। সুতরাং মোট আয় ও মোট উৎপাদন খরচের পার্থক্য শূন্য হলে, উৎপাদক স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। আর এ পার্থক্য ধণাত্মক হলে তা অস্বাভাবিক মুনাফা। এ পাঠে একটি ফার্মের ভারসাম্য উৎপাদন স্তর কিভাবে নির্ণয় হয় তা আলোচনা করব। অর্থাৎ ভারসাম্য উৎপাদন স্তর নির্ণয়ের শর্তাবলী আলোচনা করব। পরবর্তী দুটো পাঠে বাজারের ধরনভেদে ভারসাম্য উৎপাদন স্তর নির্ণয় সম্পর্কে আলোচনা করব। এ পর্যায়ে বিষয়টির একটি সাধারণ আলোচনা করব। বিষয়টিকে সহজে বোধগম্য করার জন্য আমরা পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারের কথা বিবেচনা করব। অবশ্য ভারসাম্যের শর্তাবলী সকল বাজারে একই।

ফার্মের ভারসাম্য শর্তাবলী (Equilibrium Conditions of a firm)

ফার্মের ভারসাম্য বিশ্লেষণ মোট আয় ও মোট উৎপাদন খরচ রেখার মাধ্যমে করা যায়। কিন্তু বহুল ব্যবহৃত ও সহজে বোধগম্য বিশ্লেষণটি হলো প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ রেখার মাধ্যমে। আমরা শেষোক্ত প্রক্রিয়ার ভারসাম্য শর্তাবলী পর্যালোচনা করব।

আমরা জানি, যতক্ষণ অতিরিক্ত একক থেকে প্রাপ্ত রেভেনিউ বা প্রান্তিক আয় (MR) তার জন্য ব্যয়িত অর্থ (MC) থেকে বেশি হবে ততক্ষণ পর্যন্ত একটি ফার্ম এর উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে থাকবে। কেননা অতিরিক্ত উৎপাদন ফার্মের মুনাফার পরিমাণ বাড়াবে। যদি অতিরিক্ত এককের উৎপাদক খরচের চেয়ে তা থেকে প্রাপ্ত রেভেনিউ কম হয় (অর্থাৎ MC>MR) তাহলে ফার্ম সে একক উৎপাদন করবে না। কারণ ঐ এককের উৎপাদন মুনাফা না এনে লোকসানই আনছে। ভিন্নভাবে বলা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত MR>MC ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদক তার উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে যাবে এবং ফলে মুনফাও বাড়বে। যে উৎপাদন স্তরে MC=MR হয় সে পর্যন্ত উৎপাদন বাড়িয়ে মুনাফা বৃদ্ধি সম্ভব। এর পরে উৎপাদন বাড়ালে MC>MR হয় এবং অতিরিক্ত একক উৎপাদন মুনাফার পরিমাণ কমিয়ে দেবে। কেননা সে একক ফার্মকে মুনাফা না দিয়ে লোকসান দিচ্ছে। সুতরাং উৎপাদনের সে স্তরে MC=MR হয় তা হলো সর্বোচ্চ মুনাফা প্রদানকারী উৎপাদন স্তর। অর্থাৎ যে উৎপাদন স্তরে MC=MR সে উৎপাদন স্তরই হলো ভারসাম্য উৎপাদন। চিত্র ১০.৩ এ ভারসাম্য উৎপাদন স্তর নির্ণয় প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হলো।

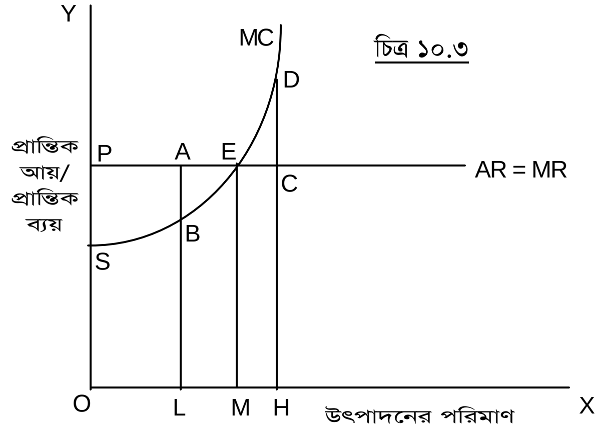

চিত্র ১০.৩

চিত্রে OX অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং OY অক্ষে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় দেখান হলো। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আলোচনার সুবিধার্থে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কথা বিবেচনা করা হয়েছে।

মনে করি, শিল্পের চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে বাজারে OP দাম নির্ধারিত হয়েছে। প্রতিটি ফার্ম এই দামেই বাজারে তার উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এমতাবস্থায় ফার্মের গড় আয় ও চাহিদা রেখা একই অর্থাৎ প্রান্তিক আয় রেখা AR=MR। MC রেখা হলো ফার্মের প্রান্তিক খরচ রেখা। OM উৎপাদন স্তরে উৎপাদনের মুনাফার পরিমাণ সর্বোচ্চ। কেননা এই উৎপাদন স্তরে MC=MR। উৎপাদন OM এর চেয়ে কম হলে মুনাফা সর্বোচ্চ হবে না। কেননা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে মুনাফা বাড়ানো সম্ভব, যেহেতু MC<MR। যদি উৎপাদক OM এর চেয়ে কম বা বেশি উৎপাদন করে তাহলে মুনাফা OM উৎপাদন স্তরের মুনাফার চেয়ে কম হবে। যেমন OL উৎপাদন স্তরে প্রান্তিক আয় AL এবং প্রান্তিক ব্যয় BL অর্থাৎ MR>MC। এমতাস্থায় উৎপাদন বাড়িয়ে বাড়তি মুনাফার্জন সম্ভব। উৎপাদনের পরিমাণ OL থেকে বৃদ্ধি করে OM স্তরে নিলে ABE ক্ষেত্র দ্বারা নির্দেশিত মুনাফা বাড়ানো সম্ভব আর যদি উৎপাদন OL স্তরে থাকে অর্থাৎ LM পরিমাণ উৎপাদন না করে তা হলে উৎপাদক সেই পরিমাণ মুনাফা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই OM হচ্ছে সর্বোচ্চ মুনাফা প্রদানকারী উৎপাদন স্তর বা ভারসাম্য উৎপাদন স্তর। আবার OH উৎপাদনস্তরে প্রান্তিক আয় CH এবং প্রান্তিক ব্যয় DH অর্থাৎ MC>MR । সুতরাং অতিরিক্ত এককগুলোর জন্য মুনাফা না হয়ে লোকসান হয়। MH পরিমাণ উৎপাদনের জন্য ক্ষতির পরিমাণ CDE দ্বারা নির্দেশিত ক্ষেত্রের সমান। এমতাবস্থায় সে পরিমাণে মুনাফা কমে যাবে। অর্থাৎ MH পরিমাণ বাড়তি উৎপাদন না করলে CDE পরিমাণ লোকসান থেকে রক্ষা পাবে। অতএব, উৎপাদকের ভারসাম্য উৎপাদন যে উৎপাদন OM স্তরে MC=MR। এই ভারসাম্য উৎপাদন স্তরে উৎপাদকের সর্বোচ্চ মুনাফা হয় এবং তার পরিমাণ PSE দ্বারা নির্দেশিত ক্ষেত্রের সমান।

MC=MR হলেই অর্থাৎ যে বিন্দুতে MC রেখা MR রেখাকে ছেদ করে সেটাই উৎপাদকের ভারসাম্য বিন্দু তা মেনে নেয়ার কোন কারণ নেই। এটা শুধু ভারসাম্যের প্রথম ক্রমিক শর্ত বা প্রয়োজনীয় শর্ত। ভারসাম্যের আর একটি শর্ত রয়েছে যা হচ্ছে দ্বিতীয় ক্রমিক শর্ত বা অবশ্যই পূরণ হতে হবে এমন শর্ত। দ্বিতীয় শর্তটি হলো ভারসাম্য বিন্দুতে MC রেখা MR রেখাকে অবশ্যই নিচের দিক থেকে ছেদ করবে। চিত্র ১০.৪ এ বিষয়টি তুলে ধরা হলো।

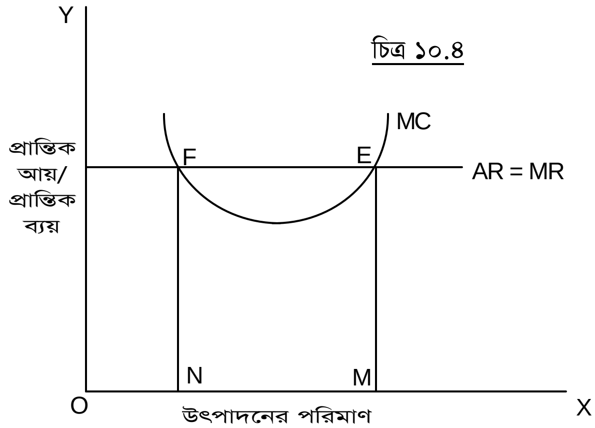

চিত্র ১০.৪ এ দেখা যাচ্ছে যে MC রেখা MR রেখাকে F বিন্দুতে উপরের দিক থেকে এবং E বিন্দুতে নিচের দিক থেকে ছেদ করেছে। উভয় বিন্দুতেই MC=MR হলেও ভারসাম্য বিন্দু হলো E। F বিন্দুর সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনের পরিমাণ হলো ON। এখন উৎপাদক ON এর চেয়ে বেশি উৎপাদন করলে MR>MC হয়। অর্থাৎ অতিরিক্ত একক থেকে প্রাপ্ত আয় তার জন্য ব্যয়িত অর্থের চেয়ে বেশি তাই উৎপাদনের পরিমাণ ON থেকে বাড়ানো যৌক্তিক এবং তা করলে মুনাফা বাড়বে। এভাবে উৎপাদন বাড়াতে বাড়াতে OM স্তরে না আসা পর্যন্ত মুনাফার পরিমাণ বাড়তেই থাকবে। উৎপাদন যখন OM এর সমান হয় তখন মুনাফা পরিমাণ সর্বোচ্চ হবে। আবার OM এর চেয়ে বেশি উৎপাদন করলে অতিরিক্ত এককের জন্য ব্যয়িত অর্থ তার থেকে প্রাপ্ত আয়ের চেয়ে বেশি হয় বলে মুনাফার পরিমাণ কমে যাবে। সুতরাং OM-ই হলো ভারসাম্য উৎপাদন স্তরে যে উৎপাদন স্তরে MC = MR এবং MC রেখা MR রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে। কেবলমাত্র এ উৎপাদন স্তরেই মুনাফার পরিমাণ সর্বোচ্চ হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ভারসাম্য উৎপাদন স্তরে - (i) MC=MR হবে এবং (ii) MC রেখা MR রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করবে। উপরোক্ত শর্তদ্বয় সকল ধরনের বাজারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

অনুশীলনী ১০.৩

১। MC=MR হলেই ভারসাম্য উৎপাদনস্তর নির্ধারিত হয় না চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করুন।

২। মুনাফা সর্বোচ্চকরণের শর্তাবলী উল্লেখ করুন। চিত্রের সাহায্যে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনকারী উৎপাদনস্তর নির্দেশ করুন।

পাঠ ৪ : পূর্ণপ্রতিযোগিতামুলক বাজার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ বলতে পারবেন।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের ভারসাম্য অর্জন প্রক্রিয়া অর্জন বর্ণনা করতে পারবেন।

আমরা বাজার সম্পর্কে বিষদ আলোচনা করেছি। বিক্রয়লব্ধ অর্থ সম্পর্কীয় বিভিন্ন ধারণাসমূহ আলোচনা করেছি এবং পরবর্তীতে ভারসাম্য শর্তাবলী উল্লেখ করেছি। আমরা জানি বাজারের ধরন ভেদে এই শর্তাবলীর তারতম্য হয় না। আমরা এ পাঠে পূর্ণপ্রতিযোগিতা মূলক বাজারের ভারসাম্য আলোচনা করব। অবশ্য এর আগে এ বাজারের সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করব।

পূর্ণপ্রতিযোগিতা মূলক বাজার

যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি সমজাতীয় দ্রব্য দর কষাকষির মাধ্যমে একটি নিদিষ্ট দামে ক্রয়-বিক্রয় করে তাকে পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। পূর্ণপ্রতিযোগিতা মূলক বাজারের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান:

১. **বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা :** পূর্ণপ্রতিযোগিতা মূলক বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে। ফলে কোন ক্রেতা বা বিক্রেতা একক ভাবে দামের উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। তাই একটি নির্দিষ্ট দামেই দ্রব্যটি বিক্রি হয়।

২. **সমজাতীয় দ্রব্য :** বিভিন্ন ফার্ম কর্তৃক বিক্রীত দ্রব্য সমজাতীয় বা পূর্ণ বিকল্প, তাই দ্রব্যটি কার নিকট বিক্রি করা হচ্ছে বা কার নিকট থেকে ক্রয় করা হচ্ছে তা ক্রেতা বা বিক্রেতা কারোর নিকটই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

৩. **বাজার সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান :** এ বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ বাজারে প্রচলিত দাম, পরিমাণ ও অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকে এবং সে অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

৪. **অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থানের অধিকার :** সংশ্লিষ্ট শিল্পে নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে পারে। আবার পুরাতন কোন ফার্ম বাজার থেকে প্রস্থানও করতে পারে।

৫. **উপকরণসমূহের পূর্ণগতিশীলতা :** এরূপ বাজারে উৎপাদনের উপকরণ সমূহ সম্পূর্ণ গতিশীল। উপকরণসমূহের পেশাগত বা শিল্পগত গতিশীলতার পথে কোন বাধা থাকে না।

৬. ক্রেতা ও বিক্রেতা যৌক্তিক আচরণ করে।

৭. বাজারের উপর সরকারের কোন হস্তক্ষেপ নেই।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শিল্পের অন্তর্গত কোন ফার্ম এককভাবে দামের উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। বাজার চাহিদা ও যোগানের সমতার মাধ্যমে নির্ধারিত দামেই ফার্ম তার উৎপাদিত দ্রব্যের সবটুকু বিক্রি করতে পারে। এ বাজারে প্রত্যেক ফার্মই দাম গ্রহীতা হিসেবে বিবেচ্য। বিক্রয়ের পরিমাণ যাই হউক না কেন দ্রব্যের দাম তথা গড় আয় একই থাকে। এজন্য প্রান্তিক আয়ও সর্বদা স্থির থাকে এবং তা গড় আয়ের সমান হয়। ফার্মের চাহিদা রেখা বা গড় আয় রেখা (AR) ভূমি অক্ষের সমান্তরাল। প্রান্তিক আয় রেখা (MR) গড় আয় রেখায় মিশে যায়। চিত্রে ১০.৫-এ তা দেখান হলো। যথা: AR=MR=P। চাহিদা এবং যোগানের মাধ্যমে নির্ধারিত। এই OP দামেই ফার্ম উৎপাদন কর্ম পরিচালনা করে।

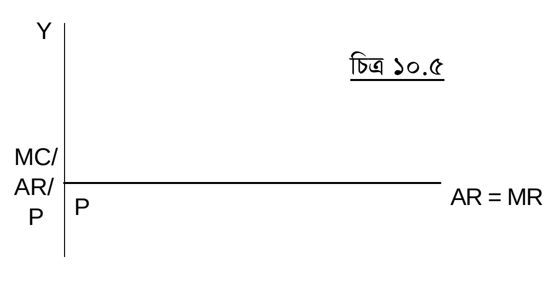

চিত্র ১০.৫

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের ভারসাম্য (Equilibrium of a firm under perfect competition) : অন্যান্য বাজারের মত পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারেও ফার্মের (উৎপাদকের) উদ্দেশ্য সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা অর্জন করা অর্থাৎ ভারসাম্যে পৌঁছা। এ ভারসাম্য দু'ধরনের : স্বল্পকালীন ভারসাম্য ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য। আমরা এ পর্যায়ে মূলতঃ স্বল্পকালীন ভারসাম্য নিয়েই আলোচনা করব। স্বল্পকালীন সময়ে কেবলমাত্র পরিবর্তনীয় উপকরণসমূহ (যেমন- শ্রম, কাঁচামাল) পরিবর্তন করেই উৎপাদন বাড়ানো বা কমানো হয়। এ সময়ে স্থির উপকরণসমূহ (যন্ত্রপাতি, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও আয়তন) অপরিবর্তনীয়। পক্ষান্তরে দীর্ঘকালীন সময়ে সকল উপকরণই পরিবর্তনীয়। স্বল্পকালীন সময়ে ব্যাবসায় নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে পারে না এবং কোন ফার্ম ব্যবসা ছেড়ে চলে যেতে পারে না। দীর্ঘকালে ফার্ম ব্যবসায় প্রবেশ করতে পারে এবং কেহ ইচ্ছা করলে ব্যবসা ছেড়ে চলে যেতে পারে।

পূর্ণপ্রতিযোগিতমূলক বাজারে ভারসাম্য অর্জনের জন্য ফার্মকে উৎপাদনের পরিমাণ এমন স্তরে স্থির করতে হবে যেখানে নিম্নোক্ত শর্তদ্বয় যুগপৎ পূরণ হয়; (১) MC=MR (=AR=P), অর্থাৎ দাম ও প্রান্তিক আয় প্রান্তিক খরচের সমান হয়। (২) MC রেখা MR রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করবে। অর্থাৎ MR রেখার ঢাল MC রেখার ঢালের চেয়ে কম হয়।

এ বাজারে যেহেতু ফার্মের MR রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল, সেহেতু যে উৎপাদন স্তরে প্রথম শর্তটি পূরণ হয় সে উৎপাদন স্তরে MC রেখার ঢাল ধণাত্মক হবে (তবে MC রেখা U-আকৃতির বিবেচনায়)।

স্বল্পকালীন সময়ে একটি ফার্মের ভারসাম্য উৎপাদন স্তর কিভাবে নির্ধারিত হয় তা চিত্র ১০.৬ দেখান হলো। গড় খরচ রেখা (SAC) ও প্রান্তিক খরচ রেখা (SMC) উভয়েই U-আকৃতির।

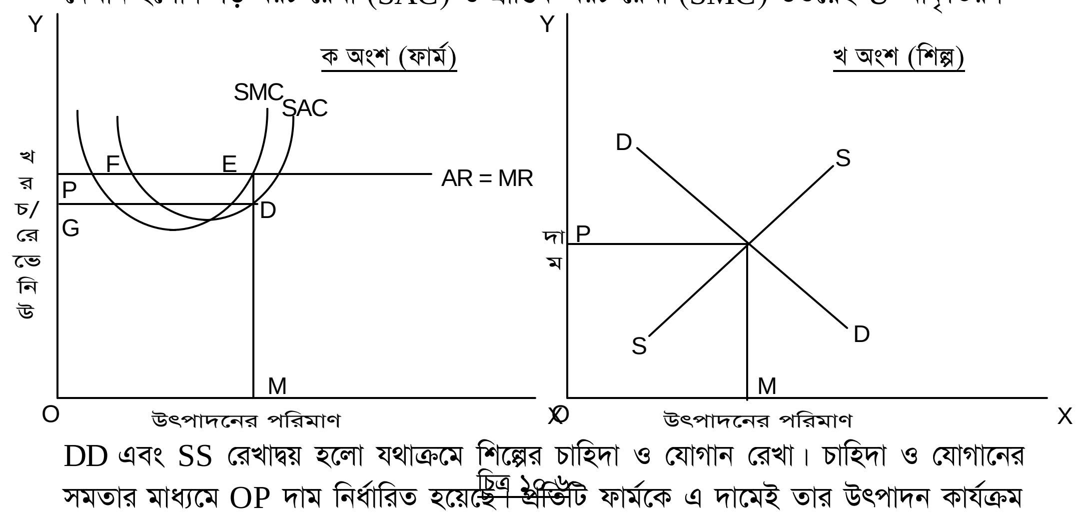

চিত্র ১০.৬

DD এবং SS রেখাদ্বয় হলো যথাক্রমে শিল্পের চাহিদা ও যোগান রেখা। চাহিদা ও যোগানের সমতার মাধ্যমে OP দাম নির্ধারিত হয়েছে। প্রতিটি ফার্মকে এ দামেই তার উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। ফলে ফার্মের গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা হলো AR = MR = P যা

ভূমি অক্ষের সমান্তরাল। চিত্রে (ক-অংশে) দেখা যাচ্ছে MC রেখা MR রেখাকে E এবং F বিন্দুতে ছেদ করেছে।

F ভারসাম্য বিন্দু নয়। কেননা এখানে প্রায় শর্ত পূরণ হলেও দ্বিতীয় শর্ত পূরণ হচ্ছে না। E বিন্দুটি হচ্ছে ভারসাম্য বিন্দু। কেননা এখানে দুটো শর্তই পূরণ হচ্ছে। এমতাবস্থায় ফার্মের ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ হলো OM। OM উৎপাদন স্তরে গড় আয় হলো ME(=OP), গড় খরচ হলো MD(=OG)। এক্ষেত্রে একক প্রতি মুনাফার পরিমাণ DE(=GP) এবং মোট মুনাফার পরিমাণ DEPG ক্ষেত্রের সমান। এমতাবস্থায় শিল্পের অন্তর্গত প্রতিটি ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে (অনুরূপ খরচ সম্পন্ন)। এখানে উল্লেখ্য যে, এটা ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য অবস্থা, দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থা নয়। কেননা দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পে নুতন ফার্ম প্রবেশের সঙ্গে এ অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন সম্ভব নয়।

কাম্য বা ভারসাম্য উৎপাদনস্তরে অবস্থাভেদে স্বল্পকালীন সময়ে ফার্মের মুনাফা সর্বোচ্চ বা লোকসান সর্বনিম্নও হতে পারে। ভিন্নভাবে বলা যায় স্বল্পকালীন সময়ে ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা, স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে পারে, এমনকি লোকসানও দিতে পারে। চিত্র ১০.৭-এ ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা অর্জনকারী ভারসাম্য অবস্থা দেখান হলো :

চিত্র ১০.৭

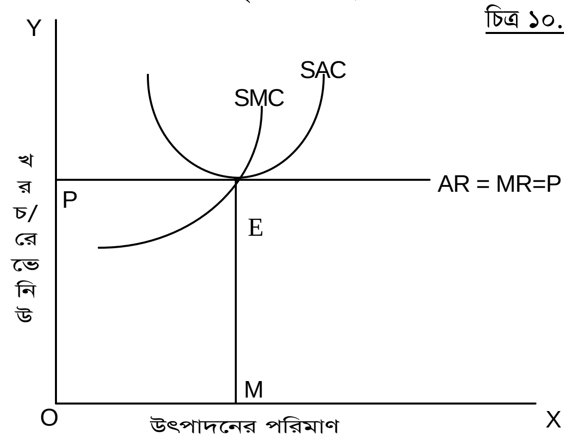

চিত্র ১০.৭-এ ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ OM। এখানে AR রেখা এবং SAC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে পরস্পরের স্পর্শ করেছে। এই উৎপাদন স্তরে গড় আয় = গড় খরচ = ME এবং ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে।

চিত্র ১০.৮

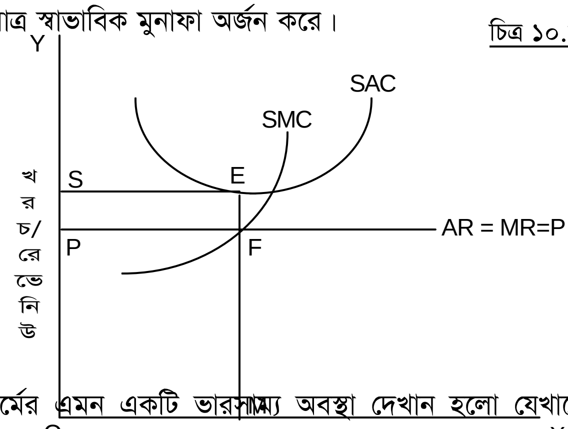

চিত্র ১০.৮-এ ফার্মের এমন একটি ভারসাম্য অবস্থা দেখান হলো যেখানে ফার্মের লোকসান হচ্ছে। চিত্রে OM হলো ভারসাম্য উৎপাদন স্তর। এ উৎপাদন স্তরে ফার্ম EFSP পরিমাণ লোকসান দিচ্ছে। কেননা, এ উৎপাদন স্তরে গড় খরচ গড় আয়ের চেয়ে বেশি। প্রকৃতপক্ষে OM হলো লোকসান সর্বনিম্নকারী উৎপাদন স্তর। কেননা উৎপাদন OM এর চেয়ে বেশি বা কম হলে লোকসানের পরিমাণ আরও বেশি হবে। এটি ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য অবস্থা,

দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থা নয়। কেননা স্বল্পকালে এ অবস্থায় কোন ফার্ম ব্যবসায় থেকে চলে যেতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ফার্ম স্বল্পকালীন সময়ে লোকসান দিয়ে কেন উৎপাদন চালিয়ে যাবে। আমরা জানি, স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদককে স্থির খরচ বহন করতে হয় উৎপাদন করুক আর না-ই করুক। যদি উৎপাদন বন্ধ রাখে তবে কেবল মাত্র পরিবর্তনীয় খরচের হাত থেকে রেহাই পাবে, কিন্তু স্থির খরচ বহন করতেই হয়, তাই উৎপাদন বন্ধ রাখলে লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট স্থির খরচের সমান। যদি উৎপাদন চালু রাখলে লোকসান এর চেয়ে কম হয়, তবে উৎপাদন চালু রাখা বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে উৎপাদন চালু রাখার ফলে যদি লোকসান মোট স্থির খরচের চেয়ে বেশি হয় তবে উৎপাদন বন্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত। যতক্ষণ দাম, গড়পরিবর্তনীয় খরচ অপেক্ষা বেশি ততক্ষণ লোকসান হলেও উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া উচিৎ, কেননা এক্ষেত্রে লোকসানের পরিমাণ মোট স্থির খরচের চেয়ে কম হয়। অন্যদিকে যখন দাম, গড় পরিবর্তনীয় খরচের চেয়ে কম হয় তখন উৎপাদন করলে লোকসান হবে মোট স্থির খরচসহ পরিবর্তনীয় খরচের একাংশ। এ পর্যায়ে উৎপাদন চালু রাখা অযৌক্তিক। আর যখন দাম ও গড় পরিবর্তনীয় খরচ পরস্পর সমান হয়, তখন উৎপাদন চালু রাখা না রাখা লাভ লোকসানের দিক থেকে সমার্থক হবে। কেননা মোট লোকসান মোট স্থির খরচের সমান। যে উৎপাদন স্তরে দাম, সর্বনিম্ন গড় পরিবর্তনীয় খরচ ও প্রান্তিক খরচ পরস্পর সমান তা হলো উৎপাদন স্থগিত বিন্দু (Shut down point) এবং এ স্তরে লোকসান মোট স্থির খরচের সমান। উপরোক্ত বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়, তবে এ পর্যায়ের পাঠকের জন্য তা একটু কঠিন বলে তা করা হলো না।

এতদালোচনার পর এটা পরিষ্কার যে স্বল্পকালে একটি ফার্ম স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মুনাফা দু-ই অর্জন করতে পারে এমনকি লোকসান দিয়েও ব্যবসা চালিয়ে যায় (যদি সে লোকসান মোট স্থির খরচের চেয়ে কম হয়)। এখানে উল্লেখ্য যে, দীর্ঘকালে প্রতিটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফাই অর্জন করে। এ সময়ে অস্বাভাবিক মুনাফা বা লোকসানের কোন অবকাশ নেই। কেননা দীর্ঘকালে শিল্পে নতুন ফার্মের প্রবেশাধিকার বা শিল্প থেকে কোন ফার্মের চলে যাওয়ার অধিকার দুই রয়েছে। বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়, তবে তা উচ্চতর পর্যায়ে জানা যাবে।

অনুশীলনী ১০.৪

১. পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার বলতে কি বুঝ? এ বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।

২. পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য উৎপাদন স্তর নির্ধারণ প্রক্রিয়াটি চিত্রসহকারে ব্যাখ্যা করুন।

৩. পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম স্বল্পকালে স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে পারে এমন কি লোকসান দিয়েও ব্যবসা চালায়- ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৫ ঃ একচেটিয়া বাজার

আমরা এ পাঠে একচেটিয়া বাজারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য বর্ণনা করব।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- একচেটিয়া বাজারে ফার্মের ভারসাম্যার্জন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

একচেটিয়া বাজার: যে বাজারে একজন মাত্র উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা একটি দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে এবং দ্রব্যটির নিকটতম কোন বিকল্প নেই, সে বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলে। এ বাজারে দ্রব্যের সমগ্র যোগান একটি প্রতিষ্ঠান দেয় বলে দ্রব্যটির দামের উপর তার আধিপত্য বিদ্যমান। বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন, রেলওয়ে ইত্যাদি এ বাজারের অন্তর্ভুক্ত।

একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

১. একজন বিক্রেতা : এ বাজারে একজন মাত্র উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা থাকে যদিও দ্রব্যটির ক্রেতা অসংখ্য। দ্রব্যের যোগান ও দামের উপর তার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। দ্রব্যটির চাহিদা রেখা ডান দিকে নিম্নগামী এবং সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক আয় রেখাটি তার নিচে অবস্থান করে।

২. নিকটতম বিকল্প নেই : একচেটিয়া কারবারীর উৎপাদিত দ্রব্যটির কোন নিকটতম বিকল্প নেই।

৩. প্রবেশাধিকার নেই : একচেটিয়া বাজারে নতুন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্ম প্রবেশ করতে পারে না।

একচেটিয়া বাজারের ক্ষেত্রে শিল্পে একটি মাত্র ফার্ম থাকে। স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পে ফার্মের সংখ্যা ঐ একটিই। তবে দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদক প্লান্টের আকার পরিবর্তন করতে পারে।

একচেটিয়া বাজারে ফার্মের ভারসাম্য (Equilibrium of a firm under Monopoly):

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মত একচেটিয়া বাজারেও ফার্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা অর্জন করা বা ভারসাম্যে পৌঁছা। অর্থাৎ উৎপাদন স্তর এমন পর্যায়ে স্থির করা যেখানে মুনাফা সর্বোচ্চ হয়। এ বাজারেও দু'ধরনের ভারসাম্য বিদ্যমান স্বল্পকালীণ ভারসাম্য ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য। আমরা আমাদের আলোচনা মূলত স্বল্পকালীন ভারসাম্য অর্জনের মধ্যে সীমিত রাখব।

একচেটিয়া বাজারে ভারসাম্য অর্জনের জন্য উৎপাদককে উৎপাদনের পরিমাণ এমনস্তরে স্থির করতে হবে যেখানে নিম্নোক্ত শর্তদ্বয় যুগপৎ পূরণ হয়।

১) MC=MR, অর্থাৎ প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান।

২) MC রেখা MR রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করবে। অর্থাৎ MC রেখার ঢাল MR রেখার ঢালের চেয়ে বেশি।

একচেটিয়া বাজারে ফার্মের গড় আয় রেখা (চাহিদা রেখা) ও প্রান্তিক আয় রেখা ডানদিকে নিম্নগামী এবং প্রান্তিক আয় রেখা গড় আয় রেখার নিচে অবস্থান করে। যে উৎপাদন স্তরে প্রথম

শর্তটি পূরণ হয়, সে উৎপাদন স্তরে MC রেখার ঢাল ধনাত্মক (U আকৃতির MC রেখা বিবেচনা করে)।

চিত্র ১০.৯ এ একচেটিয়া বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য দেখানো হলো।

চিত্র ১০.৯

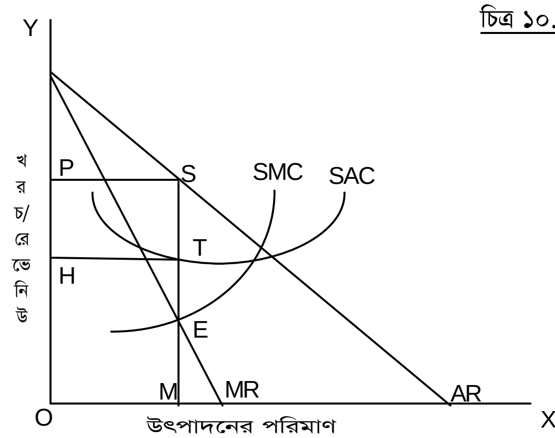

চিত্রে SAC এবং SMC যথাক্রমে উৎপাদকের গড় ও প্রান্তিক খরচ রেখা। AR এবং MR হলো গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা। SMC রেখা MR রেখাকে E বিন্দুতে নিচের দিক থেকে ছেদ করেছে। সুতরাং E হলো ভারসাম্য বিন্দু যেথায় ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে OM । OM উৎপাদন স্তরে প্রান্তিক খরচ=প্রান্তিক আয় = ME, ভারসাম্য উৎপাদন স্তরে দাম হচ্ছে OP(=MS) এবং গড় খরচ হচ্ছে OH(=MT)। ফলে একক প্রতি মুনাফার পরিমাণ PH(=ST) এবং মোট মুনাফার পরিমাণ PSTH। এক্ষেত্রে ফার্মটি অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করছে। উল্লেখ্য যে, পূর্ণপ্রতিযোগিতার বাজারে P=MR=MC ; কিন্তু একচেটিয়া বাজারে MC=MR<P।

একচেটিয়া কারবারী স্বল্পকালীন সময়ে সর্বদা অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে এমন নয়, সে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে পারে বা লোকসান দিয়ে এ ব্যবসা চালাতে পারে। লোকসানের পরিমাণ মোট স্থির খরচের চেয়ে কম হলে স্বল্পকালীন সময়ে ফার্ম উৎপাদন চালিয়ে যাবে। তবে লোকসান মোট স্থির খরচের বেশি হলে উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। এক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর সিদ্ধান্ত প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মতই। তবে একচেটিয়া ফার্ম ইচ্ছা করলে বিজ্ঞাপন বা অন্য কোন উপায়ে চাহিদা রেখাকে ডানদিকে সরানোর ব্যবস্থা করে লোকসানের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করতে পারে বা লোকসানের বোঝা কমাতে পারে।

চিত্র ১০.১০ এ ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা অর্জনকারী স্বল্পকালীন ভারসাম্য দেখানো হলো।

চিত্র ১০.১০

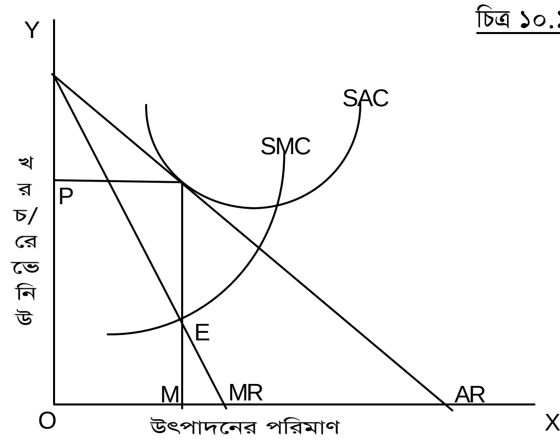

চিত্রে OM হলো ভারসাম্য উৎপাদন স্তর-এ উৎপাদন স্তরে দাম OP যা গড় খরচের সমান। তাই একচেটিয়া কারবারী কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করছে।

চিত্র ১০.১১ এ একচেটিয়া কারবারীর লোকসান অবস্থায় স্বল্পকালীন ভারসাম্য দেখান হলো। চিত্রে ভারসাম্যে উৎপাদন স্তর OM । এ উৎপাদন স্তরে দাম (=OP) গড় খরচের (OT) এর চেয়ে কম। ফলে ফার্মটি একক প্রতি PT পরিমাণ এবং সর্বমোট PSHT পরিমাণ লোকসান দিয়ে উৎপাদন করছে।

চিত্র ১০.১১

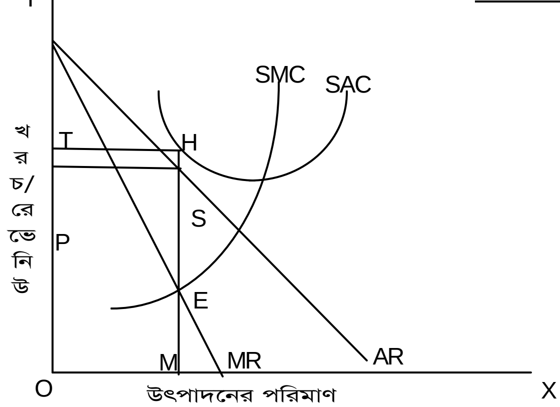

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা গেল একচেটিয়া কারবারী স্বল্পকালীন সময়ে স্বাভাবিক মুনাফা এবং অস্বাভাবিক মুনাফা দু-ই অর্জন করতে পারে। এমন কি লোকসান দিয়েও উৎপাদন করবে যদি লোকসান মোট স্থির খরচের চেয়ে কম হয়। একচেটিয়া বাজারে ফার্ম দীর্ঘকালীন সময়েও অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে পারে। এ সময়ে ফার্ম কমপক্ষে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে পারে। দীর্ঘকালীন ভারসাম্য এ পর্যায়ে আলোচিত হবে না।

অনুশীলনী ১০.৫

১. একচেটিয়া বাজার কি? একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।

২. একচেটিয়া বাজারে ফার্মের ভারসাম্যার্জন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

পাঠ ৬ ঃ একচেটিয়া বাজারে ফার্মের ভারসাম্য

ভূমিকা

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে আমরা বাজারের সংখ্যা, বাজারের প্রকরণ এবং রেভেনিউ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণা আলোচনা করে পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া বাজারে কিভাবে ভারসাম্য অর্জিত হয় তা আলোচনা করেছি। পরিশেষে এ পাঠে পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া বাজারের একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামুলক আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া বাজারের মধ্যে তফাৎ বর্ণনা করতে পারবেন।

পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া বাজারের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Perfect Competition and Monopoly Market): পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া বাজার দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী বাজার ব্যবস্থা। এ দু'য়ের মধ্যে যেসব পার্থক্য রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার	একচেটিয়া বাজার
১. পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য।	১. একচেটিয়া বাজারে ক্রেতা অনেক হলেও বিক্রেতা মাত্র একজন।
২. এ বাজারে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য সমজাতীয়।	২. এ বাজারে যে দ্রব্য বিক্রি হয় তার কোন নিকটতম বিকল্প নেই।
৩. এ বাজারে যে কোন ফার্ম অবাধে প্রবেশ করতে পারে এবং এ বাজার থেকে যে কোন ফার্ম চলে যেতে পারে।	৩. এ বাজারে নতুন কোন ফার্ম প্রবেশ করতে পারে না।
৪. এ বাজারে ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউ-ই দ্রব্যের দামের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বাজারে চাহিদা ও যোগানের সমতার মাধ্যমে নির্ধারিত দামে দ্রব্য বিক্রি হয়। এ দামে ক্রেতা বিক্রেতা যে কোন পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করতে পারে।	৪. এ বাজারে বিক্রেতা দ্রব্যের যোগান সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে বলে দামের উপর সে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এ বাজারে বিক্রির পরিমাণ বাড়াতে হলে দাম কমাতে হয়।
৫. এ বাজারে দ্রব্যের একটি মাত্র দাম বজায় থাকে।	৫. এ বাজারে বৈষম্যমূলক দাম আদায় করতে পারে।
৬. পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম বা গড় আয় স্থির। এজন্যে প্রান্তিক আয়ও স্থির এবং তা দাম বা গড় আয়ের সমান। তাই গড় আয় রেখা (AR) বা চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল এবং প্রান্তিক আয় রেখা (MR) গড় আয় রেখার সাথে মিশে যায়।	৬. এ বাজারে যেহেতু বিক্রির পরিমাণ বাড়ানোর জন্য দাম কমাতে হয়, সেহেতু বিক্রি বাড়ার সাথে সাথে গড় ও প্রান্তিক আয় ততই কমতে থাকে। তবে প্রান্তিক আয় অধিক হারে কমতে থাকে। অর্থাৎ প্রান্তিক আয় গড় আয় অপেক্ষা কম হয়। ফলে গড় আয় রেখা AR ও প্রান্তিক আয় রেখা MR উভয়েই ডানদিকে নিম্নগামী এবং প্রান্তিক আয় রেখা গড় আয় রেখার নিচে অবস্থান করে।

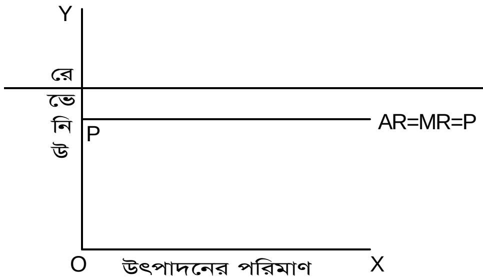

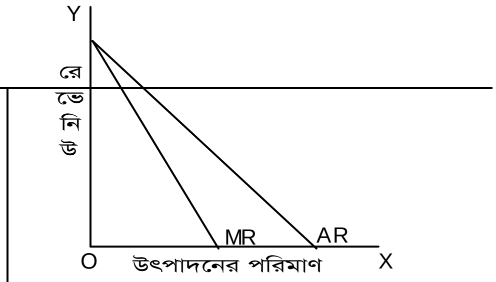

৭. এ বাজারে ভারসাম্য শর্ত : MC=MR=AR=P এবং দীর্ঘকালে তা গড় খরচের সমান হয়। অর্থাৎ MC=MR=AR=P=AC.	৭. এ বাজারে ভারসাম্য শর্ত MC=MR। তবে কোন অবস্থাতেই এ বাজারে প্রান্তিক আয়/গড় আয়ের সমান হয় না।
৮. এ বাজারে ফার্ম স্বল্পকালে স্বাভাবিক মুনাফা (MC= MR=AR=AC) এবং অস্বাভাবিক মুনাফা (MC=MR=AR>AC) অর্জন করতে পারে। এমন কি লোকসানও দিতে পারে (MC=MR=AR<AC)। কিন্তু দীর্ঘকালে কেবল মাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। অস্বাভাবিক মুনাফা/লোকসানের অবকাশ দীর্ঘকালে নেই।	৮. একচেটিয়া কারবারী স্বল্পকালে স্বাভাবিক মুনাফা (MC=MR<AR=AC) এবং অস্বাভাবিক মুনাফা (MC=MR<AR>AC) অর্জন করতে পারে। এমন কি লোকসানও দিতে পারে (MC=MR<AR<AC)। কিন্তু দীর্ঘকালে ফার্ম কমপক্ষে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। অর্থাৎ দীর্ঘকালে লোকসান না দিলেও অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে পারে।
৯. এ বাজারে দ্রব্যের দাম কম এবং বিক্রির পরিমাণ বেশি।	৯. একচেটিয়া বাজারে দ্রব্যের দাম বেশি এবং বিক্রির পরিমাণ কম।
১০. এ বাজারে জনকল্যাণ সাধিত হয়।	১০. এ বাজারে জনকল্যাণ ব্যহত হয়।
১১. বাস্তবে এ জাতীয় বাজার তেমন একটা দেখা যায় না।	১১. বাস্তবে এ বাজারের অস্তিত্ব বিদ্যমান।

অনুশীলনী ১০.৬

১. একচেটিয়া বাজার বলতে কি বুঝেন? এ বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।

২. একচেটিয়া বাজারে কিভাবে দ্রব্যের দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয় চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করুন।

৩. একচেটিয়া বাজার ও পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারের মধ্যে পার্থক্যসমূহ তুলে ধরুন।

খাজনা

ইউনিট ১১

fwgKv

বাংলায় ‘খাজনা’ শব্দের অর্থ নিয়ে অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কারণ ‘খাজনা’ ও ‘কর/রাজস্ব’ এ দু’টি বিষয়কে অনেকে সমার্থক বলে ভুল করেন। যেমন – কেউ কেউ ‘খাজনা’ শব্দ দ্বারা কখনও ‘ভাড়া’ আবার কখনও ‘কর’ (রাজস্ব) বুঝেন। জমির উপর কর বসানো হলে, অনেকে সেই করকে খাজনা বলে ভুল করেন। বাস্তবে ‘সরকার কর্তৃক জমির উপর কর আরোপ’ এবং ‘জমির মালিকের দ্বারা জমিকে ভাড়ায় খাটানো’, এ দু’টি বিষয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কিন্তু অনেকেই খাজনা ও কর (রাজস্ব বা রেভিনিউ) বিষয় দুটি গুলিয়ে ফেলেন। কাজেই খাজনা শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। (খাজনা সম্পর্কিত ধারণা আলোচিত হয়েছে পাঠ – ১, ২, ও ৩ এ)।

খাজনা সম্পর্কিত ধারণার পশ্চাতে ভূমিবাদি চিন্তাবিদ ও ক্লাসিক্যাল (সনাতনী/ধ্রুপদি) অর্থনীতিবিদদের অবদান প্রথমে স্বীকার করতে হয়। তাঁরা খাজনাকে ভূমির সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো তাঁর The Principles of Political Economy and Taxation (1817) গ্রন্থে খাজনা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন [রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব সম্পর্কে আলেচিত হয়েছে পাঠ - ৫ এ]। তবে তাঁর ব্যাখ্যায় খাজনাকে কেবল জমির সাথে সম্পর্কিত দেখানো হয়। পরবর্তীকালে প্রফেসর মার্শাল খাজনা সম্পর্কিত ধারণাকে প্রসারিত করে জমি ছাড়াও অন্যান্য উপকরণের সাথে সম্পৃক্ত করেন। [এ প্রসঙ্গে নিম খাজনা শিরোনামে আলোচিত হয়েছে পাঠ-৪তে]।

১. **ভূমিবাদী চিন্তাবিদ বলতে কোন ধরণের চিন্তাবিদকে বুঝানো হয়?**
যেসব চিন্তাবিদ মনে করতেন, সমস্ত সম্পদের উৎস হলো ভূমি তথা কৃষি, তাঁদেরকে ভূমিবাদী বা ফিজিওক্র্যাট বলা হয়। তাঁদের মতে ভূমির মালিকানা যত প্রসারিত হবে, ততই ব্যক্তি বা রাষ্ট্র অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হবে। ফ্রান্সে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৭৬০-১৭৮০) ভূমিবাদ বিকাশ লাভ করে। কুঁইজনে (বা উচ্চারণভেদে কিঁনে) [১৬৯৪-১৭৭৪] ফিজিওক্র্যাটিক (ভূমিবাদী) স্কুলের (চিন্তাধারার) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের একজন চিকিৎসক ও অর্থনীতিবিদ।

২. **ক্লাসিক্যাল (সনাতনী/ধ্রুপদী) অর্থনীতিবিদ বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়?**
ব্যক্তিবাদ অর্থাৎ অর্থনৈতিক কাজকর্মে ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং সরকারী হস্তক্ষেপ নিম্নতম পর্যায়ে রেখে বাজার কার্যক্রমের মাধ্যমে যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপকারী অর্থনীতিবিদদের ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ বলা হয়। এডাম স্মিথ ও তাঁর অনুসারী ডেভিড রিকার্ডো, জেমস স্টুয়ার্ট মিল ছিলেন ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অন্যতম।

৩. **ডেভিড রিকার্ডোর পরিচয় কি?**

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মধ্যে এডাম স্মিথের পরেই যাঁর স্থান, তিনি হলেন ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩)। তিনি ইংল্যান্ডের একটি সুদ-কারবারী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তেমন লাভ করতে না পারলেও তাঁর ছিল শাণিত বুদ্ধিদীপ্তি ও জ্ঞানের গভীরতা। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "The principles of Political Economy and Taxation" ১৮১৫ সনে প্রকাশ পায়। রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব সম্পর্কে জানা যায় সেই গ্রন্থ থেকে।

৪. **মার্শালের পরিচয় কি?**

আলফ্রেড মার্শাল (১৮৪২-১৯২৪) লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক অর্থনীতি (পলিটিক্যাল ইকনমি) এর অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হলো : Principles of Economics (১৮৯০)।

পাঠ ১ : খাজনার সংজ্ঞা, খাজনা কেন দেওয়া হয়?

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- খাজনা কি, তা বলতে পারবেন।
- সাধারণ অর্থে খাজনার সাথে অর্থনৈতিক খাজনার পার্থক্য কিরূপ, বলতে পারবেন।
- খাজনা প্রদানের কারণগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

১১.১.১ খাজনার সংজ্ঞা

খাজনার সংজ্ঞাকে তিনটি আঙ্গিকে বিবেচনা করা হলো :

ক. সাধারণ অর্থে খাজনা বলতে কোন বাড়ী, জমি, দোকান, গাড়ী এসব নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবহার বাবদ চুক্তিভিত্তিক অর্থ প্রদান বুঝানো হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে খাজনা শব্দের ব্যবহার ভিন্ন রকম। অর্থনীতিতে খাজনা বলতে 'অর্থনৈতিক খাজনা' বুঝানো হয়। বিশুদ্ধ খাজনা বা অর্থনৈতিক খাজনা হলো একটি উৎপাদনশীল উপকরণের জন্য প্রদত্ত দাম, যেখানে সেই উপকরণের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক।

উপকরণের সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক যোগান কথাটির অর্থ কি?

উপকরণের দাম বা উপকরণের প্রয়োজন (চাহিদা) এর পরিবর্তন ঘটলেও যে উপকরণের পরিমাণের কোন পরিবর্তন সম্ভব হয় না, সেই উপকরণের যোগানকে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বলা হয়। জমির মোট যোগান কোন রকমেই যদি বাড়ানো সম্ভব না হয়, তবে জমির যোগানকে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (বা শূন্য স্থিতিস্থাপক) বলা হবে। জমির সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপকতা বা চাহিদার তুলনায় জমির যোগানের স্বল্পতার কারণেই মূলতঃ ডেভিড রিকার্ডো খাজনাকে জমির সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

খ. খাজনাকে অনেক সময় উদ্বৃত্ত হিসাবে গণ্য করা হয়। তাই খাজনার সংজ্ঞা এভাবেও দেয়া যায় : উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়ুক্ত কোন উপাদানের ন্যূনতম যোগান দাম (Minimum supply price) অপেক্ষা উপাদানের মালিক অতিরিক্ত আয় পেলে সেই অতিরিক্ত উপার্জিত অর্থকে খাজনা বলে।

কেন জমি থেকে প্রাপ্ত আয়ের সবটাই অর্থনৈতিক খাজনা হিসাবে বিবেচ্য?

যদি অর্থনৈতিক শক্তির উপর কোন উপাদানের যোগান নির্ভর না করে, অথচ সেই উপাদান বাবদ অর্থ উপাদানের মালিক পায়, তবে সেই প্রাপ্তিকে বাড়তি প্রাপ্তি বা উদ্বৃত্ত বলা হয়। এরূপ উদ্বৃত্ত অর্থ উপকরণের মালিক যা পায়, তাকে অর্থনৈতিক খাজনা হিসাবে নির্দেশ করা হয়। সমাজের দিক থেকে জমির আয়ের সবটাই খাজনা। সামগ্রিক দিক থেকে, জমির যোগান-দাম শূন্য। কারণ দাম যাই হউক না কেন, সমাজের নিকট জমির যোগান কম-বেশি হয় না। সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে জমি থেকে প্রাপ্ত আয়ের সবটা হলো উদ্বৃত্ত। আর উদ্বৃত্ত যেহেতু খাজনা, তাই জমি থেকে প্রাপ্ত আয় সবটাই অর্থনৈতিক খাজনা।

গ. খাজনা হলো উপাদানের প্রাপ্তব্য আয় বা উপার্জন, যা সুযোগ ব্যয়ের অতিরিক্ত হিসাবে পাওয়া যায় এবং যার উৎপত্তি ঘটে উপাদানের সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপকতার অভাবে। উপকরণের স্থানান্তর ব্যয়কে সুযোগ ব্যয় বলা হয়, অর্থাৎ জমিকে বর্তমান প্রয়োগ ক্ষেত্রে রাখার জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে, তাই হলো সুযোগ ব্যয়। এ প্রেক্ষিতে বিকল্প সর্বোত্তম ব্যবহার থেকে যে আয় হত তার চাইতে বাড়তি আয় যা জমি থেকে পাওয়া যায়, তাকে অর্থনৈতিক খাজনা বলা যায়।

খাজনা হলো উপাদানের প্রাপ্তব্য আয় বা উপার্জন, যা সুযোগ ব্যয়ের অতিরিক্ত - কিভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়?

ধরা যাক্, এক একর জমির মূল্য আট লক্ষ টাকা, যখন সেই জমি কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়। এখন সেখানে এপার্টমেন্ট তৈরির অনুমতি দেওয়া হল। সেই জমির মূল্য এখন একর প্রতি আঠার লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। জমিতে এপার্টমেন্ট তৈরি না করে জমির মালিক যদি বিকল্প হিসাবে কৃষিকাজে ব্যবহার করতো, তবে তার উপার্জন হত আট লক্ষ টাকা। সুতরাং সেই জমির তখন সুযোগ ব্যয় ছিল আট লক্ষ টাকা। কিন্তু এপার্টমেন্ট তৈরি করলে তার বাড়তি আয় আসবে দশ লক্ষ টাকা। এ অবস্থায় সেই বাড়তি প্রাপ্তি দশ লক্ষ টাকা হলো অর্থনৈতিক খাজনা।

১১.১.২ খাজনা কেন দেয়া হয়?

খাজনার কেন উৎপত্তি হয় বা কেন খাজনা দেয়া হয়, এ বিষয়টির উপর আলোকপাত প্রয়োজন। নিম্নে খাজনা প্রদানের (বা খাজনা উদ্ভবের) কারণ উল্লেখ করা হল।

১। খাজনার কেন উৎপত্তি হয় এ বিষয়ে প্রথমে বলা যায় যে, কোন উপাদানের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হলে খাজনা দেখা দিতে পারে। তবে যোগান অপেক্ষা চাহিদা কম থাকলে খাজনা দেখা দিবে না। কাজেই উপাদানের যোগান স্থির থাকার কারণে এবং একই সঙ্গে চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতা থাকার কারণে খাজনা দিতে হয়। চিত্রে বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক খাজনার নির্দেশ করা হয়। জমির যোগান রেখা যদি দামের সঙ্গে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে তা' উলম্ব হবে। চিত্রে SS রেখার দ্বারা তা' দেখানো হলো। উৎপাদনের পরিমাণ Q_1 হলে যে পরিমাণ বিক্রয়লব্ধ অর্থ (রেভিনিউ বা আয়) অর্জিত হয়, তার সবটাই বিশুদ্ধ খাজনা হিসাবে বিবেচিত হবে। চাহিদা রেখা D_0 হলে দাম হবে শূন্য (0)। তখন আয় বা অর্থনৈতিক খাজনাও শূন্য (০) হবে। এবারে চাহিদা রেখা D_1 হলে দাম হবে P_1, তখন আয় বা অর্থনৈতিক খাজনা হবে P_1eQ_1।

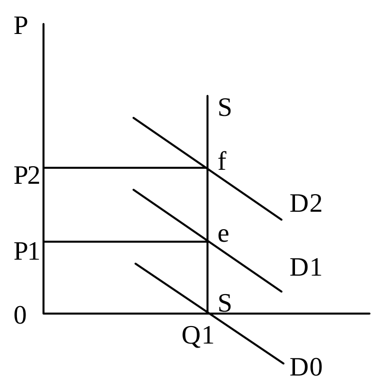

চাহিদা বৃদ্ধির কারণে অর্থনৈতিক খাজনা বাড়ে। যেমন, চাহিদা রেখা D_1 থেকে D_2 হলে দামও P_2 তে বাড়বে। তখন আয় বা অর্থনৈতিক খাজনাও বেড়ে হবে OP_2fQ_1। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জমি বা অপর কোন উপকরণের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হলে চাহিদা বৃদ্ধির কারণে অর্থনৈতিক খাজনা বাড়ে। যে উপকরণের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থঅপক, দামের দ্বারা সেই যোগান প্রভাবিত হয় না। তবে সেই উপকরণের দাম চাহিদার দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন – চাহিদার বৃদ্ধি ঘটলে অর্থাৎ চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হলে খাজনার পরিমাণ বেড়ে যায়।

২। রিকার্ডোর বক্তব্য অনুসারে জমির উর্বরতার মধ্যে পার্থক্য থাকে বলে খাজনা প্রদান করা হয়। নিকৃষ্ট জমি অপেক্ষা উর্বরতার দিক থেকে উৎকৃষ্ট জমি বাড়তি উপার্জন করতে পারে। তাই উৎকৃষ্ট জমি ব্যবহারকারীরা মালিকের নিকট খাজনা প্রদান করে।

৩। যদি সব জমি সমান উর্বর ও সমান সুবিধাজনক হয়ও তবুও খাজনার উৎপত্তি হতে পারে। কারণ মোট চাহিদার তুলনায় মোট জমির যোগান যদি কম থাকে, তবে জমি ব্যবহারকারীদেরকে খাজনা প্রদান করতে হয়। উপাদানের যোগান সম্পূর্ণ স্থির (সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক) না থাকলেও চাহিদর তুলনায় উপাদানের যোগান কম হলে খাজনার উদ্ভব হতে পারে।

৪। উপাদানের যোগান সীমিত অথচ উৎপাদনের জন্য তা' অত্যাবশ্যক, এমন হলে সেই উপকরণের জন্য খাজনা প্রদান করতে হয়। কোন কোন উপাদান এমনই যে, তাকে ছাড়া উৎপাদন করা সম্ভব নয়। যেমন – ফসল যদি পেতে হয়, তবে জমি লাগবেই। আর সেই জমির যোগান যেহেতু সীমিত, অথচ প্রয়োজন যেহেতু অত্যধিক, তাই জমির মালিককে জমি ব্যবহারের জন্য দাম বা খাজনা দিতে হয়।

৫। জমির অবস্থানগত ভিন্নতার কারণে কাম্য জমি ব্যবহারকারীদেরকে খাজনা দিতে হয়। যেমন জমি ব্যবহারকারীর কাছে শহর বা বাজারের নিকটবর্তী জমি দূরবর্তী জমির চেয়ে বেশি চাহিদা সম্পন্ন। যাতায়াত ও পরিবহন সুবিধাসহ জমির খাজনা দূরবর্তী বা তুলনামূলক অসুবিধাসম্পন্ন জমির খাজনার তুলনায় বেশি হয়।

৬। স্থানান্তর ব্যয় যা সুযোগ ব্যয়ের প্রেক্ষিতে খাজনা দিতে হয়। জমিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন – কৃষিকাজ, পশুচারণ, গৃহ নির্মাণ, শিল্প কাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি। জমির বিকল্প ব্যবহারের প্রেক্ষিতে সুযোগ ব্যয় নির্ধারিত হয়। ধরা যাক্ একখন্ড জমিতে যদি ধান চাষ করা হয়, তবে হয়ত অনুর্বরতার কারণে উৎপাদন ব্যয় উঠলেও উদ্বৃত্ত থাকল না। তখন সেই জমির মালিক যদি চিন্তা করে যে, পাট চাষ করে ধানের তুলনায় উদ্বৃত্ত অর্থ তার থাকবে, তবে পাট চাষে সে জমি ব্যবহার করবে। এমতাবস্থায় ধান চাষের পরিবর্তে পাট চাষ থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত অর্থ খাজনা হিসাবে বিবেচিত হবে।

৭। জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হয় বলে খাজনা প্রদান করতে হয়। একই জমিতে বাড়তি শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে প্রান্তিক উৎপাদন কমে। যখন শ্রম ও মূলধনের যৌথ একক নিয়োগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উৎপাদন এবং উপাদানের একক ভিত্তিক খরচ সমান হয়, তখন উৎপাদনকারী বাড়তি শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে না। প্রান্তিক উৎপাদনের তুলনায় যে সব এককের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎপাদন বা উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়, তা খাজনা হিসাবে বিবেচনাযোগ্য। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর না হলে একই জমিতে বাড়তি শ্রম ও মূলধন কাজে লাগিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ি যত খুশি উৎপাদন করা যেত। তখন খাজনা উদ্ভবের কোন সুযোগ থাকে না।

সারসংক্ষেপ

১. খাজনার সংজ্ঞা থেকে যে বিষয়গুলো উপলদ্ধি করা যায়, তাহলো –

ক. অর্থনৈতিক খাজনা বলতে উৎপাদনের সেই সব স্থির উপকরণ (যেমন – জমি) ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত অর্থকে বুঝানো হয়, যেসব উপকরণের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক।

খ. অর্থনৈতিক খাজনার ভিত্তি হলো উদ্বৃত্ত। যোগানের সীমাবদ্ধতার কারণে জমি বা অনুরূপ কোন স্থির উপকরণের মালিক যে উদ্বৃত্ত আয় পায়, তা হলো খাজনা।

গ. উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযুক্ত উপাদানের সুযোগ ব্যয় অপেক্ষা বাড়তি উপার্জিত অর্থকে খাজনা বলে।

২. খাজনা দেয়ার (উদ্ভবের) কারণগুলো হচ্ছে –
ক. চাহিদার তুলনায় উপাদান যোগানের স্বল্পতার কারণে খাজনা দিতে হয় (স্বল্পতা ভিত্তিক খাজনা) ;
খ. উপাদানের পার্থক্যজনিত কারণে খাজনা দিতে হয়, যেমন – জমির উর্বরতার মধ্যে পার্থক্য থাকে বলে এবং জমির অবস্থানগত ভিন্নতার কারণে খাজনা দেয়া হয় ;
গ. উপাদানের অপরিহার্যতার কারণেও খাজনা প্রদান করতে হয় ;
ঘ. উপাদানের স্থানান্তর ব্যয় যা সুযোগ ব্যয়ের প্রেক্ষিতে খাজনা দিতে হয় ;
ঙ. জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হয় বলে খাজনা প্রদান করতে হয়।

অনুশীলনী ১১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। খাজনা বলতে কি বুঝানো হয়?
ক. বাড়ি, দোকান, গাড়ী এসবের ভাড়া
খ. জমি ব্যবহারজনিত দাম
গ. সরকারকে প্রদত্ত কর
ঘ. মূলধন নিয়োগ বাবদ প্রাপ্তি

২। অর্থনৈতিক খাজনা কোন বিষয়ের সাথে জড়িত?
ক. ব্যাংক প্রদত্ত সুদ   খ. জমির দাম
গ. শ্রমিকের দাম   ঘ. ম্যানেজারের প্রাপ্তি

৩। খাজনা প্রদানে কোন কারণগুলো প্রাধান্য পায়?
ক. খাদ্য শস্যের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে
খ. জমি থেকে প্রাপ্ত ফসল ক্রমাগত কমে আসার কারণে
গ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে
ঘ. যুদ্ধ ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণে

৪। জমির যোগান স্থির থাকার কারণ কি?
ক. জমি প্রকৃতি প্রদত্ত
খ. জমির বিকল্প নেই
গ. জনগণের কাছে জমির চাহিদা অপরিবর্তিত
ঘ. নতুন দ্বীপ বা চর না দেখা দেওয়ায়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. খাজনার একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করুন।
খ. খাজনা উৎপত্তির তিনটি কারণ কি কি?

পাঠ ২ : মোট খাজনা ও নীট খাজনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- মোট খাজনা কি, তা বলতে পারবেন।
- নীট খাজনা কি, তা বলতে পারবেন।
- মোট খাজনা ও নীট খাজনার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

১১.২.১ মোট খাজনা ও নীট খাজনার সংজ্ঞা

জমি ব্যবহারকারী কর্তৃক জমির মালিককে চুক্তি অনুসারে প্রদত্ত মোট অর্থকে (বা মোট বাড়তি ফসল প্রাপ্তিকে) মোট খাজনা বলা হয়। চুক্তিভিত্তিক খাজনা যা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে মোট খাজনা হিসাবে বুঝানো হয়। চুক্তিভিত্তিক প্রাপ্ত খাজনা বা মোট খাজনার মধ্যে জমির বিশুদ্ধ খাজনা যেমন থাকে, তেমনি তার মধ্যে জমির মালিকের মূলধন নিয়োগবাবদ সুদ, প্রাপ্তিযোগ্য মজুরি, মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত কর অন্তর্ভুক্ত থাকে। এসবকে মোট খাজনা থেকে বিয়োগ করলে যা থাকে তা'হলো নীট খাজনা বা বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক খাজনা। সুতরাং বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক খাজনা বা নীট খাজনা হলো উপাদান ব্যবহারজনিত প্রদত্ত অর্থ, যা সেই উপাদানের অস্থিতিস্থাপকতার জন্য দেওয়া হয় এবং নীট খাজনার মধ্যে সুদ, মজুরী, কর এসব বিষয় থাকে না।

১১.২.২ মোট খাজনার উপাদানসমূহ [মোট খাজনা ও নীট খাজনার পার্থক্য নির্দেশ]

মোট খাজনা একটি প্রসারিত ধারণা। মোট খাজনার মধ্যে থাকে নীট খাজনাসহ আর কিছু উপাদান। চলুন সেগুলোর উপর আলোকপাত করা যাক। জমির মালিককে যখন অর্থ প্রদান করা হয়, তখন জমির উপর নির্মিত ঘরবাড়ি বা নলকূপ বাবদ অর্থও তার মধ্যে থাকে। কিন্তু সেই ঘরবাড়ি, নলকূপ এসব সরাসরি জমি হিসাবে বিবেচ্য নয়। বরং তা' স্থায়ী মূলধন হিসাবে গণ্য। জমি রক্ষণাবেক্ষণ বা উন্নয়নের জন্য মালিক তার মূলধন খাটাতে পারে। সেই মূলধনের জন্য যে সুদ পাওয়ার কথা ছিল, তা' খাজনার ভিতর থেকে যায়। তাছাড়া জমি ভাড়া দিলেও মালিক নিজে অনেক সময় তত্ত্বাবধান করে, সময় ব্যয় করে এবং তার জন্য তাকে পরিশ্রমও করতে হয়। কাজেই সে বাবদ মালিক অর্থ প্রাপ্তি (যা মূলতঃ তার মজুরী) আশা করতে পারে। কিন্তু তা মোট খাজনা নামক প্রাপ্তির মধ্যেই থেকে যায়। আবার জমির উপর সরকার কর ধার্য করলে মালিক নিজে সেই কর প্রদান করে। কিন্তু জমি ব্যবহারকারীর নিকট থেকে মালিক যখন খাজনা পায়, তখন সে স্বাভাবিকভাবে আশা করে যে, তার প্রদত্ত কর খাজনা প্রাপ্তির মাধ্যমে উঠে আসবে। সুতরাং মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত কর মোট খাজনার মধ্যে নিহিত থাকে। কাজেই সুদ, মজুরী ও কর বাবদ প্রাপ্তি ধরে নিয়ে যখন প্রসারিত দৃষ্টিতে খাজনা হিসাব করা হয়, তখন তাকে মোট খাজনা বলে। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জমি (বা অনুরূপ কোন উপাদান) বাবদ প্রাপ্ত মোট খাজনা থেকে মালিক কর্তৃক প্রাপ্য সুদ, মজুরী এবং মালিক প্রদত্ত কর ইত্যাদি বাবদ হিসাবকৃত অর্থ বাদ দিলে যা থাকে তাই হলো (নীট) অর্থনৈতিক খাজনা। আর তাকে বিশুদ্ধ বা প্রকৃত খাজনাও বলে। নীট খাজনা, মোট খাজনারই একটি উপাদান বা অংশ। সুতরাং মোট খাজনার উপাদানগুলো হলো নীট খাজনা, মালিকের মূলধন নিয়োগ বাবদ সুদ, মালিকের পরিশ্রম বাবদ মজুরি ও মালিক কর্তৃক প্রদত্ত কর।

সারসংক্ষেপ

ক. জমি (বা অনুরূপ কোন উপাদান) ব্যবহারের বিনিময়ে মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয়, তা মোট খাজনা। কারণ জমি ব্যবহারকারী কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের সবটাই কেবল জমি বাবদ দেওয়া হয় না। সেই জমিতে নির্মিত ঘরবাড়ি বা নলকূপ থাকলে তার ব্যবহার বাবদ দামও সেই অর্থের মধ্যে থাকে। জমির দেখাশোনা বাবদ মালিকের সময় ও অর্থ ব্যয় হতে পারে। সেই বাবদে কিছু অর্থ প্রাপ্তি মালিকের পক্ষে আশা করা অস্বাভাবিক নয়। এইসব কিছু প্রাপ্তি মিলে মোট খাজনা চিহ্নিত হয়।

খ. নির্দিষ্ট জমি বা অনুরূপ কোন উপাদান বাবদ প্রাপ্ত মোট খাজনা থেকে মালিক কর্তৃক প্রাপ্য সুদ, মজুরি ও প্রদত্ত কর ইত্যাদি বাবদ অর্থ বাদ দিলে পাওয়া যায় নীট খাজনা।

গ. মোট খাজনারই একটি অংশ হলো নীট খাজনা।

ঘ. নীট খাজনাকে বিশুদ্ধ বা প্রকৃত খাজনা বলা হয়।

ঙ. মোট খাজনার উপাদানগুলো হলো নীট খাজনা, মালিকের মূলধন নিয়োগ বাবদ সুদ, মালিকের পরিশ্রম বাবদ মজুরি, মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত কর।

অনুশীলনী ১১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মোট খাজনা কি?

ক. বাড়ি ভাড়া

খ. জমি ও উক্ত জমিতে যাবতীয় নির্মাণ সামগ্রী বাবদ ভাড়া

গ. শুধু জমি ব্যবহার বাবদ দাম

ঘ. ফসলের দাম

২। নীট খাজনা কি?

ক. মোট খাজনা থেকে সরকারকে প্রদত্ত কর

খ. ব্যয়যোগ্য আয়

গ. জমি থেকে প্রাপ্ত ফসল

ঘ. মোট খাজনা থেকে জমির মালিকের প্রাপ্য সুদ, মজুরি, কর ইত্যাদি বাদ দিয়ে নীট প্রাপ্তি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. মোট খাজনা কি? তার উপাদানগুলো কি কি?

খ. নীট খাজনা কি?

গ. মোট খাজনা ও নীট খাজনার মধ্যে দু'টি পার্থক্য উল্লেখ করুন।

পাঠ ৩ : অনুপার্জিত আয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- অনুপার্জিত আয় বলতে কি বুঝানো হয়, তা বলতে পারবেন।
- উপার্জিত আয় ও অনুপার্জিত আয়, এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- খাজনাকে অনুপার্জিত আয় কেন বলা যায়, তা বলতে পারবেন।

১১.৩.১ অনুপার্জিত আয় কি?

জমির দাম বাড়লে মালিকের অতিরিক্ত আয় হয়। কিন্তু সেই অতিরিক্ত আয়ের জন্য মালিককে কোন বাড়তি পরিশ্রম বা বিনিয়োগ করতে হয় না। কাজেই শ্রম বা অর্থ বিনিয়োগ না করে কেবল দাম বৃদ্ধির কারণে জমির মালিক যে বাড়তি অর্থ হাতে পায়, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।

কোন হাইওয়ে (যেমন – বিশ্বরোড বা এশিয়ান হাইওয়ে নামে) একটি অবহেলিত গ্রাম বা জনপদ দিয়ে নির্মিত হলো। সেখানে জমির চাহিদা বেড়ে যায় এবং তার দাম বাড়ে। অথবা ধরা যাক, বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু নির্মাণের ফলে কোন বিশেষ অঞ্চলের জমির দাম হঠাৎ বেড়ে গেল। এর ফলে জমির মালিকরা আশাতীত আয় লাভ করতে পারে। আবার ঢাকার মূল এলাকায় জমি আগেও যা ছিল, এখনও তাই আছে। কিন্তু লোকসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় জমির দাম হু হু করে বেড়ে গেল। ঢাকার জমির মালিকদের অকল্পনীয় আয় পাওয়ার সুযোগ এসে গেল। কিন্তু সেই বাড়তি আয় পাওয়ার জন্য মালিককে কোন পরিশ্রম করতে হয়নি বা অর্থ ব্যয় করতে হয় নি। এভাবে জমির মালিকরা বিনা পরিশ্রমে বা বাড়তি কোন ব্যয় না করে যে বর্ধিত আয় পায়, সেই আয়কে অনুপার্জিত আয় বলে। সুতরাং শ্রম বা অর্থ বিনিয়োগ করে উপাদানের মালিক যখন অর্থ উপার্জন করে, সেই আয়কে উপার্জিত আয় বলে। অপরপক্ষে বিনা পরিশ্রমে বিনা ত্যাগের বিনিময়ে যে অর্থ উপাদানের মালিক পায়, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে।

১১.৩.২ অনুপার্জিত আয় সৃষ্টির কারণ

অনুপাজির্ত আয় সৃষ্টির কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. যখন নগরীর আয়তন প্রসারিত হয়, শিল্প কলকারখানা স্থাপিত হয়, নতুন রাস্তাঘাট তৈরি হয়, বিল্ডিং গড়ে উঠে ; তখন চাষাবাদের জন্য জমির পরিমাণ কমে যায়। এমতাবস্থায় জমির দাম বাড়ে। দাম বৃদ্ধির ফলে জমির মালিক অনুপার্জিত অর্থ পেয়ে থাকে।

২. জনসংখ্যা বাড়লে একই জমির উপর সেই জনসংখ্যার চাপ বাড়ে। জমির যোগান সীমিত, অথচ জমির চাহিদা ক্রমাগত বাড়লে জমির দাম বেড়ে যায়। তখন জমির বাড়তি দাম, মালিকের কাছে অনুপার্জিত হিসাবে হাতে আসে।

১১.৩.৩ অনুপার্জিত আয়ের উপর কর আরোপের যুক্তি

জমির চাহিদা তথা দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে জমির মালিক যে খাজনা পায়, তার জন্য জমির মালিকের কোন শ্রম ব্যয় করতে হয় না। জমির মালিক বসে থেকে এ বাড়তি খাজনা (অর্থ) পায়। কাজেই তা অনুপার্জিত আয়। সেই অনুপার্জিত আয়ের উপর সরকার কর আরোপ করলে জমির যোগান তাতে কমবে না। কর আরোপের উপযুক্ত ক্ষেত্র হলো এ অনুপার্জিত আয়। কারণ অনুপার্জিত আয়ের উপর সরকার কর আরোপ করলে জমির যোগান কমবে না, কর আরোপের দ্বারা সমাজের উপর কোন বাড়তি ভারও পড়বে না, অথচ সরকারী কোষাগারে রাজস্ব আসবে যথেষ্ট।

সারসংক্ষেপ

ক.	খাজনাকে অনুপার্জিত আয় বলে। কারণ খাজনা পাওয়ার জন্য মালিকের কোন বাড়তি পরিশ্রম করতে হয় না।
খ.	জমির চাহিদা বাড়লে জমির দাম বাড়ে। জমির দাম বাড়লে মালিক আপনা আপনি বেশি অর্থ পেয়ে যায়। অথচ তার জন্য মালিকের বাড়তি পরিশ্রম করতে হয় না।

অনুশীলনী ১১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। অনুপার্জিত আয় কি?
ক. জমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত মজুরি
খ. ফসল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ
গ. জমিতে নির্মিত ঘরবাড়ির ভাড়া
ঘ. পরিশ্রম ব্যতিরেকে জমির দাম বৃদ্ধির কারণে জমির মালিকের প্রাপ্ত অতিরিক্ত আয়।

২। অনুপার্জিত আয় প্রাপ্তির কারণ কি কি?
ক. জনসংখ্যা বাড়লে জমির চাহিদা বাড়ে
খ. মালিকের পরিশ্রমের মাত্রা বাড়লে
গ. নগরীর আয়তন প্রসারিত হলে
ঘ. চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বেড়ে গেলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক. অনুপার্জিত আয় কি?
খ. উপার্জিত আয় ও অনুপার্জিত আয়ের মধ্যে পার্থক্য কিরূপ?
গ. অনুপার্জিত আয় প্রাপ্তির কারণ উল্লেখ করুন।

পাঠ ৪ : নিম খাজনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- নিম খাজনা বলতে কি বুঝানো হয়, তা বলতে পারবেন।
- নিম খাজনা ও অর্থনৈতিক খাজনা, এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারবেন।
- নিম খাজনা কেন স্বল্পকালে থাকে, কিন্তু দীর্ঘকালে থাকে না, তা বলতে পারবেন।
- খাজনা, নিম খাজনা ও সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য কিরূপ, তা বলতে পারবেন।
- নিম খাজনা ও অর্থনৈতিক মুনাফা একই কিনা, তা বলতে পারবেন।

১১.৪.১ নিম খাজনার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

উপাদান যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা থেকে খাজনা সংক্রান্ত বিষয়ের উদ্ভব হয়। যেমন – উৎকৃষ্ট জমির যোগান স্থির, তাই জমির চাহিদা বাড়লে সেই জমির মালিকরা তা থেকে উদ্বৃত্ত (খাজনা) উপার্জন করতে পারে। তবে জমি ছাড়াও এমন কিছু উপকরণ বা সম্পদ আছে, যাদের যোগানও অন্ততঃ স্বল্পকালের জন্য সীমিত। যেমন – কলকারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি স্বল্পকালে পরিবর্তনযোগ্য নয়। ফলে সেসব যন্ত্রপাতি বা মূলধন সামগ্রীর যোগান স্থির বলে তা থেকে উদ্বৃত্ত আয় আসতে পারে। এ ধরনের আয়কে অধ্যাপক মার্শাল নিম খাজনা বা খাজনা সদৃশ (Quasi-rent) বলেছেন। সুতরাং স্বল্পকালে যন্ত্রপাতি বা মূলধন সামগ্রীর ন্যায় স্থির উপাদানের জন্য মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত বাড়তি উপার্জনকে নিম খাজনা বলে।

আধুনিক অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে, খাজনা শুধু জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং যে কোন উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এ ধারণার প্রেক্ষিতে নিম খাজনা আলোচিত হয়। এসবের যোগান বাড়াতে সময় লাগে। যেমন – ঢাকা নগরীতে লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে আবাসিক সমস্যা প্রকট হয়ে উঠছে। এমতাবস্থায় নতুন নতুন বিল্ডিং তৈরী সময় সাপেক্ষ বলে পুরনো বাড়িঘরের ভাড়া অনেক বেড়ে গিয়েছে। পুরনো বাড়িঘরের জন্য মালিকের তেমন অতিরিক্ত খরচ করতে হয় না, অথচ বাড়তি ভাড়া সহজেই তার হাতে আসে। এ ধরনের বাড়তি অর্থ, যা যোগানের সীমাবদ্ধতার কারণে অর্জিত হয়, সেই অর্থকে নিম খাজনা বলা হবে। কিন্তু দীর্ঘকালে অনেক নতুন বাড়িঘর তৈরী হলে এবং সরকার গৃহ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলে বাড়ি ভাড়াও কমে যেতে পারে। কাজেই স্বল্পকালীন নিম খাজনা দেখা দিলেও দীর্ঘকালে সেই খাজনা নাও থাকতে পারে।

১১.৪.২ সাধারণ খাজনা বা অর্থনৈতিক খাজনার সঙ্গে নিম খাজনার পার্থক্য

ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ। ভূমির অস্থিতিস্থাপক যোগানের কারণে যে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায় তাকে অর্থনীতিতে খাজনা বলে। অপরদিকে প্রকৃতি প্রদত্ত নয়, কিন্তু মানুষের দ্বারা রূপান্তরিত উপকরণ (যেমন – মূলধন বা যন্ত্রপাতি) থেকে যে অতিরিক্ত আয় স্বল্পকালে পাওয়া যায়, তাকে নিম খাজনা বলে। অর্থনৈতিক খাজনা স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয়ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু নিম খাজনা স্বল্পকালীন বিষয়। অর্থনৈতিক খাজনা প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের সঙ্গে জড়িত। অপরদিকে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে রূপান্তরিত করে মানুষ যে সম্পদ প্রস্তুত করে সেই বাবদ প্রাপ্ত খাজনাকে নিম খাজনা বলে।

১১.৪.৩ নিম খাজনাকে অপূর্ণাঙ্গ খাজনা কেন বলা যায়?

জমির ন্যায় অন্যান্য উপকরণের যোগান যদি নির্দিষ্ট থাকে, তবে সেই উপকরণগুলোর যোগানও জমির ন্যায় অস্থিতিস্থাপক হয়। কিন্তু এমন হতে পারে যে, অন্যান্য উপকরণের যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা স্থায়ী নয়, তা সাময়িক। স্বল্পকালে সেই উপকরণের যোগান বাড়ানো বা

কমানো না গেলেও দীর্ঘকালে তার যোগান স্থিতিস্থাপক হতে পারে। অর্থাৎ তাদের যোগান প্রয়োজন অনুসারে বাড়ানো-কমানো যায়। কিন্তু জমির যোগান স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট, অর্থাৎ সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। তাই জমি থেকে প্রাপ্ত খাজনাকে পূর্ণাঙ্গ খাজনা বলা হয়। কিন্তু মানুষের তৈরি যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম এর যোগান স্বল্পকালে স্থির থাকতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালে এদের যোগান পরিবর্তন করা যায়। স্বল্পকালে অপরিবর্তনযোগ্য যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জামের আয় নির্দেশ করার জন্য মার্শাল 'অপূর্ণাঙ্গ খাজনা' ধারণাটি ব্যবহার করেন। কিন্তু দীর্ঘকালে যেহেতু এদের যোগান পরিবর্তন করা যায়, তাই দীর্ঘকালে এই খাজনা আর থাকে না। নিম খাজনা স্বল্পকালের জন্য প্রযোজ্য হলেও দীর্ঘকালের জন্য তা খাজনাকে অপূর্ণাঙ্গ খাজনা বলে। তাদের মধ্যে স্বল্পকালে মৌলিক পার্থক্য নেই। তবে জমির খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে দীর্ঘকালে তফাৎ দেখা দেয়।

১১.৪.৪ খাজনা, নিম খাজনা ও সুদের মধ্যে সম্পর্ক

সাধারণভাবে বলা হয় যে, জমির আয় হলো খাজনা। মনুষ্য সৃষ্ট যন্ত্রপাতি বা মূলধন থেকে প্রাপ্ত আয়কে নিম খাজনা বলে। আবার ঋণযোগ্য মূলধনের আয়কে সুদ বলে। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় ক্ষেত্রে জমির যোগান মোটামুটি অস্থিতিস্থাপক অর্থাৎ তেমন পরিবর্তনযোগ্য নয়। মানুষের সৃষ্ট মূলধন বা যন্ত্রপাতি স্বল্পকালে স্থির থাকলেও দীর্ঘকালে পরিবর্তনযোগ্য।

মূলধন ভাসমান ও স্থায়ী হতে পারে। কখনও ভাসমান স্থায়ী মূলধনে পরিণত হয়, আবার কখনও অবচয় তহবিলের দ্বারা স্থায়ী মূলধন ভাসমান মূলধনে রূপান্তরিত হয়। তবে ভাসমান মূলধনের যোগান দ্রুত পরিবর্তন করা সম্ভব হলেও স্থায়ী মূলধনের পরিবর্তন ততটা সহজসাধ্য নয়। স্থায়ী মূলধনের যোগান স্বল্পকালে অস্থিতিস্থাপক। আর স্থায়ী মূলধনের অস্থিতিস্থাপকতার কারণে প্রাপ্ত অতিরিক্ত উপার্জনকে নিম খাজনা বলে। কিন্তু ঋণযোগ্য মূলধনের যোগান স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় সময়ই মোটামুটি স্থিতিস্থাপক। এ ধরনের মূলধন থেকে প্রাপ্ত আয়কে সুদ বলে, তাকে নিম খাজনা বলা হয় না। মানুষের সম্পত্তি নানা ধরনের হতে পারে। যেমন – জমি, বাড়ি, কলকারখানা, স্থায়ী মূলধন সামগ্রী, ঋণযোগ্য মূলধন ইত্যাদি। কিন্তু এক এক ধরনের সম্পত্তি থেকে উপার্জিত আয়কে এক এক নামে অভিহিত করা হয়। যেমন জমি ও বাড়ি থেকে উপার্জিত অর্থকে খাজনা, স্থায়ী মূলধন সামগ্রী থেকে উপার্জিত অর্থকে নিম খাজনা এবং ঋণযোগ্য মূলধন থেকে উপার্জিত আয়কে সুদ বলে। কাজেই ভাসমান মূলধন যখন স্থায়ী মূলধনে পরিণত হয়, তখন সুদের পরিবর্তে নিম খাজনা বিবেচনায় এসে পড়ে। সুতরাং খাজনা, নিম খাজনা ও সুদ এদের পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। অনেক সময় এদের মধ্যে পার্থক্যের সীমা রেখা টানা কঠিন হয়ে পড়ে।

সারসংক্ষেপ

ক. জমির যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা থেকে খাজনা উৎপত্তি হয়। কিন্তু জমি ছাড়াও এমন কিছু উপকরণ বা সম্পদ (যন্ত্রপাতি) আছে, যাদের যোগান স্বল্পকালে সীমিত, তাদের জন্য খাজনার অনুরূপ প্রাপ্তি আসে। সেই প্রাপ্তি হলো নিম খাজনা।

খ. খাজনা সংক্রান্ত বিষয়টি স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় সময়ের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু নিম খাজনার ধারণা দীর্ঘকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

গ. খাজনা সংক্রান্ত ধারণা মূলতঃ জমির সাথে জড়িত। কিন্তু নিম খাজনা স্বল্পকালে বিশেষিকৃত মূলধন সামগ্রী বা যন্ত্রপাতির সাথে জড়িত।

ঘ. জমির খাজনা ও অন্যান্য উপাদানের অপূর্ণাঙ্গ খাজনা তথা নিম খাজনার মধ্যে স্বল্পকালে কোন পার্থক্য থাকে না। তবে দীর্ঘকালে অন্যান্য উপাদানের পরিবর্তন যোগ্যতার কারণে নিম খাজনা থাকে না।

অনুশীলনী ১১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। নিম খাজনা কি?
ক. জমি সংক্রান্ত খাজনা
খ. জমি ব্যতিরেকে মূলধন বা যন্ত্রপাতির স্বল্পকালের প্রাপ্তি
গ. সরকারকে প্রদত্ত কর
ঘ. স্থানান্তরিত আয়।

২। নিম খাজনার উৎপত্তির কারণ কি?
ক. জমির যোগান সীমিত বলে
খ. স্বল্পকালে বিশেষিকৃত মূলধন ও যন্ত্রপাতির সীমিত যোগানের কারণে
গ. সরকার কর্তৃক অধিক রাজস্ব সংগ্রহের কারণে
ঘ. নগরীতে গৃহ সমস্যার কারণে।

৩। নিম খাজনার ধারণা কে প্রদান করেন?
ক. রিকার্ডো খ. কেইনস্
গ. মার্শাল ঘ. মিসেস রবিনসন

৪। নিম খাজনা চিকিৎসক, প্রকৌশলী, গায়ক, শিল্পী এসব পেশার ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য হয়?
ক. তাদের চাহিদা স্বল্পকালে হঠাৎ বেড়ে গেলে
খ. সমাজের তাদের মর্যাদা বেশি বলে
গ. পেশা শিক্ষায় অধিক ব্যয় হয় বলে
ঘ. আয় প্রাপ্তির দিকে তাদের অধিক নজর থাকে বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক. নিম খাজনা কি?
খ. খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে পার্থক্য কি?
গ. নিম খাজনা দেখা দেওয়ায় তিনটি কারণ উল্লেখ করুন।

পাঠ ৫ : রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে খাজনা বলতে কি বুঝানো হয়, তা বলতে পারবেন।
- রিকার্ডোর মতে খাজনা উৎপত্তির মূল কারণগুলো জানতে পারবেন।
- রিকার্ডো খাজনাকে কেন পার্থক্যজনিত আয় হিসাবে চিহ্নিত করেন তা বলতে পারবেন।
- জমির স্বল্পতা তথা প্রকৃতির কৃপণতা খাজনার জন্য দায়ী – এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন।
- বিভিন্ন জমির মধ্যে উর্বরতার পার্থক্য থাকলে অথবা অবস্থানগত পার্থক্য থাকলে কিভাবে খাজনার উৎপত্তি হয়, তা বলতে পারবেন।

[খাজনা তত্ত্ব সম্পর্কে ডেভিড রিকার্ডো যে বক্তব্য রাখেন তা খাজনা সম্পর্কিত অর্থনীতির একেবারে প্রথম বক্তব্য নয়। রিকার্ডোর পূর্বেও কোন কোন চিন্তাবিদ খাজনা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছেন। তবে রিকার্ডোর তত্ত্ব একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা হিসাবে অনেক অর্থনীতিবিদের কাছে মনে হয়েছে।]

১১.৫.১ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের মূল কথা

রিকার্ডোর বক্তব্য অনুসারে প্রকৃতি প্রদত্ত ক্ষমতার কারণে অর্থাৎ জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর গুণের কারণে জমি থেকে ফসল পাওয়া যায়। সেই ফসলের অংশ যা জমির মালিককে দেওয়া হয়, তাই হলো জমির খাজনা। প্রকৃতি অকৃপণভাবে মানুষকে জমির যোগান দেয়নি। তাই রিকার্ডো মনে করেন চাহিদার তুলনায় জমির যোগানের স্বল্পতার কারণে খাজনার উদ্ভব হয়। ভূমিবাদি অর্থনীতিবিদগণ মনে করতেন প্রকৃতির দয়ায় খাজনা পাওয়া যায়। কিন্তু রিকার্ডোর মতে প্রকৃতির কৃপণতাই খাজনার জন্য দায়ী। প্রকৃতি যদি কৃপণ না হত অর্থাৎ উর্বর জমি যদি অফুরন্ত পাওয়া যেত, তা হলে জমি থেকে খাজনার উৎপত্তি হত না। জমির পরিমাণ যেহেতু প্রয়োজনের তুলনায় কম, তাই খাজনার উৎপত্তি ঘটে।

রিকার্ডো আরও মনে করে, খাজনা হলো উৎপাদকের উদ্বৃত্ত। জমির উর্বরতার পার্থক্যের কারণে সেই উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা দেখা দেয়। একই দৃষ্টিকোণ থেকে খাজনাকে পার্থক্যজনিত আয় বলা যায়। বিভিন্ন জমির মধ্যে উর্বরতার পার্থক্য আছে। কোন জমি বেশি উর্বর এবং কোনটি কম উর্বর। প্রথমে বেশি উর্বর জমি চাষের আওতায় আসে। তারপর ফসলের চাহিদা বাড়লে ক্রমেই অনুর্বর জমি চাষের আওতায় আনতে হয়। যে জমি চাষ করার পর প্রাপ্ত ফসলের দাম দ্বারা কেবল চাষের খরচ নির্বাহ করা যায়, কিন্তু কোন উদ্বৃত্ত পাওয়া যায় না, সেই জমিকে প্রান্তিক জমি বলে। প্রান্তিক জমির খাজনা নেই। প্রান্তিক জমির তুলনায় উর্বর জমিতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত (খরচের উদ্বৃত্ত) ফসল হলো খাজনা।

রিকার্ডোর তত্ত্বের মূল বক্তব্য অনুসারে দু'টি কারণে খাজনার উদ্ভব হয়। সেই দু'টি কারণ কি কি?

১। যদি বিভিন্ন জমি সমজাতীয় হয়, অর্থাৎ গুণাগুণের দিক থেকে তারা যদি একই রকম হয়, তবে চাহিদার তুলনায় জমির স্বল্পতার কারণে খাজনা (Scarcity rent) দেখা দেয়।

২। যখন গুণগত দিক থেকে বিভিন্ন জমি বিভিন্ন রকম হয়, তখন উর্বরতা ও অবস্থানগত দিক থেকে নিকৃষ্ট জমির তুলনায় উৎকৃষ্ট জমিতে তারতম্যমূলক খাজনা (Differential rent) দেখা দেয়।

১১.৫.২ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের অনুমিতি

১. সমগ্র সমাজের প্রেক্ষিতে বিবেচিত জমির যোগান সীমিত।
২. জমি যেহেতু প্রকৃতি প্রদত্ত, তাই তার যোগান মূল্য নেই। জমির দাম বাড়লেও যোগান বৃদ্ধির সুযোগ নেই।
৩. ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর।
৪. জমির উৎপাদন ক্ষমতা তথা উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনার উৎপত্তি হয়।
৫. জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর ক্ষমতা আছে।

১১.৫.৩ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের উদাহরণভিত্তিক বিশ্লেষণ

উর্বরা শক্তির ভিত্তিতে জমিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাক : ১ম , ২য় ও ৩য়। ১ম শ্রেণীর জমিকে উৎকৃষ্ট, ২য় শ্রেণীর জমিকে মধ্যম এবং ৩য় শ্রেণীর জমিকে নিকৃষ্ট বলা হয়। ৩য় শ্রেণীর জমিকে প্রান্তিক জমি (marginal land) বলা হয়। প্রান্তিক জমির প্রাপ্ত ফসল ও সেই ফসলের উৎপাদনের ব্যয় সমান। সেখানে কোন উদ্বৃত্ত পাওয়া যায় না। কাজেই প্রান্তিক জমি বাবদ কোন খাজনা দিতে হয় না। প্রান্তিক জমির তুলনায় ১ম ও ২য় শ্রেণীর জমিতে যে বাড়তি ফসল পাওয়া যায়, তার আর্থিক মূল্যকে খাজনা বলা হয়। ৩য় শ্রেণী অপেক্ষা ২য় শ্রেণীর জমিতে ফসল বেশী পাওয়া যায় এবং ২য় শ্রেণী অপেক্ষা ১ম শ্রেণীর জমিতে আরও বেশি ফসল পাওয়া যায়। তাই ৩য় শ্রেণীর (প্রান্তিক) জমির ভিত্তিতে ২য় শ্রেণীর জমি থেকে যতটা খাজনা পাওয়া যায়, তার তুলনায় ১ম শ্রেণীর জমিতে খাজনা বেশি হয়।

জমির শ্রেণী	একর প্রতি উৎপাদন (কুইন্টাল)	প্রতি কুইন্টালের দাম (টাকা)	মোট আয় (টাকা)	মোট খরচ (টাকা)	উদ্বৃত্ত বা খাজনা (টাকা)
১ম শ্রেণী	২০	৪০০	৮০০০	২০০০	৬০০০
২য় শ্রেণী	১০	৪০০	৪০০০	২০০০	২০০০
৩য় শ্রেণী	৫	৪০০	২০০০	২০০০	০ (শূন্য)

উপরের সূচিতে লক্ষ্য করা যায় যে, ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর জমির একর প্রতি উৎপাদন যথাক্রমে ২০, ১০ ও ৫ কুইন্টাল। প্রতি কুইন্টালের দাম ৪০০ টাকা হলে উৎপন্ন ফসল বিক্রি করে উৎপাদক অর্থ পায় যথাক্রমে ৮০০০, ৪০০০ ও ২০০০ টাকা। একর প্রতি জমির উৎপাদন ব্যয় ধরা যায় ২০০০ টাকা। সুতরাং

১ম শ্রেণীর জমির খাজনা = ৮০০০ – ২০০০ = ৬০০০ টাকা।
২য় শ্রেণীর জমির খাজনা = ৪০০০ – ২০০০ = ২০০০ টাকা।
৩য় শ্রেণীর জমির খাজনা = ২০০০ – ২০০০ = ০ (শূন্য) টাকা।

সুতরাং ৩য় শ্রেণীর জমিতে কোন খাজনা থাকে না। এখানে ২য় শ্রেণীর জমিটি প্রান্তিক জমি হিসাবে বিবেচ্য। সেই প্রান্তিক জমির তুলনায় ১ম ও ২য় শ্রেণীর জমিতে যে উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়, তাই খাজনা নামে অভিহিত হয়। লক্ষ্য করা যায় যে, প্রান্তিক জমির তুলনায় জমিতে অধিক খাজনা থাকে এবং ২য় শ্রেণীর জমিতে তার তুলনায় খাজনার পরিমাণ কম হয়।

১১.৫.৪ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের চিত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ

চিত্রে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব নির্দেশ করা হলো। ভূমি অক্ষে জমির শ্রেণী ও লম্ব অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদন ব্যয় নির্দেশ করা হয়েছে। ১ম শ্রেণীর জমিকে A, ২য় শ্রেণীর জমিকে B এবং ৩য় শ্রেণীর জমিকে C হিসাবে নির্দেশ করা হলো। A তে সংশ্লিষ্ট আয়তক্ষেত্র ৮০০০ টাকার উৎপাদন, B তে সংশ্লিষ্ট আয়তক্ষেত্র ৪০০০ টাকার উৎপাদন এবং C তে সংশ্লিষ্ট আয়তক্ষেত্র ২০০০ টাকার উৎপাদন নির্দেশ করে। C কে এখানে প্রান্তিক জমি বলা হয়। C তে সংশ্লিষ্ট আয়তক্ষেত্রের সমান আয়তক্ষেত্র, A তে সংশ্লিষ্ট আয়তক্ষেত্র থেকে বাদ দিলে পাওয়া যায় A জমির খাজনা। A তে সংশ্লিষ্ট আয়তক্ষেত্রের ছায়াবৃত্ত অংশ দ্বারা A জমির খাজনা দেখানো হয়। একইভাবে C তে সংশ্লিষ্ট আয়তক্ষেত্রের সমান আয়তক্ষেত্র, B তে সংশ্লিষ্ট আয়তক্ষেত্র থেকে বাদ দিলে পাওয়া যায় B জমির খাজনা। B তে সংশ্লিষ্ট আয়তক্ষেত্রের ছায়াবৃত্ত অংশ দ্বারা B জমির খাজনা দেখানো হয়।

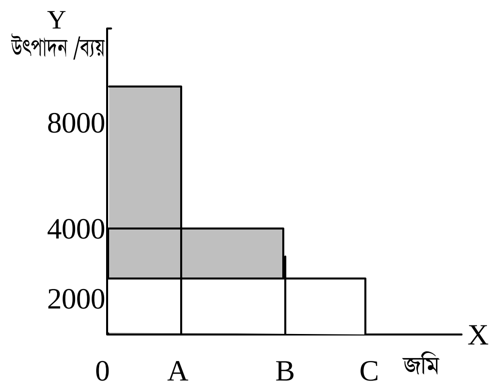

চিত্র-২

১১.৫.৫ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের ত্রুটি বা সমালোচনা

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের বিভিন্ন ভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। নিম্নে তাদের উল্লেখ করা হল—

১। জমি প্রকৃতি প্রদত্ত হলেও তার শক্তি অবিনশ্বর নয়। জমির উর্বরতা ক্ষয় হতে পারে। আবার বৈজ্ঞানিক চাষাবাদের মাধ্যমে জমির উর্বরতা বাড়ানো যেতে পারে। তাই জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তি নির্ধারণ করা কঠিন।

২। জমির ব্যবহারকে কেবল একটি ক্ষেত্রে সীমিত রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। যেমন – কোন জমি একটি বিশেষ ফসল উৎপাদনের উপযোগি হলেও সেই ফসলের জন্য সেই জমি সর্বদাই থাকবে, এটি ভেবে নেওয়া ঠিক নয়। একই জমি একাধিক ব্যবহারে নিয়োগ করা সম্ভব হলে ক্ষেত্র বিশেষে জমির যোগান কমানো বা বাড়ানো যায়।

৩। রিকার্ডো মনে করেন উৎকৃষ্ট জমি প্রথমে চাষাবাদের আওতায় আনা হয়, তারপর মধ্যম এবং সর্বশেষে নিকৃষ্ট জমি চাষাবাদ করা হয়। প্রকৃত অবস্থায় মানুষ প্রথমে জমির সঠিক শ্রেণী বিভাগ করতে পারে না। মানুষ তার নিজস্ব সুবিধা অনুসারে জমি চাষ শুরু করে। এমন হতে পারে যে, সে যে জমি প্রথমে চাষ করা শুরু করল, সেই জমি উর্বরতার দিক থেকে হয়ত সর্বোৎকৃষ্ট নয়। জমির অবস্থানগত দূরত্ব সে বিবেচনায় আনতে পারে। যেমন – কোন ব্যক্তি তার বাসস্থান থেকে দূরবর্তী জমিতে চাষাবাদ করার চেয়ে নিকটবর্তী জমিতে চাষাবাদ করতে বেশী আগ্রহী থাকবে। কোন জমি বেশী উর্বর, এ বিষয়টির উপর সে প্রথমে গুরুত্ব নাও দিতে পারে।

৪। রিকার্ডোর তত্ত্বে খাজনাবিহীন জমির কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু খাজনা বিহীন জমি প্রকৃত অবস্থায় দেখা যায় না।

৫। রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে কেবল খাজনা দেখা দেয়। কারণ ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ। কিন্তু পরবর্তী কালে অধ্যাপক মার্শাল দেখান যে, ভূমি ছাড়াও যে কোন দুষ্প্রাপ্য উপাদানের ক্ষেত্রে খাজনার উৎপত্তি হতে পারে।

৬। রিকার্ডোর তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, জমির উর্বরতার পার্থ্যকের কারণেই খাজনার উদ্ভব হয়। কিন্তু সব জমির উর্বরতা সমান হলেও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি প্রয়োগের উপর খাজনার উৎপত্তি নির্ভর করতে পারে।

১১.৫.৬ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১। খাজনাকে পার্থক্যজনিত আয় বলা হয়। জমির মধ্যে কোন জমি উর্বর এবং কোন জমি অনুর্বর। প্রথমে উর্বর জমি চাষের আওতায় আসে। তারপর ফসলের চাহিদা বাড়লে ক্রমেই অনুর্বর জমি চাষের আওতায় আনতে হয়। যে জমি চাষ করার পর প্রাপ্ত ফসলের দাম দ্বারা কোন উদ্বৃত্ত পাওয়া যায় না, কেবল খরচ নির্বাহ করা যায়, সেই জমিকে প্রান্তিক জমি বলে। প্রান্তিক জমির খাজনা নেই। প্রান্তিক জমির তুলনায় উর্বর জমিতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত ফসল হলো খাজনা।

২। জমির আদি ও অবিনশ্বর গুণের জন্য খাজনা দেয়। রিকার্ডো মনে করেন, প্রকৃতি প্রদত্ত ক্ষমতার কারণে জমি থেকে ফসল পাওয়া যায়। সেই ফসলের অংশ যা জমির মালিককে দেওয়া হয়, তা হলো জমির খাজনা।

৩। প্রকৃতি অকৃপণভাবে অর্থাৎ অসীমরূপে জমির যোগান দেয় নি। তাই রিকার্ডো মনে করেন উৎকৃষ্ট জমির যোগান অসীম নয় বলে খাজনার উদ্ভব হয়। রিকার্ডোর মতে প্রকৃতির কৃপণতাই খাজনার জন্য দায়ী।

৪। খাজনা এক ধরনের অনুপার্জিত আয়, যেখানে জমির মালিকের কোন শ্রম ব্যয় করতে হয় না। জমির মালিক বসে থেকে যে বাড়তি অর্থ পায়, তা প্রকৃত অবস্থায় অনুপার্জিত আয়।

১১.৫.৭ অবস্থানগত খাজনা বলতে কি বুঝানো হয়?

জমির উর্বরতার পার্থক্যের উপর খাজনা নির্ভর করলেও খাজনার উৎপত্তি হিসাবে জমির অবস্থান যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। যে জমির অবস্থান কৃষকের বাড়ি থেকে দূরে অথবা বাজার থেকে দূরে, সেই জমির অবস্থানগত অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। কাজেই দূরবর্তী অবস্থানের জমির খাজনা নিকটবর্তী জমির খাজনা অপেক্ষা কম হয়। আবার গ্রামের জমির তুলনায় শহরের জমি অবস্থানগত কারণে খাজনা বেশী হয়। আবার সেই নগরীর এক অঞ্চলের জমির তুলনায় অপর অঞ্চলের জমির চাহিদা বেশী থাকে। ফলে জমির খাজনাও বেশী হয়। কাজেই অবস্থানের তারতম্যের কারণে খাজনার মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দেয়। অবস্থানগত কারণে যে জমির প্রাপ্তি ঘটে, সেই খাজনাকে অবস্থানিক খাজনা বলা যায়।

জমির অবস্থানের উপর খাজনা নির্ভর করে। উৎপন্ন ফসল থেকে শ্রম ও মূলধন বাবদ খরচ মিটানোর পর যে উদ্বৃত্ত পাওয়া যায় তাই হলো খাজনা। ফসল বিক্রি করে আয় পাওয়া যায় এবং ফসল উৎপাদন করতে ব্যয় হয়। উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়জনিত আয় এই দুয়ের ব্যবধান থেকে উদ্বৃত্ত আসে। জমি যদি সমান উর্বরা সম্পন্নও হয়, তথাপি বাজার থেকে অবস্থানগত দূরত্বের কারণে খাজনা দেখা দিতে পারে। যদি কোন জমি বাজারের নিকটে থাকে, তবে ফসল বাজারে আনার জন্য পরিবহণ ব্যয় কম হয়। অপরদিকে দূরত্ব বেশী হলে পরিবহণ ব্যয় বেড়ে যায়।

কাজেই পরিবহন ব্যয় পার্থক্যের কারণে বাজারের নিকটবর্তী জমির খাজনা বেশী হয় এবং দূরবর্তী জমির খাজনা কম হয় বা খাজনা একেবারেই থাকে না। যদিও হয়ত বাজারের

নিকটবর্তী জমি ও দূরবর্তী জমির উর্বরতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ ধরনের অবস্থানগত কারণে খাজনা বা উদ্বৃত্ত দেখা দিলে সেই খাজনাকে অবস্থানজনিত খাজনা বলা হবে।

সারসংক্ষেপ

ক. রিকার্ডোর বক্তব্য অনুসারে খাজনা হলো জমির উৎপন্নের সেই অংশ, যা জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তি ব্যবহারের দরুন জমির মালিককে প্রদান করতে হয়।
খ. চাহিদার তুলনায় জমির স্বল্পতার কারণে খাজনা (Scarcity rent) দেখা দেয়। ঃ
গ. বিভিন্ন জমির মধ্যে উর্বরতার পার্থক্য থাকলে নিকৃষ্ট জমি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমিতে খাজনা দেখা দেয়।
ঘ. অবস্থানগত দিক থেকে নিকৃষ্ট জমির তুলনায় উৎকৃষ্ট জমিতে তারতম্যমূলক খাজনা (Differential rent) দেখা দেয়।
ঙ. খাজনা হলো অনুপার্জিত আয়।

অনুশীলনী ১১.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুযায়ী খাজনা কি?
ক. বাড়ী ভাড়া
খ. জমি ব্যবহার বাবদ প্রদত্ত অর্থ
গ. জমির আদি ও অবিনশ্বর গুণের কারণে মালিককে প্রদত্ত ফসলের অংশ
ঘ. সরকারের আরোপিত জমির উপর কর।

২। রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুযায়ী খাজনা উদ্ভবের কারণ কি কি?
ক. জমির মালিক জমি দেখাশোনা করে বলে
খ. বিভিন্ন জমির মধ্যে উর্বরতার পার্থক্য থাকে বলে
গ. সরকারী নির্দেশের কারণে
ঘ. জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হওয়ার কারণে
ঙ. যুদ্ধের কারণে।

৩। রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে খাজনাকে উৎপাদন ব্যয়ের অতিরিক্ত হিসাবে কেন চিহ্নিত করা হয়?
ক. উৎপাদন ব্যয়ের অতিরিক্ত প্রাপ্তি উদ্বৃত্ত হিসাবে বিবেচিত হয় বলে
খ. উৎপাদন ব্যয় ও প্রাপ্ত আয়ের ব্যবধান থেকে মুনাফা জানা যাবে বলে
গ. জমির মালিকদের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার কারণে
ঘ. অব্যবহৃত জমিকে কৃষির আওতায় আনয়নের উদ্দেশ্যে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে খাজনা উৎপত্তির কারণ কি কি?
খ. রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের একটি উদাহরণ দিন।
গ. রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের দু'টি ত্রুটি উল্লেখ করুন।
ঘ. রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

পাঠ ৬ : খাজনা ও দাম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- খাজনা ও দামের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা বলতে পারবেন।
- দামের কারণে খাজনা প্রভাবিত হলেও খাজনার কারণে দাম প্রভাবিত হয় না, এ বিষয়টি জানতে পারবেন।
- রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব অনুসারে কেন খাজনা দামের ভিতর প্রবেশ করে না এ বিষয়টি বলতে পারবেন।

১১.৬.১ খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ?

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বে বলা হয় যে, খাজনা দামের ভিতর প্রবেশ করে না (Rent does not enter into price)। এর অর্থ হলো খাজনার কারণে দামের কোন পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ খাজনার মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয় না। তাই রিকার্ডোর মতে দাম নির্ধারণের কোন উপাদান হিসাবে খাজনাকে বিবেচনা করা উচিত নয়, বরং দামের দ্বারাই খাজনা নির্ধারিত হয়। রিকার্ডোর তত্ত্বে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম দ্বারা খাজনা নির্ধারিত হয়, খাজনার মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয় না। কাজেই খাজনা নির্ধারণে দামের প্রভাব থাকলেও দাম নির্ধারণে খাজনার প্রভাব নেই। খাজনা বেশী হলে ফসলের দাম বেশী হবে, একথা সত্য নয়। বরং ফসলের দাম বেশী হলে খাজনা বেশী হয়।

ক. রিকার্ডোর তত্ত্বে খাজনা দ্বারা দাম নির্ধারিত হয় না বা খাজনার কারণে দামের কোন পরিবর্তন হয় না - কারণ কি?

উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করে যে আয় আসে, তা থেকে উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে অবশিষ্টকে খাজনা বলা হয়। উৎপাদন খরচের মধ্যে খাজনাকে ধরা হয় না। রিকার্ডোর তত্ত্বে প্রান্তিক জমিতে কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। তাই সেই জমি বাবদ কোন খাজনাও দিতে হয় না। রিকার্ডো বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে জমি থেকে প্রাপ্ত ফসলের বাজার দাম প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়। প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় হিসাবে প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয় বুঝানো হয়। আবার প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় ফসলের দামের সমান হয়। কাজেই খাজনা প্রান্তিক ব্যয়ের কোন উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয় না। খাজনা যেহেতু প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের ভিতর ধরা হয় না, তাই উৎপন্ন দ্রব্যের দাম আছে, প্রকৃতি প্রদত্ত হিসাবে জমির সেরূপ যোগান দাম নেই। জমির যোগান দাম নেই বলে তা উৎপাদন ব্যয়কে বা দামস্তরকে প্রভাবিত করে না। আর এছাড়াও জমির বিকল্প ব্যবহার সীমিত এবং অনুমান করা হয় যে, জমিকে একটি মাত্র উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এ অবস্থায় কোন জমি থেকে বিকল্প বা স্থানান্তর আয় পাওয়া যায় না। যদি বিকল্প আয় থাকত, তবে খাজনা উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হত। তখন তা দামের উপর প্রভাব রাখতে পারত।

খ. রিকার্ডোর তত্ত্বে দাম দ্বারা খাজনা নির্ধারিত হয় - কিভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়?

রিকার্ডো মনে করেন দাম বরং খাজনাকে প্রভাবিত করে। যেমন – ফসলের দাম বেশী হলে উর্বর জমির মালিক বেশী অর্থ উপার্জন করতে পারে। কাজেই দাম বেশী হলে খাজনা বেশী হয় এবং দাম কম হলে খাজনা প্রাপ্তি কম হয়। সুতরাং রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে, দাম দ্বারা খাজনা নির্ধারিত হয়।

উৎপন্ন দ্রব্যের দাম বাড়লে খাজনা বাড়ে। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। ফসলের চাহিদা বেড়ে গেলে ফসলের দাম বাড়বে। যে জমি প্রান্তসীমার নিম্নে ছিল অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয় অধিক হত –

যে জমি চাষাবাদ হত না, সেই জমি ফসলের দাম বৃদ্ধির কারণে এখন চাষাবাদের আওতায় আসতে পারে। যে জমিটি আগে প্রান্তিক জমি বলে বিবেচিত ছিল তা এখন প্রান্তোর্ধ্ব জমিতে পরিণত হবে। এখন সেই জমিতেও খাজনা পাওয়া যাবে। কাজেই দাম বৃদ্ধির কারণে খাজনা উদ্ভব হতে পারে। যে জমিতে আগে খাজনা দিতে হত না, সেই জমিতে ফসলের দাম বৃদ্ধির কারণে বর্তমানে খাজনা দিতে হচ্ছে। সুতরাং উৎপন্ন দ্রব্যের দাম দ্বারা খাজনা প্রভাবিত হয়।

সিদ্ধান্ত :

দাম বৃদ্ধির কারণে খাজনার উদ্ভব হতে পারে, কিন্তু খাজনা অধিক হলে ফসলের দাম বাড়ে না। ফসলের দাম অন্য কোন বিষয়ের দ্বারা বাড়ে। রিকার্ডো বিশ্বাস করে, খাজনা বাড়লে বা কমলে দামের কোন পরিবর্তন হয় না। এ অবস্থায় রিকার্ডো দাবী করেন যে, খাজনার দ্বারা দাম নির্ধারিত হয় না, বরং দামের দ্বারা খাজনা নির্ধারিত হয়।

সারসংক্ষেপ

ক. খাজনা নির্ধারণে দামের প্রভাব থাকলেও দাম নির্ধারণে খাজনার কোন প্রভাব থাকে না ;

খ. খাজনা বেশী হলে ফসলের দাম বেশী হবে – একথা সত্য নয় বরং ফসলের দাম বেশী হলে খাজনা বেশী হবে;

গ. ফসলের দাম বেড়ে গেলে প্রান্তিক জমির পরিবর্তন ঘটবে। অর্থাৎ যে জমি প্রান্তসীমার নিম্নে ছিল, দাম বৃদ্ধির কারণে সেই জমি চাষের আওতায় আসবে এবং তা প্রান্তিক জমি হিসাবে গণ্য হবে।

অনুশীলনী ১১.৬

নৈর্ব্যক্তি প্রশ্ন

১। রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুযায়ী খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ?

ক. খাজনা বাড়লে দাম বাড়ে
খ. দাম বাড়লে খাজনা বাড়ে
গ. খাজনা ও দামের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই
ঘ. খাজনা বাড়লে দাম বাড়ে এবং দাম বাড়লেও খাজনা বাড়ে।

২। খাজনা কেন দামের অন্তর্গত হয় না?

ক. খাজনা প্রান্তিক ব্যয়ের কোন উপাদান নয়
খ. খাজনা হলো আয় সংক্রান্ত বিষয়
গ. চাহিদা ও যোগানের দ্বারা দাম নির্ধারিত হয়, সেখানে খাজনা কোন উপাদান নয়
ঘ. খাজনা উদ্বৃত্ত আয় বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. খাজনা ও দামের মধ্যে কোন সম্পর্ক নির্দেশ করা যায় কি?

খ. রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে ফসলের দাম বেশী হলে খাজনা বেশী হয়, এ কথাটি কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

গ. কেন খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত হয় না, এ বিষয়ে দু'টি কারণ উল্লেখ করুন।

পাঠ ৭ : খাজনা ও জনসংখ্যার সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- জনসংখ্যা ও খাজনার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা বলতে পারবেন।
- খাজনার উপর জনসংখ্যার প্রভাব ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক তা জানতে পারবেন।
- জনসংখ্যা বাড়লে খাজনা কি সর্বদাই বাড়বে, এ বিষয়ে মন্তব্য করতে পারবেন।

১১.৭.১ খাজনা ও জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ?

জনসংখ্যা ও খাজনার মধ্যে সম্পর্ক নিকট। দেশে জনসংখ্যা বাড়লে খাদ্য শস্যের চাহিদা বাড়ে, তখন খাদ্য শস্যের দাম বাড়ে। শস্যের দাম বাড়লে চাহিদা বাড়ে। উৎকৃষ্ট জমি পাওয়া না গেলে নিকৃষ্ট জমি চাষের আওতায় আনা হয়। এভাবে জনসংখ্যা যতই বাড়তে থাকবে নিকৃষ্ট জমিরও চাহিদা বাড়বে। এর দ্বারা নিকৃষ্ট জমির সাথে উৎকৃষ্ট জমির উর্বরতার ব্যবধানের প্রেক্ষিতে খাজনা বৃদ্ধি পায়। যতই নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর জমিতে চাষাবাদ হতে থাকবে, ততই প্রান্তিক জমির তুলনায় উৎকৃষ্ট জমিগুলোতে খাজনা বাড়তে থাকবে। এভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে খাজনা বৃদ্ধি পাবে। অপরদিকে জনসংখ্যা যদি কোন কারণে হ্রাস পায়, তবে খাদ্যের চাহিদা কমবে। ফলে জমির চাহিদাও কম হবে, কারণ ফসলের দাম কমে যাবে। তখন প্রান্তিক জমির পর্যায় উপরের দিকে স্থানান্তরিত হবে। ফলে নিকৃষ্ট জমির ব্যবধান বাবদ খাজনার পরিমাণ কমে আসে। কাজেই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, জনসংখ্যা বাড়লে অর্থনৈতিক খাজনা বাড়ে এবং জনসংখ্যা কমলে অর্থনৈতিক খাজনা কমবে।

১১.৭.২ জনসংখ্যা বাড়লে প্রান্তিকের উর্ধ্বে অবস্থিত জমিগুলোর উদ্বৃত্ত বাড়বে, ফলে খাজনাও বাড়বে- কিভাবে?

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাজনা প্রাপ্তির মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। ধনাত্মক সম্পর্ক বলতে একমুখী সম্পর্ক বুঝানো হয়। অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যা যদি বাড়ে, তবে খাজনাও বাড়বে। জনসংখ্যা বাড়লে কৃষিপণ্যের চাহিদা বাড়ে। কিন্তু দেশে উৎকৃষ্ট জমির যোগান সীমিত। জনসংখ্যা বাড়লে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় নিকৃষ্ট জমিতে চাষাবাদ শুরু হবে। যতই নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর জমিতে চাষাবাদ হতে থাকবে, ততই কৃষি ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় বাড়ে। তার দ্বারা প্রান্তিকের উর্ধ্বে অবস্থিত জমিগুলোর উদ্বৃত্ত বাড়বে। ফলে প্রান্তিক জমির তুলনায় উৎকৃষ্ট জমিগুলোতে খাজনা বাড়তে থাকবে।

১১.৭.৩ জনসংখ্যা বাড়লে খাজনা কি সর্বদাই বাড়বে?

একটি অর্থনীতির উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাদান খাজনাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে যদি পরিবহন ও যোগাযোগের উন্নতি হয়, প্রযুক্তির যদি উন্নতি ঘটে, তবে এক শক্তির প্রভাবে খাজনা বাড়লেও অপর শক্তির প্রভাবে খাজনা কমতে পারে। যেমন – জনসংখ্যা বাড়লে খাজনা বাড়ার কথা। অপরদিকে পরিবহন ও যোগাযোগের উন্নতি এবং প্রযুক্তি বিকাশের দ্বারা উৎপাদন ব্যয় কমতে পারে, তখন ফসলের দাম কমবে এবং খাজনাও কমবে। একদিকে খাজনা বৃদ্ধি, অপরদিকে খাজনা হ্রাস, এর দ্বারা নীট প্রভাব হয়ত শূন্য (০) হবে। কাজেই জনসংখ্যা বাড়লে খাজনা বাড়বে, এ বিষয়টি সব সময় সত্য নাও হতে পারে। তবে অনেক দেশেই লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, জনসংখ্যা বাড়ছে বলে খাজনাও বাড়ছে। তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় দীর্ঘকালে খাজনার উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলবে, তা আগে থেকেই নিরূপণ করা যায় না।

সারসংক্ষেপ

ক. জনসংখ্যা বাড়লে অর্থনৈতিক খাজনা বাড়ে এবং জনসংখ্যা কমলে অর্থনৈতিক খাজনা কমে।

খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাজনা প্রাপ্তির মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। ধনাত্মক সম্পর্ক বলতে একমুখী সম্পর্ক বুঝানো হয়।

গ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে যদি পরিবহন ও যোগাযোগের উন্নতি হয়, প্রযুক্তির যদি উন্নতি ঘটে তবে জনসংখ্যা বাড়লে খাজনা বাড়বে এ কথাটি সত্য নাও হতে পারে।

অনুশীলনী ১১.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। জনসংখ্যা ও খাজনার মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ?

ক. জনসংখ্যা বাড়লে খাজনা কমে

খ. জনসংখ্যা বাড়লেও খাজনা স্থির থাকে

গ. জনসংখ্যা ও খাজনার মধ্যে কোনই সম্পর্ক নেই

ঘ. জনসংখ্যা বাড়লে খাজনা বাড়ে

২। জনসংখ্যা বাড়লে খাজনা বাড়ে, কারণ –

ক. জনসংখ্যা বাড়লে জমির চাহিদা বাড়ে

খ. জনসংখ্যা বাড়লে সরকার বেশী করে কর ধার্য করে

গ. জনসংখ্যা বাড়লে শ্রমিকের যোগান বাড়ে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. জনসংখ্যা ও খাজনার মধ্যে কোন সম্পর্ক নির্দেশ করা যায় কি?

খ. জনসংখ্যা বেশী হলে প্রান্তিকের ঊর্ধ্বে অবস্থিত জমিগুলোর উদ্বৃত্ত বাড়ে, ফলে খাজনাও বাড়ে – বিষয়টি কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

গ. জনসংখ্যা বাড়লে খাজনা কি সর্বদাই বাড়বে?

মজুরি

ইউনিট ১২

পাঠ ১ : সংজ্ঞা - আর্থিক ও প্রকৃত মজুরি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- মজুরি কি, তা বলতে পারবেন।
- আর্থিক ও প্রকৃত মজুরির সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

১২.১.১ সংজ্ঞা : আর্থিক ও প্রকৃত মজুরি

শ্রমের বিনিময়ে মালিক শ্রমিককে যে পারিশ্রমিক প্রদান করে, তা হলো মজুরি। শ্রম দৈহিক ও মানসিক হতে পারে। কোন শ্রমিক নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদন কাজে অংশ গ্রহণ করে অর্থের হিসাবে যে মজুরি বা বেতন পায়, তাকে আর্থিক মজুরি বলে। আর্থিক মজুরির পরিবর্তে শ্রমিক যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা তার শ্রম প্রদানের বিনিময়ে বা চাকুরির বিনিময়ে ভোগ করতে পারে, তাকে প্রকৃত মজুরি বলে।

আর্থিক মজুরিকে দ্রব্যের আকারে প্রকাশ করলে প্রকৃত মজুরি জানা যায়। যেমন – কোন শ্রমিক যদি আর্থিক মজুরি হিসাবে এক হাজার টাকা পায় এবং চালের দাম যদি কেজি প্রতি ২০ টাকা হয়, তবে চালের মাধ্যমে হিসাবকৃত শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি হবে ৫০ কেজি চাল। এখানে আর্থিক মজুরি হলো ১০০০ টাকা এবং প্রকৃত মজুরি হবে ৫০ কেজি চাল। কাজেই আর্থিক মজুরির ক্রয় ক্ষমতাকে প্রকৃত মজুরি বলা যায়। অনেক সময় শ্রমিক তার কর্মস্থলে নানারকম সুযোগ সুবিধা পায়। যেমন – বিনা ভাড়ায় বাড়ি, বিনা ব্যয়ে বিদ্যুৎ, পানি, চিকিৎসা, বাচ্চাদের শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদি। এসব সুযোগ সুবিধা প্রকৃত মজুরির মধ্যে ধরা হয়। সুতরাং শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি হলো আর্থিক মজুরির ক্রয় ক্ষমতা + অন্যান্য প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা।

শ্রমিকের আর্থিক মজুরি অপেক্ষা প্রকৃত মজুরি বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা পরিমাপে সুবিধাজনকভাবে ব্যবহৃত হয়। আর্থিক মজুরি দ্বারা শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা যায় না। বরং প্রকৃত মজুরি দ্বারা শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

সারসংক্ষেপ

শ্রমের বিনিময়ে মালিক শ্রমিককে যে পারিশ্রমিক প্রদান করে, তা হলো মজুরি। অর্থের হিসাবে যে মজুরি বা বেতন পায়, তাকে আর্থিক মজুরি বলে। আর্থিক মজুরির পরিবর্তে শ্রমিক যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা তার শ্রম প্রদানের বিনিময়ে ভোগ করতে পারে, তাকে প্রকৃত মজুরি বলে।
আর্থিক মজুরিকে দ্রব্যের আকারে প্রকাশ করলে প্রকৃত মজুরি জানা যায়। আর্থিক মজুরি দ্বারা শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা যায় না বরং প্রকৃত মজুরি দ্বারা শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

অনুশীলনী ১২.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। শ্রম ব্যবহারের জন্য নিয়োগকারী মজুরি দেয়, কারণ –
ক. শ্রম মানুষের মূল্যবোধকে জাগ্রত করে।
খ. শ্রম দ্বারা উৎপাদন বাড়ে
গ. শ্রম নিয়োগ করে উৎপাদক ঝুঁকি গ্রহণ করে।
ঘ. শ্রম থেকে উৎপাদক তৃপ্তি পায়।

২। আর্থিক মজুরি হলো –
ক. পরিশ্রমের প্রকৃত মূল্য
খ. শ্রমিকের প্রাপ্ত শেয়ার
গ. শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত মজুরি
ঘ. আর্থিক এককের মাধ্যমে হিসাবকৃত মজুরি

৩। প্রকৃত মজুরি, আর্থিক মজুরির তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ ; কারণ –
ক. প্রকৃত মজুরি হিসাব করা সহজ
খ. আর্থিক মজুরি উঠানামা করে
গ. দ্রব্য ও সেবার মাধ্যমে প্রকৃত মজুরি হিসাব করা হয়, যা জীবনযাত্রার মান নির্দেশক
ঘ. অর্থই অনর্থের মূল

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির সংজ্ঞা উল্লেখ করে কোন্ ধারণাটি অধিক গ্রহণযোগ্য, এ বিষয়ে মন্তব্য করুন।

পাঠ ২ : প্রকৃত মজুরি কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- প্রকৃত মজুরি কি কি উপাদানের উপর নির্ভর করে, তা বলতে পারবেন।
- আর্থিক মজুরি কম থাকলেও প্রকৃত মজুরি কিভাবে বেশি হতে পারে, তা বলতে পারবেন।

১২.২.১ প্রকৃত মজুরি কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি নিম্নের উপাদানগুলোর উপর নির্ভর করে –

১। **আর্থিক মজুরির পরিমাণ :** অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে যদি আর্থিক মজুরি বাড়ে, তবে প্রকৃত মজুরিও বেশি হবে। অর্থাৎ প্রাপ্ত আর্থিক মজুরির মাধ্যমে শ্রমিক পূর্বের তুলনায় বেশি দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারবেন।

২। **দামস্তর :** দামস্তর বৃদ্ধি পেলে আর্থিক মজুরির ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়। তখন প্রকৃত মজুরি হ্রাস পায়। শ্রমিকের আর্থিক মজুরি স্থির থেকে যদি দামস্তর কমে, তবে – শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি বাড়বে।

৩। **নিয়োগের প্রকৃতি :** যদি চাকুরি স্থায়ী হয়, তবে দীর্ঘ সময়ের প্রেক্ষিতে আর্থিক মজুরি কম হলেও প্রকৃত মজুরি বেশি হয়। আবার চাকুরি যদি অস্থায়ী হয় তবে, আর্থিক-মজুরি বেশি থাকলেও প্রকৃত মজুরি কম হয়। এছাড়াও এমন কিছু চাকুরি আছে যা অনেকটা অসম্মানজনক ও অপ্রীতিকর। যেমন – ঝাড়ুদারের কাজ। ঝাড়ুদারের আর্থিক মজুরি এ কারণে বেশি দেওয়া হয়। আবার কিছু চাকুরি আছে, যা ঝুঁকি ও বিপদসংকুল। যেমন – রেলওয়ে ড্রাইভার, পাইলট, কয়লা-খনির শ্রমিক ইত্যাদি। তাদের আর্থিক মজুরি বেশি, কিন্তু প্রকৃত মজুরি বেশি হয় না।

৪। **আনুষঙ্গিক সুবিধা :** কোন কোন নিয়োগ শুধু আর্থিক মজুরির উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে নীট সুবিধা প্রাপ্তির উপরও। আর্থিক মজুরি কম হলেও যদি বাড়তি কাজের সুবিধা থাকে, তবে সেই কাজের প্রকৃত মজুরি বেশি। যেমন – একজন টাইপিষ্ট নির্দিষ্ট সময়ে (অফিসে কাজের পর) বাড়তি টাইপ করে বাড়তি উপার্জনের সুযোগ পায়। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে টাইপিষ্টের আর্থিক মজুরি কম হলেও প্রকৃত মজুরি বেশি। আবার কোন কোন নিয়োগ ক্ষেত্রে কারখানার শ্রমিকরা বিনা মূল্যে রেশন, বাসস্থান, বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা, সন্তানদের শিক্ষা – এসব সুবিধা পেয়ে থাকেন। এ সুবিধাগুলো বিবেচনা করলে দেখা যায় – কোন কোন নিয়োগ ক্ষেত্রে আর্থিক মজুরি কম থাকলেও প্রকৃত মজুরি বেশি।

সারসংক্ষেপ

শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি নিম্নের উপাদানগুলোর উপর নির্ভর করে –

১। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে যদি আর্থিক মজুরি বাড়ে, তবে প্রকৃত মজুরিও বেশি হবে।

২। দামস্তর বৃদ্ধি পেলে প্রকৃত মজুরি হ্রাস পায়।

৩। যদি চাকুরি স্থায়ী হয়, তবে প্রকৃত মজুরি বেশি হয়। অসম্মানজনক ও অপ্রীতিকর কাজ এবং ঝুঁকি ও বিপদসংকুল কাজের আর্থিক মজুরি বেশি, কিন্তু প্রকৃত মজুরি বেশি হয় না।

৪। যদি বাড়তি উপার্জনের বা কাজের সুবিধা থাকে, তবে প্রকৃত মজুরি বেশি হয়। কোন নিয়োগ ক্ষেত্রে শ্রমিকরা বিনা মূল্যে রেশন, বাসস্থান, বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা, সন্তানদের শিক্ষা – এসব সুবিধা পেলে আর্থিক মজুরি কম থাকলেও প্রকৃত মজুরি বেশি হয়।

অনুশীলনী ১২.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দামস্তর কমলে প্রকৃত মজুরি বাড়ে, কারণ –

ক. দাম কমলে আর্থিক মজুরি বাড়ে
খ. দাম কমলে পূর্বের চেয়ে বেশি দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করা যায়
গ. দাম কমলে শ্রমিকরা বেশি কাজ করতে উৎসাহিত হয়
ঘ. দাম কমলে সমগ্র অর্থনীতিতে উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্প্রসারিত হয়।

২। আর্থিক মজুরি কম হলেও প্রকৃত মজুরি বেশি হতে পারে, যদি –

ক. শ্রমিকরা দক্ষ হয়
খ. শ্রমিক সংগঠন দুর্বল থাকে
গ. নিয়োগ স্থায়ী হয়, পরিবেশ উন্নত হয় ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যায়
ঘ. শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া ন্যূনতম থাকে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্রকৃত মজুরি কি কি উপাদানের উপর নির্ভরশীল, সেগুলো উল্লেখ করুন।

পাঠ ৩ : মজুরির পার্থক্য (একই ও বিভিন্ন পেশায়)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- একই পেশায় মজুরির পার্থক্য কেন হয়, তা বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন পেশায় মজুরির পার্থক্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।

১২.৩.১ মজুরির পার্থক্য/তারতম্য (Difference in wages)

সমাজে নিয়োগ ক্ষেত্রে মজুরি হারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সেই পার্থক্যগুলোকে প্রধানতঃ দুটি গ্রুপে ভাগ করা যায় –

ক. একই পেশায় নিযুক্ত শ্রমিক বিভিন্ন মজুরি পেতে পারে। এ ধরনের পার্থক্যকে আনুভূমিক পার্থক্য (Horizontal difference) বলে।

খ. মজুরির হারের মধ্যে পেশাগত পার্থক্য থাকে। বিভিন্ন পেশার শ্রমিক বিভিন্ন মজুরি পেয়ে থাকে। এ ধরনের মজুরি হারের পার্থক্যকে উলম্ব পার্থক্য (Vertical differences) বলে।

১২.৩.২ একই পেশায় মজুরির পার্থক্য (আনুভূমিক পার্থক্য/Horizontal differences)

সম দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকের মজুরি হারের যে পার্থক্য অর্থাৎ যে আনুভূমিক পার্থক্য থাকে তার কারণগুলো নিম্নরূপ :

১। **আর্থিক মজুরির পার্থক্য :** মজুরি হারের মধ্যে আনুভূমিক পার্থক্য প্রকাশ পায় যখন একজন শ্রমিক একটি শিল্প থেকে যে ধরনের বেতন পায়, তার তুলনায় একই ধরণের শ্রমিক আর একটি শিল্প থেকে হয়ত ভিন্ন মজুরি পায়। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রকৃত মজুরির পার্থক্য নাও থাকতে পারে। যে শিল্প শ্রমিক বেশি আর্থিক মজুরি পায়, সে হয়ত বাড়তি কাজের সুবিধা পায়না। অথচ একই ধরনের শ্রমিক অপর শিল্পে মজুরি কম পেলেও বাড়তি সুবিধা পেতে পারে। কাজেই বিভিন্ন শিল্পে সুবিধা প্রদানের মধ্যে তফাৎ থাকতে পারে। আর তার ভিত্তিতে সমদক্ষতা সম্পন্ন শ্রমিকের আর্থিক মজুরি বিভিন্ন হতে পারে।

২। **শ্রমিকের আনুভূমিক গতিশীলতার অভাব :** একই রকম দক্ষতা সম্পন্ন একই পেশার শ্রমিক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মজুরি পাওয়ার আর একটি কারণ হলো শ্রমিকের আনুভূমিক গতিশীলতার অভাব। গতিশীলতা বলতে এক স্থান থেকে আর একটি স্থানে, এক শিল্প থেকে অপর শিল্পে নিয়োগ পরিবর্তনকে বুঝানো হয়। শ্রমের যদি পূর্ণ গতিশীলতা থাকে, তবে সমস্ত ফার্মে সম দক্ষতা সম্পন্ন একই পেশাগত শ্রমিক যদি সমান আর্থিক মজুরি নাও পায়, তবু প্রকৃত মজুরি সেখানে সমান হবে।

৩। একই পেশায় মহিলা-পুরুষ ভেদে মজুরি ভিন্ন হতে পারে। যেমন – অফিসে পুরুষ রিসেপসনিস্ট/সেক্রেটারির তুলনায় মহিলা রিসেপসনিস্ট/সেক্রেটারি বেশি মজুরি পেতে পারে। নার্সিং পেশায় পুরুষের তুলনায় মহিলা নার্স বেশি মজুরি পেতে পারে। আবার ড্রাইভিং পেশায় মহিলার তুলনায় পুরুষ ড্রাইভার বেশি মজুরি পেতে পারে।

১২.৩.৩ মহিলারা পুরুষের তুলনায় কম মজুরি কেন পায়?

১। মহিলাদের পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব বেশি থাকে। কিন্তু পুরুষদেরকে নির্দিষ্ট সময় পারিবারিক কাজে ব্যয় করতে হয় না। যিনি নিয়োগকারী তিনি লক্ষ্য করেন যে, মহিলারা পরিবারের প্রতি অধিক যত্নবান হওয়ায় চাকুরি স্থলে বেশি সময় ও মনোযোগ দিতে পারেন না। এ কারণে তাদের কম মজুরি দেওয়া হয়।

২। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের দর কষাকষির ক্ষমতা কম। শ্রমিক সংঘ গঠনে পুরুষদের ভূমিকা বেশি। শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট বিষয়ে পুরুষদের ভূমিকা বেশি। কাজেই মালিকরা মহিলাদের কম মজুরি দিয়ে খুব একটা বিরোধিতার সম্মুখিন হয় না।

৩। সমাজের কিছু কিছু চাকুরী আছে যেখানে মহিলা শ্রমিক নিয়োগ করা হয় না। যেমন – পাইলট, ড্রাইভার, গার্ড এসব পদে পুরুষদের নিয়োগ করা পছন্দনীয় বলে মনে করা হয়। এইসব ক্ষেত্রে পুরুষদের মজুরি স্বাভাবিকভাবেই বেশি।

জাতিসংঘ কর্তৃক সারা বিশ্বে নারী স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়েছে। বহু দেশে সংবিধানে নারী পুরুষের সম অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু অনেক অনুন্নত দেশের সামাজিক অবকাঠামো দুর্বল থাকায় সেই অধিকার বাস্তবায়িত হয় না। পুরুষের ন্যায় সমান দক্ষ হলেও মহিলারা কম মজুরি পায়, এটি একটি বাস্তব সত্য।

১২.৩.৪ ভিন্ন ভিন্ন পেশায় মজুরির তারতম্য (মজুরি হারের উলম্ব পার্থক্য)

মজুরি হারের মধ্যে পেশাগত পার্থক্য থাকে। যেমন – একজন ব্যারিষ্টার, একজন টাইপিষ্ট অপেক্ষা অনেক বেশি টাকা উপার্জন করেন। একজন কম্পাউন্ডার অপেক্ষা একজন ডাক্তার অনেক বেশি উপার্জন করেন। একজন চিত্রতারকা একজন ক্যামেরাম্যান অপেক্ষা অনেক বেশি উপার্জন করেন। এ ধরনের মজুরি হারের পার্থক্যকে উলম্ব পার্থক্য (Vertical differences) বলে। বিভিন্ন পেশায় মজুরির পার্থক্য দেখা দেওয়ার কারণ উল্লেখ করা যাক।

১। **দক্ষতার পার্থক্য :** দক্ষ শ্রমিক অবশ্যই অদক্ষ শ্রমিকের তুলনায় বেশি মজুরি পায়। যেমনভাবে নিকৃষ্ট জমির তুলনায় উৎকৃষ্ট জমি অধিক খাজনা পায়।

২। **সুযোগের অভাব :** সমাজে আর্থিক বৈষম্য থাকে। বিত্তবান ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা ও ট্রেনিং প্রদান করা সম্ভব হয়। স্বাভাবিকভাবেই নিয়োগ ক্ষেত্রেও তাদের সুবিধা বেশি। অর্থাৎ তারা অধিক মজুরি পায়।

৩। কিছু কিছু কাজ আছে যেসব ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য সময় ও অর্থ যথেষ্ট ব্যয় করতে হয়। যেমন প্রকৌশলী এবং চিকিৎসক হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রত্যাশা থাকে অধিক মজুরি পাবার।

৪। **প্রতিযোগিতার অভাব :** কিছু কিছু পেশা আছে যেখানে প্রতিযোগীর সংখ্যা অনেক। আবার কিছু কিছু পেশা আছে যেখানে প্রতিযোগী কম। যেমন – সাধারণ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর চাকুরি পাবার জন্য প্রতিযোগির সংখ্যা অনেক। ফলে সেখানে মজুরিও কম। আবার বিশেষজ্ঞ পদে নিয়োগ পেতে প্রতিযোগির সংখ্যা নগণ্য। তাদের মজুরিও যথেষ্ট। এভাবে প্রতিযোগিতার কারণে মজুরি কম বেশি হয়।

উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা গেল যে, আনুভূমিক (একই পেশায়) ও উলম্ব (ভিন্ন ভিন্ন পেশায়) ব্যবধানের প্রেক্ষিতে মজুরির হার বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ ছাড়াও দেশ ভেদে শ্রমিকের মজুরির মধ্যেও পার্থক্য থাকে। একজন জাপানী শ্রমিকের তুলনায় একজন বাংলাদেশী শ্রমিক অনেক কম মজুরি পায়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমিকের অবাধ চলাচলের সুযোগ না থাকায়

বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের মধ্যে মজুরির পার্থক্য থাকে। একটি দেশের ভিতরে জনগণের মেধা ও দক্ষতার পার্থক্য, জনসংখ্যার পরিবর্তন, স্ত্রী পুরুষ ভেদে, বর্ণ ভেদে মজুরির ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। আবার একই দেশে সময়ের ভিত্তিতে মজুরি হারের পার্থক্য দেখা দেয়। যেমন – ফসল কাটার সময় বাংলাদেশ শ্রমিকের মজুরি বেড়ে যায়।

সারসংক্ষেপ :

১। একই পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরির মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তাকে আনুভূমিক পার্থক্য (Horizontal differences) অপরদিকে বিভিন্ন শ্রমিক বিভিন্ন মজুরি পেয়ে থাকে, এ ধরনের মজুরি হারের পার্থক্যকে উলম্ব পার্থক্য (Vertical differences) বলে।

২। একই পেশায় শ্রমিকদের মজুরির পার্থক্য (আনুভূমিক পার্থক্য/Horizontal differences) থাকার কারণ হলো – বিভিন্ন শিল্পে বাড়তি সুবিধার মধ্যে পার্থক্য থাকার কারণে আর্থিক মজুরি কম-বেশি হতে পারে। একই রকম দক্ষতাসম্পন্ন একই পেশার শ্রমিক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মজুরি পাওয়ার আর একটি কারণ হলো শ্রমিকের আনুভূমিক গতিশীলতার অভাব। অর্থাৎ এক স্থান থেকে অপর স্থানে, এক শিল্প থেকে অপর শিল্পে শ্রমিক সহজে নিয়োগ পরিবর্তন করতে পারে না। আবার একই পেশায় মহিলা-পুরুষ ভেদে মজুরি ভিন্ন হতে পারে।

মহিলারা পুরুষের তুলনায় কম মজুরি পায়, কারণ –

মহিলাদের পরিবার প্রতি পালনের দায়িত্ব বেশি থাকে বলে চাকুরিস্থলে বেশি সময় ও মনোযোগ দিতে পারেন না। এ কারণে তাদেরকে কম মজুরি দেওয়া হয়। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের দর কষাকষির ক্ষমতা কম। সমাজের কিছু কিছু চাকুরী আছে যেখানে মহিলা শ্রমিক নিয়োগ করা হয় না।

৩। বিভিন্ন পেশায় মজুরির পার্থক্য দেখা দেওয়ার কারণ হলো : দক্ষ শ্রমিক অবশ্যই অদক্ষ শ্রমিকের তুলনায় বেশি মজুরি পায়। উপযুক্ত শিক্ষা ও ট্রেনিং প্রাপ্তরা অধিক মজুরি পায়। পেশাগত দক্ষতা অর্জন ব্যয় বহুল ও সময় সাপেক্ষ হলে সেই পেশায় অধিক মজুরি পাবার প্রত্যাশা থাকে। প্রতিযোগিতার কারণে মজুরি কম বেশি হয়।

অনুশীলনী ১২.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। একই পেশায় শ্রমিকদের মজুরির মধ্যে পার্থক্য (আনুভূমিক পার্থক্য/Horizontal differences) থাকার কারণ হলো –

ক. মালিকপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন মজুরি প্রদানের পক্ষপাতী

খ. শ্রমিকদের মজুরির মধ্যে পার্থক্য থাকলে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকবে

গ. একই পেশা হলেও শ্রমিকদের গতিশীলতার অভাব থাকে

২। মহিলারা পুরুষের তুলনায় কম মজুরি পায়, কারণ –
ক. পুরুষরা অধিক দক্ষ
খ. মহিলাদের অধিক মজুরির চাহিদা কম
গ. একই পেশা হলেও শ্রমিকদের মধ্যে গতিশীলতার অভাব থাকে

৩। বিভিন্ন পেশায় মজুরির পার্থক্য দেখা দেওয়ার কারণ হলো –
ক. বিভিন্ন পেশায় দক্ষতার পার্থক্য, শিক্ষা ও ট্রেনিং এর পার্থক্য
খ. বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিদের মানসিকতার পার্থক্য
গ. মালিকপক্ষ শ্রেণী বৈষম্য বজায় রাখতে সচেষ্ট

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। একই পেশায় ও ভিন্ন ভিন্ন পেশায় মজুরির মধ্যে কেন পার্থক্য দেখা দেয়, এ প্রসঙ্গে ২টি করে কারণ উল্লেখ করুন।

পাঠ ৪ : বাংলাদেশের স্বল্প মজুরি হারের কারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের স্বল্প মজুরি হারের কারণ কি কি, তা বলতে পারবেন।

১২.৪.১ বাংলাদেশে স্বল্প মজুরি হারের কারণ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল/অনুন্নত দেশ। শিল্প ও সেবা ক্ষেত্র এখানে অনুন্নত। শ্রমিক সংগঠনগুলো চিন্তাভাবনার দিক থেকে তেমন আধুনিক নয়। বাংলাদেশে কেন শ্রমিকরা স্বল্প মজুরি পায়, তার কয়েকটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। বাংলাদেশে শ্রম বাজারে চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের যোগান বেশি। অত্যধিক জনসংখ্যার দেশ হিসাবে বাংলাদেশে অত্যন্ত কম মজুরিতে শ্রমিক পাওয়া যায়। চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হওয়াতে অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশে শ্রমিকের মজুরি কম।

২। বাংলাদেশে রাজনৈতিক চিন্তাবিদরাও ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে একমত হতে পারেননি।

৩। শ্রমিক সংগঠনগুলো তেমন জোরালোভাবে মজুরি বৃদ্ধির দাবীকে কার্যকর করে তুলতে পারেনি। শ্রমিক সংগঠনের নেতারা অনেক সময়ই সাধারণ শ্রমিকদের ফাঁকি দিয়ে মালিক পক্ষের সাথে আঁতাত করে। ফলে সাধারণ শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হয় না।

৪। শিক্ষার অভাব মজুরি নিম্ন হওয়ার অন্যতম কারণ। শ্রমিকরা যদি সঠিকভাবে প্রযুক্তিগত শিক্ষা পেত এবং আন্তর্জাতিকভাবে নিজেদের চিন্তা চেতনাকে প্রসারিত করতে পারত, তবে নিজেদের মজুরি বৃদ্ধির দাবীকে কার্যকর করে তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু বাংলাদেশে সঠিক অর্থে শ্রমিকরা সে রকম শিক্ষিত বা দক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি।

৫। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে দ্রব্য উৎপাদনের আগ্রহী হয়েছে এই কারণে যে, বাংলাদেশে শ্রমিকদের কম মজুরি তারা দিতে পারবে। তাতে তাদের অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে উৎপাদন করলে উৎপাদন ব্যয় কম হবে এবং মুনাফাও বেশি হবে। ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবীকে কার্যকর করতে তুলতে আন্তর্জাতিক উদ্যোগের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান বাড়ানোর জন্য ও কাজের পরিবেশ উন্নত করার জন্য মালিক, সরকার ও শ্রমিক সংগঠন সবাইকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে। দারিদ্রের নিম্নসীমায় অবস্থানকারী শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি কার্যকর করতে হবে। উন্নয়নের প্রক্রিয়ার সাথে মজুরি বৃদ্ধির পদক্ষেপও নিতে হবে। তবেই উন্নয়ন ও জনকল্যাণ একই সাথে চলতে পারবে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে কেন শ্রমিকরা স্বল্প মজুরি পায়, তার কয়েকটি কারণ হলো – বাংলাদেশে শ্রম বাজারে চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের যোগান বেশি। অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশে শ্রমিকের মজুরি কম হয়। বাংলাদেশে রাজনৈতিক চিন্তাবিদরাও ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে একমত হতে পারেন নি। শ্রমিক সংগঠনগুলো তেমন জোরালোভাবে মজুরি বৃদ্ধির দাবীকে কার্যকর করে তুলতে পারেনি। শিক্ষার অভাবে শ্রমিকরা নিজেদের চিন্তা চেতনাকে তেমনভাবে প্রসারিত করতে পারেনি, তাই তাদের মজুরি বৃদ্ধির দাবীকে কার্যকর করে তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবীকে কার্যকর করে তুলতে আন্তর্জাতিক উদ্যোগের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

অনুশীলনী : ১২.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। বাংলাদেশে শ্রমিকরা স্বল্প মজুরি পায়, কারণ –
ক. মালিকরা বেশি মজুরি দিতে আগ্রহী নয়
খ. বাংলাদেশে শ্রমিকরা স্বল্প মজুরিতে তুষ্ট
গ. শ্রমিকের চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি

২। শিক্ষার অভাবই বাংলাদেশে শ্রমিকদের স্বল্প মজুরি প্রাপ্তির জন্য দায়ী, কারণ –
ক. শিক্ষার অভাবে শ্রমিকরা তুলনামুলক মজুরি সম্পর্কে সচেতন হয় না
খ. শিক্ষার অভাবে শ্রমের বাজার সঠিকভাবে কার্যকর হয় না
গ. শিক্ষা না থাকলে সমাজ অনগ্রসর থাকে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে স্বল্প মজুরি প্রসঙ্গে ৪টি কারণ উল্লেখ করুন।

পাঠ ৫ : শ্রমিক সংঘ-এর সংজ্ঞা ও কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- শ্রমিক সংঘ কি, তা বলতে পারবেন।
- শ্রমিক সংঘের কার্যাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।

১২..৫.১ শ্রমিক সংঘ-এর সংজ্ঞা

শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে স্থায়ী সংগঠন তারা গঠন করে, তাকে শ্রমিক সংঘ বলে। শ্রমিকদের অবস্থার অবনতি রোধ করা অথবা অবস্থার উন্নতি সাধন করা শ্রমিক সংঘের অন্যতম লক্ষ্য। শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সর্বদাই স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকে। শ্রমিকরা চায় বেশি মজুরি পেতে এবং মালিক চায় তাদেরকে যথাসম্ভব কম মজুরি দিয়ে উৎপাদন কাজ সমাধা করতে। শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি আদায় করার জন্য দলবদ্ধভাবে একটি সংঘ গড়ে তোলে, আর তাই হলো শ্রমিক সংঘ।

এভাবেও বলা যায়, শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য যে স্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলা হয়, তাকে শ্রমিক সংঘ বলে। শ্রমিকের যোগান ও শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণে শ্রমিক সংঘ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শ্রমিকের যোগান দামের প্রতি শ্রমিক সংঘ বিশেষ নজর রাখে। আবার শ্রমিকের দাবীও শ্রমিক সংঘের দ্বারা উত্থাপিত হয়।

১২.৫.২ শ্রমিক সংঘের কার্যাবলী (Functions of Trade Union)

শ্রমিক সংঘের কার্যাবলীকে প্রসারিত দৃষ্টিকোণ থেকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় – সৌভ্রাতৃত্বমূলক কাজ এবং সংগ্রাম মূলক কাজ। শ্রমিকের কল্যাণ ও কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্য শ্রমিক সংঘ এমন কিছু কাজ পরিচালনা করে যাতে তাদের পারস্পরিক প্রীতি দৃঢ় হয়। তারা সামাজিক অনুষ্ঠান পরিচালনা, খেলাধুলা পরিচালনা, চিকিৎসা ও নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনার মত কাজ করতে পারে। অপরদিকে শ্রমিক ছাঁটাই রোধ করার জন্য বা ন্যায্য মজুরি আদায় করার জন্য মালিকের সঙ্গে দর কষাকষি করে। এ ধরনের কাজকে শ্রমিক সংঘের সংগ্রামমূলক কাজ বলা যায়। শ্রমিক সংঘের বিভিন্ন কাজ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। **উপযুক্ত মজুরি আদায় :** মালিক স্বেচ্ছায় শ্রমিকদের মজুরি বাড়াতে চায় না। শ্রমিকরা শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে মালিকের কাছে উপযুক্ত মজুরি দাবী করেন। শ্রমিক সংঘের প্রচেষ্টায় মালিকের নিকট থেকে উপযুক্ত মজুরি আদায় করা সম্ভব হয়।

২। **দর কষাকষি :** শ্রমিক সংঘের অন্যতম কাজ হলো মালিকের সাথে দর কষাকষিতে অবতীর্ণ হওয়া। কোন শ্রমিক এককভাবে মালিকের নিকট থেকে তার দাবি আদায় করতে পারে না। শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে মালিকের উপর চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব। দর কষাকষির মাধ্যমে শ্রমিক সংঘ কিছু ছাড় দেয় এবং কিছু আদায় করে।

৩। **চাকুরির নিরাপত্তা :** শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদেরকে চাকুরির নিরাপত্তা প্রদান করে। মালিক অনেক সময় ব্যক্তিগত কারণে শ্রমিকদের ছাঁটাই করতে উদ্যত হয়। কিন্তু অন্যায়ভাবে ছাঁটাইকে শ্রমিক সংঘ প্রতিরোধ করে।

৪। **শ্রমিক নির্যাতন প্রতিরোধ :** শ্রমিক সংখ্যায় বেশি, কিন্তু মালিক পক্ষ সংখ্যায় কম হলেও নির্যাতনের হাতিয়ার মালিকের হাতেই। মালিক অন্যায়ভাবে শ্রমিকের উপর অনেক দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে। মালিকের পক্ষে শ্রমিক শোষণের বিনিময়ে অধিক মুনাফা লুটে নেওয়া সম্ভব।

৫। **কাজের পরিবেশের উন্নয়ন :** শ্রমিক সংঘ সব সময় নজর রাখে শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ যেন উন্নত থাকে। কাজের সময়সীমা হ্রাস, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, পদোন্নতি, বোনাস ও পেনসন ইত্যাদির দাবি মালিকের কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া শ্রমিক সংঘের অন্যতম কাজ।

৬। **শ্রমিক আন্দোলন :** দেশে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার পশ্চাতে শ্রমিক সংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মালিক পক্ষের সাথে যখন আলোচনা ব্যর্থ হয়, তখন শ্রমিক সংঘ মালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। তারা কর্মবিরতি ও ধর্মঘটের মত বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে।

৭। **অন্যান্য কাজ :** শ্রমিকদের স্বার্থে শ্রমিক সংঘ বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজ করে। যেমন – শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানের ব্যবস্থা, বিনোদনের ব্যবস্থা, পেনসন ও বীমা ব্যবস্থা এসব সুবিধা আদায়ের জন্য শ্রমিক সংঘ সচেষ্ট থাকে।

সারসংক্ষেপ

১। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা তথা ন্যায্য মজুরিসহ সুনির্দিষ্ট দাবী আদায় করার জন্য শ্রমিকরা যে স্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলে, তাই হলো শ্রমিক সংঘ।

২। শ্রমিক সংঘের কার্যাবলীকে সৌভ্রাতৃত্বমূলক কাজ এবং সংগ্রামমূলক কাজ এই দু'ভাগ ভাগ করা যায়। সৌভ্রাতৃত্বমূলক কাজের মধ্যে আছে – শ্রমিকের কল্যাণ বাড়ানোর জন্য শ্রমিক সংঘের বিভিন্ন কাজ। যেমন – বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান পরিচালনা, খেলাধুলা পরিচালনা, চিকিৎসা ও নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা ইত্যাদি।

৩। শ্রমিক সংঘের সংগ্রামমূলক কাজের মধ্যে আছে –
মালিকের নিকট থেকে উপযুক্ত মজুরি আদায়। শ্রমিক সংঘের অন্যতম কাজ হলো মালিকের সাথে দর কষাকষিতে অবতীর্ণ হওয়া, শ্রমিকদের চাকুরির নিরাপত্তা প্রদান করা, শ্রমিক নির্যাতন প্রতিরোধ করা, শ্রমিকদের কাজের উন্নত পরিবেশ বজায় রাখা এবং প্রয়োজনে দেশে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

অনুশীলনী ১২.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। শ্রমিক সংঘ হলো এমন একটি সংগঠন, যা –
ক. শ্রমিক ও মালিকদের যৌথ একটি ক্লাব
খ. অস্থায়ী একটি প্রতিষ্ঠান, যার সদস্য হলো সব ধরনের শ্রমিক
গ. শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা তথা ন্যায্য মজুরিসহ সুনির্দিষ্ট দাবী আদায়ের জন্য স্থায়ীভাবে পরিচালিত

২। শ্রমিক সংঘকে একটি সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান বলা হয়, কারণ –
ক. তারা যুদ্ধকালে ভূমিকা পালন করে
খ. ন্যায্য মজুরি আদায়ের জন্য মালিকপক্ষের সাথে দর কষাকষিতে লিপ্ত হয় ও আন্দোলনের ডাক দেয়
গ. শ্রমিকদের আলস্য নয়, পরিশ্রমই হলো সংগ্রামের চাবিকাঠি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। শ্রমিক সংঘের ৪টি কাজ উল্লেখ করুন।

পাঠ ৬ : বাংলাদেশে শ্রমিক সংগঠন - বর্তমান অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশে শ্রমিক সংগঠনের বর্তমান অবস্থার উপর আলোকপাত করতে পারবেন।

১২.৬.১ বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠন

শ্রমজীবি মানুষের কাছে শ্রমিক সংগঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এর দ্বারা শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে দাবী আদায়ের আন্দোলন করে। বাংলাদেশে উৎপাদন ও সেবার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠন আছে। কোথাও আবার একই প্রতিষ্ঠানে একাধিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রবণতা দেখা যায়। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শ্রমিক সংগঠন মিলে আবার একটি বৃহৎ শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়, যা সমগ্র দেশব্যাপী প্রসারিত হতে দেখা যায়। বাংলাদেশে মালিক পক্ষের সাথে শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ে বোঝাপড়া পরিচালিত হয় শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমে। বাংলাদেশে পরিবহন, পাটকল ও বস্ত্রকল, ব্যাংক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠন ব্যাপকভাবে তৎপর। দাবী আদায়ের প্লাটফর্মে ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে। পাটকল শ্রমিকরা বা সূতা কল শ্রমিকরা বা পরিবহন শ্রমিকরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দাবী নিয়ে সরকার ও মালিক পক্ষের সাথে দরকষাকষিতে লিপ্ত হয়। সফলতা ও ব্যর্থতা উভয়ই তাদের আছে। সরকার ও মালিক পক্ষ প্রায় সময়ই এক পক্ষে চলে আসে। অপরপক্ষে থাকে শ্রমিক সংগঠনগুলো। বাংলাদেশে রাজনৈতিক কারণে শ্রমিক সংগঠনগুলো অনেক সময় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। নিজেদের দাবী দাওয়া আদায়ের পরিবর্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে তারা অংশ গ্রহণ করে। ফলে শ্রমিক সংগঠনগুলো নিজেদের সুনির্দিষ্ট দাবী দাওয়া আদায়ে পিছিয়ে পড়ে। শ্রমিক সংগঠনগুলো অনেক সময় এমনভাবে পরিচালিত হয়, যাতে শিল্প-কলকারখানা, পরিবহন ও ব্যাংক সেক্টরে যথেষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের পরিবর্তে কেবল মজুরি বৃদ্ধির দাবী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দাবী আদায় করতে গিয়ে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা দারুণভাবে ব্যাহত হয়। কাজেই উৎপাদনের স্বার্থে মালিক ও সরকারের সাথে শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠনগুলোর সহ-অবস্থান অত্যন্ত জরুরী। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করে শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব হওয়া প্রয়োজন কিভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করে মালিক ও শ্রমিক উভয়ের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা যায়। তবে মালিক ও সরকার পক্ষকেও সহানুভূতির সাথে শ্রমিক সংগঠনের আইনগত সুবিধা প্রদান করে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনগুলোর সাথে দেশীয় সংগঠনগুলোকে উন্নত করে তুলতে হবে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে উৎপাদন ও সেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠন আছে। বাংলাদেশে পরিবহন, পাট, সুতা ও বস্ত্রকল, ব্যাংক ব্যবস্থা এসব ক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠন ব্যাপকভাবে তৎপর। দাবী আদায়ের প্লাটফর্মে ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে। সফলতা ও ব্যর্থতা উভয়ই তাদের আছে। বাংলাদেশে অনেক সময় শ্রমিক সংগঠনগুলো নিজেদের সুনির্দিষ্ট দাবী-দাওয়া আাদয়ে পিছিয়ে পড়ে। উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের পরিবর্তে কেবল মজুরি বৃদ্ধির দাবী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দাবী আদায় করতে গিয়ে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। তবে আইনানুগ সুবিধা প্রদান করতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনগুলোর সাথে সম্পৃক্ত করে দেশীয় শ্রমিক সংগঠনগুলোকে উন্নত করে তুলত হবে।

অনুশীলনী ১২.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। বাংলাদেশে শ্রমিক সংগঠনের কাঠামোগত দুর্বলতার কারণ –
  ক. শ্রমিকরা সংগঠন টিকে থাকার বিরোধী
  খ. শ্রমিকরা কেউ কাউকে মানতে রাজী নয়
  গ. অতিমাত্রায় রাজনৈতিক কোন্দল

২। বাংলাদেশে শ্রমিক সংগঠনের মূল দাবী হওয়া উচিত –
  ক. অতিরিক্ত মজুরি বৃদ্ধি
  খ. কাজ কমিয়ে মজুরি যতটা বাড়ানো যায়
  গ. শ্রমকে উৎপাদনমুখী করে মুনাফা বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমিকের শেয়ার বৃদ্ধিতে মালিককে রাজি করানো
  ঘ. রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সঠিক বাস্তবায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে শ্রমিক সংগঠনের সাফল্য ও ব্যর্থতার উপর মন্তব্য করুন।

সুদ

ইউনিট ১৩

পাঠ ১ : সুদের সংজ্ঞা - মোট ও নীট সুদ

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সুদ কি, তা বলতে পারবেন।
- মোট সুদের উপাদানগুলো জানতে পারবেন।
- মোট সুদ ও নীট সুদের পার্থক্য কিরূপ, তা বলতে পারবেন।

১৩.১.১ সুদের সংজ্ঞা (Definition of Interest)

ঋণ গ্রহিতা মূলধন বা ঋণ ব্যবহার বাবদ ঋণ দাতাকে যে মূল্য প্রদান করে, তাকে সুদ বলে। কাজেই সুদ হলো ঋণ ব্যবহারের মূল্য। অন্যান্য উপকরণের ন্যায় মূলধনেরও উৎপাদন ক্ষমতা আছে। উৎপাদন ক্ষমতা থাকার কারণে মূলধনের প্রয়োজন পড়ে। মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা আছে বলেই মূলধন বাবদ সুদ দিতে হয়। সুদকে এভাবেও সংজ্ঞায়িত করা যায় যে – সুদ হলো অপেক্ষার পুরস্কার। অর্থাৎ বর্তমান ভোগ ত্যাগের বিনিময়ে ভবিষ্যতে যে প্রাপ্তি আশা করা হয়, তাই সুদ। কোন ঋণ দাতা যখন ঋণ গ্রহিতাকে মূলধন বা অর্থ প্রদান করে, তখন ঋণ দাতা সেই অর্থভিত্তিক ভোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখে। সেই বঞ্চনার বিনিময়ে ভবিষ্যতে সে যে বাড়তি অর্থ প্রাপ্তি আশা করে, তাকে সুদ বলা যায়। জন ম্যানার্ড কেইনস বলেন যে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নগদ অর্থ হাত ছাড়া করার (তারল্য পছন্দ পরিত্যাগের) পুরস্কার হলো সুদ। সুদ সংক্রান্ত বিভিন্ন সংজ্ঞা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, আর্থিক মূলধন (money capital) ব্যবহারের বিনিময়ে প্রদত্ত মূল্য (পুরস্কার) হলো সুদ।

১৩.১.২ মোট সুদ ও নীট সুদ (Gross interest and Net interest)

মোট সুদ :

নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গৃহীত ঋণের জন্য ঋণ গ্রহীতা ঋণ দাতাকে যে বাড়তি অর্থ প্রদান করে, তাকে মোট সুদ বলে। মোট সুদের মধ্যে চারটি উপাদান থাকে :

ক. **নীট বা বিশুদ্ধ সুদ :** মূলধন যা ঋণ হিসাবে নেওয়া হয়, সেই মূলধনের আর্থিক মূল্য হিসাব করে যে অর্থ প্রদান করতে হয়, তা হলো বিশুদ্ধ সুদ।

খ. **ঝুঁকি বহনের বীমা :** ঋণ দাতা যখন ঋণ দেয়, তখন সে ঝুঁকি নেয়। কাজেই ঝুঁকির কারণে ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে ঋণদাতা বিশুদ্ধ সুদের চেয়ে বাড়তি কিছু প্রাপ্তি গ্রহণ করে। এই বাড়তি প্রাপ্তি মোট সুদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

গ. **ঋণ আদায় সংক্রান্ত অসুবিধার বিনিময় মূল্য :** ঋণ দাতা ঋণ দেওয়ার কারণে কিছু কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে। যেমন, কাউকে ৫ বছরের জন্য ঋণ দিলে সেই সময়ের আগে তার অর্থ প্রয়োজন পড়লেও ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে তা ফেরৎ পায় না। কাজেই একবার ঋণ দিলে তাকে বেশ কিছু সময়ের জন্য অসুবিধায় থাকতে হয়। সেই অসুবিধার মূল্য হিসাবে কিছু অর্থ প্রাপ্তি মোট সুদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ঘ. **ব্যবস্থাপনার পুরস্কার :** প্রত্যেক ঋণ দাতাকে ঋণের ব্যবস্থা করতে গিয়ে কিছু ব্যয়ভার বহন করতে হয়। যেমন – তার হিসাবের খাতা রাখতে হয়, সময় দিতে হয় এবং ঋণ গ্রহীতার দুয়ারেও তাকে ঘুরতে হয়। এসব কারণে বিশুদ্ধ বা নীট সুদের উপরে আরো কিছু অর্থ প্রাপ্তি ঋণ দাতা আশা করে। সুতরাং ব্যবস্থাপনার পুরস্কার হিসাবে কিছু অর্থ প্রাপ্তি মোট সুদে অন্তর্ভুক্ত হয়। কাজেই মোট সুদ বলতে নীট বা বিশুদ্ধ সুদসহ পারিশ্রমিক হিসাবে দাবীকৃত বাড়তি অর্থ – এসবের সমন্বিত প্রাপ্তি বুঝানো হয়। এভাবে বলা যায় যে, নীট বা বিশুদ্ধ সুদসহ ঋণ দাতার আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ প্রত্যাশিত প্রাপ্তিকে মোট সুদ বলে।

নীট সুদ :

মোট সুদের একটি অংশ হলো নীট সুদ। ঋণ দাতার অপরাপর প্রত্যাশিত আনুষঙ্গিক প্রাপ্তি বিবেচনার বাইরে রেখে কেবল ঋণ হিসাবে গৃহীত আর্থিক মূলধন ব্যবহারের বিনিময়ে যে সুদ ঋণ গ্রহীতা ঋণ দাতাকে দেয়, তাকে নীট সুদ বলে।

মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা আছে। সেই উৎপাদন ক্ষমতার জন্য মূলধন ব্যবহারকারী নীট মূল্য বা সুদ প্রদান করে। মোট সুদ থেকে ঋণ দান সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক ব্যয়, যেমন – ঝুঁকি বহনের ব্যয় ও আদায় সংক্রান্ত অসুবিধার মূল্য – এসব বাদ দেওয়ার পর যে সুদ থাকে, তাকে নীট সুদ বলা হয়। যেমন – কোন ঋণ দাতা ১০ হাজার টাকা মোট সুদ হিসাবে পেলে সেই ১০ হাজার টাকাই নীট সুদ হিসাবে বিবেচ্য নয়। ধরা যাক, ঋণ দাতার আনুষঙ্গিক ব্যয় হলো ৪ হাজার টাকা। সেই ১০ হাজার টাকা থেকে আনুষঙ্গিক ব্যয় হিসাবে ৪ হাজার টাকা বাদ দিলে ৬ হাজার টাকা হবে নীট সুদ।

১৩.১.৩ মোট সুদ ও নীট সুদের মধ্যে পার্থক্য (Differences between gross interest and net interest)

মোট সুদ ও নীট সুদের সংজ্ঞা থেকে তাদের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নির্দিষ্ট সময় অন্তে ঋণগ্রহীতা ঋণ দাতাকে আসলের অতিরিক্ত যে মোট অর্থ প্রদান করে, তা হলো মোট সুদ। অপরদিকে মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতাকে কেবল বিবেচনায় রেখে যে অর্থ প্রদান করা হয়, তাকে নীট সুদ বলে। মোট সুদ ও নীট সুদের পার্থক্যগুলো, যা সংজ্ঞা থেকে উপলব্ধি করা যায়, সেগুলো হলো –

১। মোট সুদ একটি প্রসারিত ধারণা। নীট সুদ মোট সুদেরই একটি অংশ।

২। মোট সুদের মধ্যে নীট সুদ ছাড়াও আনুষঙ্গিক কিছু ব্যয় বা প্রাপ্তি বিবেচনা করা হয়। যেমন, ঋণ দাতার পারিশ্রমিক, ঝুঁকি বহনের মুনাফা, নগদ অর্থ হাত ছাড়া করার ফলে সৃষ্ট অসুবিধাজনিত ব্যয় এসব বাবদ বাড়তি কিছু অর্থ নীট সুদের সাথে যোগ হওয়ার পর মোট সুদ পাওয়া যায়। কাজেই নীট সুদ হলো এসব আনুষঙ্গিক ব্যয় ব্যতিরেকে বিশুদ্ধ সুদ।

৩। সময়, পরিস্থিতি ও স্থান ভেদে মোট সুদ ভিন্ন হতে পারে। কারণ আনুষঙ্গিক ব্যয় বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিভিন্ন হয়। কিন্তু একটি দেশে সর্বত্র নীট সুদ একই থাকতে পারে।

৪। মোট সুদের একটি অংশ হিসাবে নীট সুদ বিবেচিত হওয়ায় মোট সুদের তুলনায় নীট সুদ কম হয়।

মোট সুদের উপাদান (Elements of gross interest)

মোট সুদের ৪টি উপাদান উল্লেখযোগ্য :

১। নীট সুদ,
২। ঋণ বাবদ ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার,
৩। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ব্যয় বহনের পুরস্কার,
৪। অন্যান্য অসুবিধাজনিত ব্যয় বহনের পুরস্কার।

সারসংক্ষেপ :

১। সুদের সংজ্ঞা থেকে যে বিষয়গুলো জানা যায় :
ক. সুদ হলো ঋণ ব্যবহারের মূল্য
খ. সুদ হলো অপেক্ষার পুরস্কার
গ. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নগদ অর্থ হাত ছাড়া করার (তারল্য পছন্দ পরিত্যাগের) পুরস্কার হলো সুদ।

২। মোট সুদের উপাদানগুলো :
মোট সুদের মধ্যে চারটি উপাদান থাকে :
ক. নীট বা বিশুদ্ধ সুদ
খ. ঝুঁকি বহনের বীমা
গ. ঋণ আদায় সংক্রান্ত অসুবিধার বিনিময় মূল্য
ঘ. ব্যবস্থাপনার পুরস্কার

সুতরাং নীট বা বিশুদ্ধ সুদসহ ঋণ দাতার আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ প্রত্যাশিত প্রাপ্তিকে মোট সুদ বলে।

৩। নীট সুদ : মোট সুদ থেকে ঋণ দান সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক ব্যয়, যেমন – ঝুঁকি বহনের ব্যয়, ব্যবস্থাপনার ব্যয় ও আদায় সংক্রান্ত অসুবিধার মূল্য – এসব বাদ দেওয়ার পর যে সুদ থাকে, তাকে নীট সুদ বলা যায়।

অনুশীলনী ১৩.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। সুদ বলতে কি বুঝানো হয় ?
ক. আর্থিক মূলধন ব্যবহারজনিত মূল্য
খ. বাড়ি, দোকান, গাড়ী এসবের ভাড়া
গ. সরকারকে প্রদত্ত কর
ঘ. ভোগের মূল্য

২। সুদের মাঝে ঝুঁকিগ্রহণজনিত উপাদান জড়িত থাকে, কারণ –
ক. ঋণদাতার দাবীকৃত সুদ প্রদানে ঋণগ্রহীতা রাজী নাও হতে পারে
খ. ঋণদাতার প্রদত্ত আসল টাকা সুদসহ খোয়া যেতে পারে

গ. সরকার সুদগ্রহণ বা প্রদানের জন্য শাস্তি প্রদান করতে পারে
ঘ. ব্যাংকের কাজকর্ম সন্তোষজনক নাও হতে পারে

৩। মোট সুদ ও নীট সুদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো –
ক. নীট সুদের অন্তর্গত উপাদান হলো মোট সুদ
খ. মোট সুদ পায় ঋণদাতা ও নীট সুদ পায় ঋণ গ্রহীতা
গ. মোট সুদ একটি প্রসারিত ধারণা এবং নীট সুদ তারই অংশ
ঘ. মোট সুদ টাকার অংকে এবং নীট সুদ শতাংশ হিসাবে প্রকাশ পায়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক. সুদের সংজ্ঞা প্রদান করুন।
খ. মোট সুদের উপাদানগুলো উল্লেখ করুন।
গ. মোট সুদ ও নীট সুদের মধ্যে তিনটি পার্থক্য নির্দেশ করুন।

পাঠ ২ : সুদ কেন দেওয়া হয় ? (Why interest is paid)

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সুদ প্রদানের কারণ কি, তা বলতে পারবেন।
- ভোগ বিরতি ও অপেক্ষার পুরস্কার হিসাবে কেন সুদ দেওয়া হয়, তা বলতে পারবেন।
- সময় পছন্দের পুরস্কার ও তারল্য পছন্দ পরিত্যাগের পুরস্কার হিসাবে সুদকে কেন গণ্য করা হয়, তা বলতে পারবেন।

১৩.২ সুদ প্রদানের কারণ

সুদ কেন দেওয়া হয়, এই প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদরা যে সব যুক্তি দেখান সেগুলো নিম্নরূপ :

১। **মূলধনের উৎপাদনশীলতা :** সুদ প্রদানের যুক্তি হিসাবে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মূলধনের উৎপাদনশীলতাকে উল্লেখ করেন। মূলধন দ্বারা উৎপাদন বাড়ে। আর তাই মূলধন ব্যবহারের মূল্য বাবদ সুদ দেওয়া হয়। মূলধন না থাকলে যতটা উৎপাদন হয়, তার চেয়ে মূলধনের সাহায্যে অনেক বেশী উৎপাদন হতে পারে। যেমন – একজন ব্যক্তি ছিপের সাহায্যে যতটা মাছ ধরতে পারে, তার চেয়ে মূলধন ব্যবহার করে জাল ও নৌকা দ্বারা আরও বেশি মাছ ধরা তার পক্ষে সম্ভব। একইভাবে, সেলাই মেশিন ছাড়া একজন যতটা কাপড় সেলাই করতে পারবে, তার চেয়ে সেলাই মেশিন দিয়ে বেশি কাপড় সেলাই করা সম্ভব। কাজেই মূলধন দ্বারা উৎপাদন যদি বাড়ে, তবে সেই মূলধন ব্যবহার বাবদ বা ঋণ গ্রহণ বাবদ সুদ প্রদান করতে আপত্তি থাকার কথা নয়।

২। **ভোগ বিরতির পুরস্কার :** ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ বম্-বয়ার্ক ভোগ বিরতি তত্ত্বকে সুদ প্রদানের অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন – কোন ব্যক্তি সাধারণত ভবিষ্যৎ ভোগের তুলনায় বর্তমান ভোগকে বেশি পছন্দ করেন। কাজেই বর্তমান ভোগ ত্যাগের বিনিময়ে যদি ঋণ দাতা ঋণ প্রদান করে, তবে বিনিময়ে সে নিশ্চয়ই কিছু প্রাপ্তি আশা করবে। কাজেই ঋণ দাতার বর্তমান ভোগ ত্যাগের বিনিময় মূল্য হিসাবে ঋণ গ্রহীতা সুদ দেয়।

৩। **অপেক্ষার পুরস্কার :** অধ্যাপক মার্শাল সুদের কারণ হিসাবে 'অপেক্ষা' তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেন। এই তত্ত্ব মূলতঃ বম্-বয়ার্কের ভোগ বিরতি তত্ত্বের অনুরূপ। তবে মার্শাল বলেন, সুদকে ভোগ বিরতির পুরস্কার না বলে ঋণ দাতার অপেক্ষা পুরস্কার বলা উচিত। ঋণ দাতা বর্তমান ভোগ স্থগিত রেখে ভবিষ্যৎ ভোগের জন্য অপেক্ষা করে। কাজেই সেই অপেক্ষা কালের বিনিময়ে ঋণদাতা অর্থ প্রাপ্তি আশা করে।

৪। **সময় পছন্দের পুরস্কার :** অধ্যাপক ফিসার সময় পছন্দ তত্ত্বকে সুদ প্রদানের কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন। মানুষ বর্তমানকে বেশি পছন্দ করে। আর সেই বর্তমান ভোগ থেকে ঋণ দাতাকে বিরত রাখতে হলে তাকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে সুদ দিতে হবে। বর্তমানের প্রতি মানুষের আগ্রহ যত বেশি হবে, অর্থাৎ 'সময় পছন্দ' যত বেশি হবে, ততই বেশি হারে ঋণ দাতাকে সুদ দিতে হবে। বর্তমানের ব্যয় স্থগিত রেখে ঋণ দাতাকে যদি ঋণ প্রদানে উৎসাহিত করতে হয়, তবে তাকে সুদের প্রলোভন দেখাতে হবে।

৫। **নগদ অর্থ হাত ছাড়া করার পুরস্কার :** জন ম্যানার্ড কেইনস সুদ সংক্রান্ত তারল্য পছন্দ তত্ত্ব প্রদান করেন। তিনি মনে করেন, নগদ পছন্দ পরিত্যাগ করার পরিবর্তে মানুষ

সুদ আশা করে। কাজেই ঋণ দাতাকে নগদ অর্থ ত্যাগ করতে তখনই রাজি করানো যাবে, যখন ঋণদাতা সুদ পাবে বলে আশা করবে।

৬। **মূলধন যোগানের স্বল্পতা :** সাধারণত ঋণ বা মূলধনের চাহিদার তুলনায় যোগান কম থাকে। কাজেই উৎপাদন কাজে মূলধনের মূল্য হিসাবে সুদের উৎপত্তি হয়। কাজেই মূলধনের স্বল্পতার কারণে সুদ দিতে হয়।

সারসংক্ষেপ

সুদ প্রদানের কারণগুলো :

১। মূলধনের উৎপাদনশীলতার কারণে সুদ দিতে হয়।
২। ঋণ দাতার বর্তমান ভোগ ত্যাগের বিনিময় মূল্য হিসাবে ঋণ গ্রহীতা সুদ দেয়।
৩। ঋণদাতা বর্তমান ভোগ স্থগিত রেখে ভবিষ্যত ভোগের জন্য অপেক্ষা করে। কাজেই সেই অপেক্ষা কালের বিনিময়ে ঋণদাতা অর্থ প্রাপ্তি আশা করে।
৪। বর্তমানের প্রতি মানুষের আগ্রহ যত বেশি হবে, অর্থাৎ 'সময় পছন্দ' যত বেশি হবে, ততই বেশি হারে ঋণ দাতাকে সুদ দিতে হবে।
৫। নগদ পছন্দ পরিত্যাগ করার পরিবর্তে মানুষ সুদ আশা করে।
৬। মূলধনের স্বল্পতার কারণে সুদ দিতে হয়।

অনুশীলনী ১৩.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। মূলধন ব্যবহারের জন্য সুদ দিতে হয়, কারণ –
ক. মূলধন দ্বারা ভোগ বাড়ে
খ. মূলধন দ্বারা উৎপাদন বাড়ে
গ. মূলধন নিয়োগ করে উৎপাদক ঝুঁকি গ্রহণ করে
ঘ. মূলধন থেকে অনুপার্জিত আয় আসে বলে।

২। সুদ হলো একটি পুরস্কার, যা পাওয়া যায় –
ক. অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য
খ. মূলধন সঠিকভাবে প্রয়োগের জন্য
গ. বর্তমান ভোগ ত্যাগ ও ভবিষ্যত ভোগের উদ্দেশ্যে অপেক্ষার জন্য
ঘ. প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার জন্য।

৩। নগদ (তারল্য) পছন্দ পরিত্যাগ করার পরিবর্তে মানুষ সুদ আশা করে। এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রেখেছেন –
ক. মার্শাল খ. রিকার্ডো
গ. স্মিথ ঘ. কেইনস

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। সুদ কেন দেওয়া হয়, এ প্রসঙ্গে ৪টি কারণ উল্লেখ করুন।

পাঠ ৩ : সুদের হারের তারতম্যের কারণ
(Causes of Difference in the Rate of Interest)

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বিভিন্ন রকম ঋণের জন্য বিভিন্ন রকম সুদ কেন দেখা যায়, তা বলতে পারবেন।
- ঋণের মেয়াদ, ঋণের পরিমাণ, ঋণের ঝুঁকি, ঋণের জামিন কিভাবে সুদের হারের মধ্যে তারতম্য ঘটায়, তা বলতে পারবেন।
- ঋণগ্রহীতার সুনাম কিভাবে সুদের হারের তারতম্য ঘটায়, তা বলতে পারবেন।

১৩.৩.১ সুদের হারের মধ্যে কেন তারতম্য থাকে?

ব্যবহারের তারতম্য অনুসারে ঋণ বিভিন্ন রকম হয়। আবার বিভিন্ন রকম ঋণের জন্য বিভিন্ন হারে সুদ দিতে হয়। সুদের হারের তারতম্যের মূল কারণগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। **ঋণের মেয়াদ :** ঋণের মেয়াদের মধ্যে তারতম্য থাকে বলে সুদের হার বিভিন্ন হয়। ঋণ যদি স্বল্প মেয়াদের জন্য নেয়া হয়, তবে কম সুদ এবং দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ঋণ নিলে বেশি সুদ দিতে হয়।

২। **ঋণের পরিমাণ :** বেশি পরিমাণ ঋণের জন্য কম সুদের হার এবং কম পরিমাণ ঋণের জন্য বেশি সুদের হার ধার্য হয়। কাজেই ঋণের পরিমাণের পার্থক্যের কারণে সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।

৩। **ঋণের ঝুঁকির পার্থক্য :** বিভিন্ন ঋণের বিভিন্ন রকম ঝুঁকি থাকে। যেসব বিনিয়োগের ঝুঁকি বেশি, সেক্ষেত্রে ঋণ বাবদ বেশি সুদ আদায় করা হয়। অপরদিকে ঝুঁকির মাত্রা কম হলে সেখানে কম সুদ আদায় করা হয়।

৪। **ঋণের জামিন :** ঋণ দাতা ঋণ প্রদানের পরিবর্তে জামানত বা বন্ধকী রাখতে পারে। জামানত বা বন্ধকী দ্রব্যের মূল্যের উপর নির্ভর করে সুদের হার কম বেশি হয়। যদি মূল্যবান ও সহজে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য জামানত হিসাবে রাখা হয়, তবে ঋণ বাবদ কম সুদ ধার্য হতে পারে। বিপরীত অবস্থায় জামানতকৃত দ্রব্যের মূল্য কম হলে সুদের হার বেশি হয়।

৫। **ঋণের ব্যবস্থাপনা ব্যয় :** ঋণ দাতাকে ঋণ সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনার জন্য খরচ বহন করতে হয়। যেমন, হিসাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় বেশি হলে ঋণ বাবদ বেশি সুদ দাবী করতে পারে। অপরদিকে ব্যবস্থাপনা ব্যয় কম হলে সুদের হার কম হয়।

৬। **বিনিয়োগ সংক্রান্ত সুবিধা :** যে সব ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা কম সেখানে মূলধনের চাহিদাও কম। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই ঋণ বাবদ সুদের হার কম হয়। অপরদিকে যেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সুযোগ সুবিধা যথেষ্ট, সেখানে মূলধনের চাহিদা বেশি থাকে এবং সুদের হারও সেখানে বেশি হয়।

৭। **ঋণ গ্রহিতার সুনাম :** ঋণ গ্রহিতা যদি আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে মর্যাদাবান হন, তবে ঋণ দাতা ঋণ প্রদানকে তেমন ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করে না। এক্ষেত্রে ঋণ দাতা কম সুদে ঋণ প্রদান করতে প্রস্তুত থাকে। অপর দিকে ঋণ গ্রহিতা যদি একজন সাধারণ ব্যক্তি হয়, তবে ঋণদাতাও ঋণ প্রদানের সময় ভাবনা চিন্তা করে এবং সুদও বেশি দাবী করেন।

৮। **প্রতিযোগিতার মাত্রা :** ঋণের বাজারে মাত্রাগত দিক থেকে প্রতিযোগিতা বেশি হলে ঋণ দাতা বাধ্য হয়ে কম সুদে ঋণ দেয়। অপরদিকে প্রতিযোগিতা যত কম অর্থাৎ ঋণের বাজারে একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকলে সুদের হার বেশি হয়।

৯। **মূলধনের গতিশীলতা :** মূলধন যদি অধিক গতিশীল হয়, তবে সুদের হারে তেমন তারতম্য ঘটবে না। অর্থাৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মূলধন যদি সহজে চলাচল করতে পারে, তবে বিভিন্ন স্থানে সুদের হারের মধ্যে তফাৎ থাকবে না। অপর পক্ষে মূলধনের চলাচল সহজ না হলে বিভিন্ন স্থানের মধ্যে সুদের হার বিভিন্ন রকম হয়।

১০। **সরকার আরোপিত কর :** দেশের বিভিন্ন রকম ঋণপত্র থাকতে পারে। সেই ঋণপত্রগুলোর উপর সরকার যদি বিভিন্ন ধরনের কর আরোপের উদ্যোগ নেয়, তবে সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিবে।

১১। **সরকার গৃহীত আর্থিক ও সুদ নীতি :** সরকার তার রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুদের হার বিভিন্ন করতে সুপারিশ করে। দেশে যদি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে কিংবা কৃষি ক্ষেত্রে সরকার অগ্রাধিকার প্রদান করে, তবে সেখানে বিনিয়োগ করার জন্য কম সুদের হার ধার্য করার ব্যবস্থা সরকার নিতে পারে। আবার যেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সরকারের দৃষ্টিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে কাম্য নয়, সেখানে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করতে সরকার ব্যাংক ও ঋণ দান প্রতিষ্ঠানকে বেশি সুদ ধার্য করার নির্দেশ দিতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, ঋণের প্রকৃতি, ব্যবহার, পরিমাণ, ব্যবস্থাপনা, প্রতিযোগিতার মাত্রা ও সরকারী নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।

সারসংক্ষেপ

(ক) সুদের হারের তারতম্যের কারণগুলো :

১। স্বল্প মেয়াদে কম সুদ এবং দীর্ঘ মেয়াদে বেশি সুদ আদায় করা হয়।

২। বেশি পরিমাণ ঋণের জন্য কম সুদের হার এবং কম পরিমাণ ঋণের জন্য বেশি সুদের হার ধার্য হয়।

৩। যেসব বিনিয়োগের ঝুঁকি বেশি, সেক্ষেত্রে ঋণ বাবদ বেশি সুদ এবং ঝুঁকির মাত্রা যেখানে কম, সেখানে কম সুদ আদায় করা হয়।

৪। জামানত বা বন্ধকী দ্রব্যের মূল্যের উপর নির্ভর করে সুদের হার কম বেশি হয়।

৫। ঋণের ব্যবস্থাপনা ব্যয় বেশি হলে সুদের হার বেশি, ব্যবস্থাপনা ব্যয় কম হলে সুদের হার কম হয়।

৬। বিনিয়োগ সুযোগ সুবিধা বেশি থাকলে মূলধনের চাহিদা বেশি থাকে এবং সুদের হারও বেশি হয়।

৭। মর্যাদাবান ঋণ গ্রহীতাকে কম সুদে এবং সাধারণ ঋণ গ্রহীতাকে বেশি সুদে ঋণ দেওয়া হয়।

৮। প্রতিযোগিতা বেশি হলে কম সুদ এবং প্রতিযোগিতা কম থাকলে সুদের হার বেশি হয়।

৯। মূলধনের চলাচল সহজ না হলে বিভিন্ন স্থানের মধ্যে সুদের হার বিভিন্ন হয়।

১০। সরকারের কর আরোপের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

১১। সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুদের হার বিভিন্ন করতে সুপারিশ করে।

(খ) সার কথা হলো : ঋণের প্রকৃতি, ব্যবহার, পরিমাণ, ব্যবস্থাপনা, প্রতিযোগিতার মাত্রা ও সরকারী নীতির প্রভাবে সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়।

অনুশীলনী : ১৩.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। ঋণের মেয়াদের মধ্যে পার্থক্য থাকলে সুদের হার পৃথক হয়, কারণ –

ক. মেয়াদের পার্থক্য থাকলে ঋণের ঝুঁকির মধ্যেও পার্থক্য থাকে

খ. মেয়াদের পার্থক্য থাকলে ঋণের টাকা ব্যবহারে ক্ষেত্রে জটিলতা বাড়ে

গ. ঋণগ্রহীতা সময় সম্পর্কে বেশি সচেতন

ঘ. সময় মেয়াদের প্রেক্ষিতে ঋণদাতার উপর সরকারী চাপ বাড়ে

২। জামানত বা বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য বেশি হলে সুদের হার কম হয়, কারণ –
ক. জামানতকৃত দ্রব্যের মূল্য বেশি হলে ঋণ দাতার সামাজিক মর্যাদা বাড়ে
খ. জামানতকৃত দ্রব্যের মূল্য বেশি হলে ঋণ গ্রহীতার কষ্ট উপলব্ধি করা যায়
গ. জামানতকৃত দ্রব্যের মূল্য বেশি হলে ঋণ দাতার ঋণ বাবদ প্রদত্ত ঝুঁকি কমে
ঘ. জামানতকৃত দ্রব্যের মূল্য বেশি হলে ঋণের চাহিদা কমে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। সুদের মধ্যে কেন তারতম্য দেখা দেয়, এ প্রসঙ্গে ৪টি কারণ উল্লেখ করুন।

পাঠ ৪ : সুদ কি কখনো শূন্য হতে পারে?

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সুদ কেন শূন্য হতে পারে না, তা বলতে পারবেন।
- উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য হলে দামও শূন্য হবে, এ যুক্তি সুদের হারের ক্ষেত্রে কেন খাটে না, তা বলতে পারবেন।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ কিভাবে সুদের হারকে শূন্য হতে দেয় না, তা বলতে পারবেন।
- বিনা সুদে মানুষ সঞ্চয় করতে চায় না, এমতাবস্থায় মূলধনের যোগান বজায় রাখতে হলে সুদ কিছু না কিছু থাকতে হবে। এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন।
- তারল্য ফাঁদ ধারণাটি কিভাবে সুদকে শূন্য হতে দেয় না, তাও বলতে পারবেন।

১৩.৪.১ সুদের হার শূন্য হতে পারে কি?

১। উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য বলে দামও শূন্য হবে, এ যুক্তি সুদের হারের ক্ষেত্রে খাটে না। সুদের হার শূন্য হতে পারে কিনা এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের মনে প্রশ্ন জাগে। উৎপাদন ক্ষেত্রে কোন উপাদান নিয়োগ যতই বাড়ানো হয়, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা কমে আসে এবং স্বাভাবিক নিয়মে একটি অবস্থায় তা শূন্য ও পরবর্তীতে ঋণাত্মক হতে পারে। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও দাম সমান হয় বলে বিবেচ্য উপকরণের দামও শূন্য হওয়ার কথা। মূলধন যেহেতু একটি উপকরণ এবং মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ক্রমহ্রাসমান, তাই যুক্তি দেখানো হতে পারে যে, মূলধনের দাম হিসাবে সুদের হারও এক পর্যায়ে শূন্য হবে। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদদের অনেকেই এই যুক্তি মানতে রাজি নন।

২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সুদের হারকে শূন্য হতে দেয় না। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাকে যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই সুদের হার শূন্য হতে পারে না। বাস্তব জীবনে মানুষ যতই মূলধন সংগ্রহ করে ও বিনিয়োগ করে, ততই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হতে শুরু হয়। তবে এর মধ্যে মানুষের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন চলতে থাকে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ দ্বারা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির কার্যকারিতাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও জাপানের মত দেশগুলোতে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাকে যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছে। মূলধনের যোগান যদি স্থির হারে বজায় রাখা যায়, তবে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও সুদের হার হ্রাস না পেয়ে বরং একটি উচ্চতর পর্যায়ে অবস্থান করতে পারে। কাজেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ যেহেতু ক্রমচলমান, তাই সুদের হার শূন্য হতে পারে না।

৩। গতিশীল অর্থনীতিতে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য হতে পারে না। তাই সুদের হারও শূন্য হতে পারে না। সুদের হার শূন্য হতে পারে না এ প্রসঙ্গে যারা যুক্তি দেখান, তারা বলেন যে, মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা কেবল স্থিতিশীল অর্থনীতিতে কমতে কমতে শূন্য হতে পারে, কিন্তু গতিশীল অর্থনীতিতে এরূপ ভাবনার কোন কারণ নেই। গতিশীল সমাজ বলতে সেই অবস্থাকে বুঝানো হয়, যেখানে নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন যেমন আছে, তেমনি আছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এসব গতিময়তার প্রেক্ষিতে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য হতে পারে না।

৪। ধনাত্মক সঞ্চয় থাকতে হলে সুদের হার শূন্য হতে পারে না। বিনা সুদে মানুষ সঞ্চয় করতে চায় না, এমতাবস্থায় মূলধনের যোগান বজায় রাখতে হলে সুদ কিছু না কিছু থাকতে হবে। দেশের সমস্ত আয় যদি ভোগের ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয়, তবে সঞ্চয় হতে পারে না। আর সঞ্চয় না হলে, মূলধন বা ঋণের কোন প্রশ্ন উঠে না। এমতাবস্থায় সুদ নামক বিষয়টিই থাকতে পারে না। কাজেই ধনাত্মক সঞ্চয় থাকতে হলে সুদের হার শূন্য হতে পারে না। কোন কোন অর্থনীতিবিদ সুদের হার শূন্য হওয়ার বিষয়টি এভাবেও ব্যাখ্যা করতে চান যে, দেশের সমস্ত আয় যদি ভোগের ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয়, তবে সঞ্চয় হতে পারে না। আর সঞ্চয় না হলে, মূলধন বা ঋণের কোন প্রশ্ন উঠে না। এমতাবস্থায় সুদ নামক বিষয়টিই থাকতে পারে না।

৬। ঋণদানকারীরা তাদের ব্যবসায় প্রত্যাশার শূন্য পর্যায়ে নেমে যাবে, তা কখনও হতে পারে না। কাজেই সুদের হার কখনও শূন্য হতে পারে না।

৭। তারল্য ফাঁদ ধারণাটি সুদকে শূন্য হতে দেয় না। তারল্য (নগদ) পছন্দের ফলে সুদের হার কখনও শূন্যে পরিণত হতে পারে না। স্বল্প সুদের হারে তারল্য পছন্দ অসীম স্থিতিস্থাপকতায় অর্থাৎ তারল্য ফাঁদে পৌঁছায়। ফলে সুদের হার শূন্যে (০) পরিণত হওয়ার পূর্বেই তারল্য ফাঁদ মানুষকে নগদ টাকার সবটাই হাতে ধরে রাখতে প্রেরণা যোগায়। এ ধারণাটি প্রদান করেছেন লর্ড জে. এম. কেইনস।

উপরের আলোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে, বিভিন্ন কারণে সুদের হার শূন্য হতে পারে না। তবে অস্বাভাবিক অবস্থা বিবেচনা করলে সুদের হার শূন্য হতেও পারে। যেমন –

ক. মোট আয়ের সবটাই যদি মানুষ ভোগের ক্ষেত্রে ব্যয় করে, তবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কোনটাই হতে পারে না। এ ধরনের অস্বাভাবিক অবস্থা থাকলে সুদের হার শূন্য হতে পারে। তবে এ ধরনের অবস্থা দেখা দিবে না বলে আশা করা যায়।

খ. একটি সমাজের যদি অতিমাত্রায় মূলধন সংগৃহীত হয়, তবে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য হতে পারে। তখন সুদের হারও শূন্য হতে পারে। তবে এ ধরনের অস্বাভাবিক বা অতিমাত্রায় মূলধন সংগ্রহ কল্পনা করা যায় না। তাই এসব বিষয় বিবেচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সুদের হার শূন্য হতে পারে না।

সারসংক্ষেপ

ক. সাধারণতঃ সুদের হার শূন্য হতে পারে না।

১। উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য হলে দামও শূন্য হবে, এ যুক্তি সুদের হারের ক্ষেত্রে খাটে না।

২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সুদের হারকে শূন্য হতে দেয় না। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাকে যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই সুদের হার শূন্য হতে পারে না।

৩। গতিশীল অর্থনীতিতে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য হতে পারে না। তাই সুদের হারও শূন্য হতে পারে না।

৪। বিনা সুদে মানুষ সঞ্চয় করতে চায় না, তবে অস্বাভাবিক অবস্থা বিবেচনা করলে সুদের হার শূন্য হতেও পারে। যেমন – মোট আয়ের সবটাই যদি মানুষ ভোগ করে ফেলে অথবা অস্বাভাবিক বা অতিমাত্রায় মূলধন সংগ্রহ হলে সুদের হার শূন্য হতে পারে। তবে এ ধরনের অবস্থা দেখা দিবে না বলে আশা করা যায়। সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সুদের হার সাধারণতঃ শূন্য হতে পারে না; মূলধনের যোগান বজায় রাখতে হলে সুদ কিছু না কিছু থাকতে হবে।

৫। ঋণদানকারীরা তাদের ব্যবসায় প্রত্যাশার শূন্য পর্যায়ে নেমে যেতে পারে না। কাজেই

সুদের হার কখনও শূন্য হতে পারে না।
৬। সুদের হার শূন্যে (০) পরিণত হওয়ার পূর্বেই তারল্য ফাঁদ মানুষকে নগদ টাকার সবটাই হাতে ধরে রাখতে প্রেরণা যোগায়।

অনুশীলনী ১৩.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। সুদের হার শূন্য হতে পারে না, কারণ –
ক. সুদ একটি আর্থিক প্রাপ্তি, সেই প্রাপ্তি কখনও শূন্য হতে হয় না
খ. ব্যাংক ব্যবসা দেউলিয়া হয়ে পড়বে
গ. প্রযুক্তির বিকাশ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনকে শূন্য হতে দেয় না
ঘ. শূন্য কথাটি অর্থহীন

২। জামানত বা বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য বেশি হলে সুদের হার কম হয় কারণ –
ক. জামানতকৃত দ্রব্যের মূল্য বেশি হলে ঋণ দাতার সামাজিক মর্যাদা বাড়ে
খ. জামানতকৃত দ্রব্যের মূল্য বেশি হলে ঋণ গ্রহীতার কষ্ট উপলব্ধি করা যায়
গ. জামানতকৃত দ্রব্যের মূল্য বেশি হলে ঋণ দাতার ঋণ বাবদ অর্থের ঝুঁকি কমে
ঘ. জামানতকৃত দ্রব্যের মূল্য বেশি হলে ঋণের চাহিদা কমে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সুদের হার কেন শূন্য হতে পারে না এ প্রসঙ্গে ৪টি কারণ উল্লেখ করুন।

মুনাফা

ইউনিট ১৪

পাঠ ১ : মুনাফার সংজ্ঞা - মোট ও নীট মুনাফা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- মুনাফা কি, তা বলতে পারবেন।
- মোট মুনাফার উপাদানগুলো নির্দেশ করতে পারবেন।
- মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার পার্থক্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।

১৪.১.১ মুনাফা কি?

উৎপাদন ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা পরিশ্রম করে। সেই পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত পুরস্কারকে সাধারণভাবে মুনাফা বলে। বাজারে কোন দ্রব্য বিক্রয় করে যে মোট আয় পাওয়া যায়, তা থেকে সেই দ্রব্যের উপাদান খরচ বাদ দিতে হয়। দ্রব্য উৎপাদন করতে একটি ফার্ম বা উদ্যোক্তা জমি, শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে। সেই সঙ্গে নিয়োজিত হয় উদ্যোক্তার পরিশ্রম। উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করে যে মোট আয় পাওয়া যায়, তা থেকে ব্যয় হিসাবে জমির খাজনা, শ্রমিকের মজুরি ও মূলধনের সুদ বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই হলো উদ্যোক্তার মুনাফা। জমির খাজনা, শ্রমিকের মজুরি ও মূলধনের সুদকে চুক্তিভিত্তিক ব্যয় বলা যায়। নিয়োগকৃত উপাদানগুলোর জন্য চুক্তিভিত্তিক অর্থ প্রদানের পর বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে মুনাফা বলে। এ যুক্তিতে মুনাফাকে অবশিষ্ট আয় (residual income) বলা যায়। উল্লেখ করা যায় যে, উক্ত অবশিষ্ট আয় বা মুনাফা শূন্য (০) বা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যে কোনটি হতে পারে।

অধ্যাপক মার্শাল মুনাফার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, "উদ্যোক্তার ব্যবসা পরিচালনা কাজের পারিশ্রমিক হলো মুনাফা"। অধ্যাপক টাউজিগের মতে, "উদ্যোক্তার দক্ষতা ভিত্তিক পারিশ্রমিককে মুনাফা বলা হয়।" অধ্যাপক সুম্পিটার বলেন, "উদ্যোগ ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত পুরস্কার হলো উদ্যোক্তার মুনাফা"।

১৪.১.২ মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা

উদ্যোক্তার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে ব্যক্ত বা স্পষ্ট ব্যয় (explicit cost) বাদ দিলে যা থাকে, তাকে মোট মুনাফা বলা হয়। উৎপাদনের মালিক বাইরে থেকে (অর্থাৎ নিজের নয়, এমন) উপাদান ক্রয় ও নিয়োগ করতে পারে। সেই উপাদানগুলো জমি, শ্রম ও মূলধন হতে পারে। সেই জমির জন্য খাজনা, শ্রমের মজুরী এবং মূলধনের জন্য সুদ দিতে হয়। কাজেই ব্যক্ত বা স্পষ্ট ব্যয় হিসাবে জমির খাজনা, শ্রমিকের মজুরি ও মূলধনের সুদ গণ্য হয়। একজন সংগঠক তার উৎপাদন ও ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করে নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন এক বছরে) মোট আয় হিসাবে ২০ লক্ষ টাকা পায়। তার ব্যক্ত ব্যয় হিসাবে ১২ লক্ষ টাকা ধরা হলো। তাহলে বাকী ৮ লক্ষ টাকা হলো সেই উদ্যোক্তার মোট মুনাফা। কাজেই মোট মুনাফা = মোট

বিক্রয় লব্ধ অর্থ বা মোট আয় – মোট ব্যয় (অবচয়সহ বাইরের বিভিন্ন উপকরণ বাবদ ব্যক্ত ব্যয়)।

নীট মুনাফা

উৎপাদনের মালিক বাইরের উপাদান ছাড়াও নিজস্ব উপাদান উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োগ করতে পারে। সেই নিজস্ব উপাদানগুলোর জন্য মালিক স্পষ্টভাবে ব্যয় না করলেও সেই উপাদানগুলোর পাওনা থাকে। সেই অন্তর্নিহিত পাওনা বাবদ ব্যয় ধরা হলে সেই ব্যয়কে অন্তর্নিহিত বা অব্যক্ত ব্যয় (implicit cost) বলে। মোট মুনাফা থেকে অব্যক্ত ব্যয় বাদ দিলে নীট মুনাফা পাওয়া যায়। উদ্যোক্তার নিজস্ব জমি থাকলে তার খাজনা, নিজস্ব মূলধন খাটালে তার জন্য সুদ এবং নিজের পরিশ্রম বাবদ যে উপার্জন মজুরি হিসাবে হত সেই মজুরি এ সবকে অব্যক্ত ব্যয় বুঝানো হয়। এসব অব্যক্ত ব্যয়কে মোট মুনাফা থেকে বাদ দিলে প্রকৃত অবস্থায় উদ্যোক্তার নীট মুনাফা সম্পর্কে জানা যায়। একটি উদাহরণ বিবেচনা করা যাক, একজন উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ী উৎপাদন বা ব্যবসা ক্ষেত্রে নিজের জমি ও মূলধন নিয়োগ করলেন এবং সেই সঙ্গে নিজে সেখানে পরিশ্রমও করলেন। উদ্যোক্তা ৫ লক্ষ টাকা মোট মুনাফা হিসাবে বছর শেষে অর্জন করলেন। আপাতদৃষ্টে মুনাফার অংক দেখে মনে হতে পারে যথেষ্ট মুনাফা তিনি অর্জন করেছেন। কিন্তু প্রকৃত চিত্র ভিন্ন হতে পারে। যেমন সেই ব্যবসায়ী নিজের জমি অন্য কাউকে ভাড়া দিলে বছরে এক লক্ষ টাকা ভাড়া পেতেন। কিন্তু তিনি ভাড়া না দিয়ে নিজের ব্যবসা ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করেন। তাই সেই এক লক্ষ টাকাকে তার মুনাফা হিসাবে প্রাপ্ত পাঁচ লক্ষ টাকা থেকে স্বাভাবিকভাবেই বিয়োগ করা প্রয়োজন। একইভাবে নিজের মূলধন অন্য কোথাও খাটালে তিনি বছর শেষে পঞ্চাশ হাজার টাকা সুদ হিসাবে পেতেন। কাজেই প্রাপ্ত মোট মুনাফা থেকে তাও বাদ দিতে হবে। আবার তিনি যদি অন্য কোথায় পরিশ্রম করতেন তবে বছর শেষে আরো দুই লক্ষ টাকা পেতেন। এভাবে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাপ্তি তার হত। কাজেই মোট মুনাফা থেকে সেই টাকা বাদ দিলে প্রকৃত অবস্থায় তার মুনাফা হয় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। আর তাই হলো নীট মুনাফা। কাজেই মোট মুনাফা লক্ষ্য করে উদ্যোক্তার প্রাপ্তিকে খুব বড় করে দেখা উচিত নয়। উদ্যোক্তার প্রাপ্ত নীট মুনাফা কত, তা জানা প্রয়োজন।

১৪.১.৩ মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার মধ্যে পার্থক্য

মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার মধ্যে পার্থক্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার সংজ্ঞা থেকে প্রাথমিক পার্থক্য জানা যায়। মোট বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে মোট ব্যক্ত ব্যয় বাদ দিলে যা পাওয়া যায়, তা হলো মোট মুনাফা। অপর দিকে মোট মুনাফা থেকে মোট অব্যক্ত ব্যয় বাদ দিলে নীট মুনাফা পাওয়া যায়। সুতরাং মোট মুনাফা = মোট বিক্রয়লব্ধ আয় – ব্যক্ত ব্যয়। অপরদিকে নীট মুনাফা = মোট মুনাফা – অব্যক্ত ব্যয়। যেখানে ব্যক্ত ব্যয় = অন্যের জমির জন্য প্রদত্ত খাজনা + নিয়োগকৃত শ্রমিকের মজুরি + অপরের মূলধন ব্যবহার বাবদ সুদ + মূলধনের অবচয়জনিত ব্যয় মেটানোর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ। অপরদিকে অব্যক্ত ব্যয় = উদ্যোক্তার নিজের জমি বাবদ খাজনা + নিজস্ব মূলধনের সুদ + নিজস্ব শ্রম বাবদ মজুরি।

২। মোট মুনাফার মধ্যে উদ্যোক্তার নিজের মালিকানাধীন অন্যান্য উপকরণ নিয়োগ বাবদ প্রাপ্ত আয় নিহিত থাকে। কিন্তু নীট মুনাফার মধ্যে কেবল উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহনের পুরস্কার নিহিত থাকে।

৩। মোট মুনাফা একটি প্রসারিত ধারণা এবং নীট মুনাফা তারই একটি অংশ। কাজেই মোট মুনাফার তুলনায় নীট মুনাফার পরিমাণ কম থাকে।

৪। মোট মুনাফার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার নিজের দক্ষতা সংক্রান্ত বিষয় যেমন থাকে, তেমনি ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণের দক্ষতাও সেখানে বিবেচনায় রাখতে হয়। কিন্তু নীট অর্থে মুনাফার মধ্যে কেবল উদ্যোক্তার নিজস্ব দক্ষতাই বিবেচনায় রাখতে হয়। কিন্তু নীট অর্থে মুনাফার মধ্যে কেবল উদ্যোক্তার নিজস্ব দক্ষতাই বিবেচিত হয়।

১৪.১.৪ মোট মুনাফার উপাদানসমূহ

মোট মুনাফার মধ্যে বিভিন্ন উপাদান মিশ্রিত থাকে। সেই উপাদানগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো –

১। **উদ্যোক্তার মালিকানাধীন অন্যান্য উপাদানের মূল্য :** উদ্যোক্তা তার ব্যবসা বা উৎপাদন ক্ষেত্রে নিজের জমি ও মূলধন সরবরাহ করতে পারে। তাছাড়া শ্রমিক হিসাবে নিজেও সেখানে শ্রম দান করতে পারে। কাজেই নিজস্ব জমির খাজনা, নিজস্ব শ্রমের মজুরি এবং নিজস্ব মূলধনের সুদ মোট মুনাফার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

২। **পরিচালনা সংক্রান্ত আয় :** উদ্যোক্তা তার ব্যবসা পরিচালনার সময় নিজে কোন পারিশ্রমিক নাও নিতে পারে। তবে তার এই পরিচালনা থেকে যে পারিশ্রমিক পাওয়া উচিত, তা মোট মুনাফার অন্তর্ভুক্ত থাকে। তবে সেই উদ্যোক্তা নিজস্ব ব্যবসায় পরিশ্রম না করে যদি অন্য কোথাও সেই সময় পরিশ্রম করত, তার বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পেত তা মজুরি হিসাবে মোট মুনাফার মধ্যে থেকে যায়।

৩। **ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার পুরস্কার :** উদ্যোক্তা তার ব্যবসা বা উৎপাদন পরিচালনা ক্ষেত্রে ঝুঁকি বহন করে। সেখানে অনিশ্চয়তা থাকে। ভবিষ্যতে দাম ও চাহিদা কিরূপ হবে এ প্রসঙ্গে তাকে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে হয়। সে বর্তমানে যে ঝুঁকি বহন করছে, তা বাবদ অতিরিক্ত কিছু প্রাপ্তি আশা করলে তার জন্য অন্যায় হবে না। কাজেই ঝুঁকি বহনের পুরস্কার হিসাবে মুনাফার উপাদান স্বীকার করা হয়।

৪। **উদ্ভাবন সংক্রান্ত পুরস্কার :** অধ্যাপক সুম্পিটার উল্লেখ করেন যে, কোন দ্রব্য বা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করে বা নতুন বাজার আবিষ্কার করে একজন উদ্যোক্তা তার মুনাফা বাড়াতে পারে। উদ্ভাবনের বিনিময়ে প্রাপ্ত পুরষ্কার হিসাবে যে প্রাপ্তি আশা করা হয়, তা মুনাফার উপাদান হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

৫। **একচেটিয়া ক্ষমতা :** উদ্যোক্তার একচেটিয়া ক্ষমতা থাকলে অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারে। তখন সে স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত অর্থ পেতে পারে। একচেটিয়া ক্ষমতার উৎস হিসাবে লাইসেন্স, পেটেন্ট, কপিরাইট, জোট গঠন – এসব বিবেচনা করা যায়। এসবের মাধ্যমে যে বাড়তি আয় উদ্যোক্তার অর্জিত হয়, তা মুনাফার উপাদান হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

৬। **দ্রব্য পৃথকীকরণ :** বাজারে একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা থাকলে বিভিন্ন উদ্যোক্তা একই ধরনের দ্রব্য সামান্য হেরফের করে বাজারজাত করতে পারে। এর জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার ভূমিকা রাখে। বিজ্ঞাপন দ্বারা যদি ক্রেতাকে মোহগ্রস্ত করা যায়, তবে বাজার থেকে বাড়তি আয় বা মুনাফা আসে। সেই বাড়তি আয় মোট মুনাফার অন্তর্গত হয়।

৭। **আকস্মিক প্রাপ্তি :** দেশে যুদ্ধ বেঁধে গেলে অথবা শ্রমিক ধর্মঘট হলে অথবা যান চলাচলে অসুবিধা হলে কিছু বাড়তি সুবিধা ব্যবসায়ীরা পায়। এই ধরনের আকস্মিক সুযোগের কারণে আয় বাড়তে পারে। এই আকস্মিক বাড়তি আয় মোট মুনাফার অন্তর্গত হয়।

সারসংক্ষেপ

১। উদ্যোক্তার ব্যবসা পরিচালনার পারিশ্রমিক হলো মুনাফা। বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে উৎপাদনের চুক্তিভিত্তিক ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে মুনাফা বলা যায়।

২। মোট মুনাফা = মোট বিক্রয়লব্ধ আয় – ব্যক্ত ব্যয়। অপরদিকে নীট মুনাফা = মোট মুনাফা – অব্যক্ত ব্যয়। যেখানে, ব্যক্ত ব্যয় = অন্যের জমির খাজনা + নিয়োগকৃত শ্রমিকের মজুরি + অপরের মূলধন ব্যবহার বাবদ সুদ + মূলধনের অবচয় জনিত ব্যয় মেটানোর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ। অপরদিকে অব্যক্ত ব্যয় = উদ্যোক্তার নিজের জমি বাবদ খাজনা + নিজস্ব মূলধনের সুদ + নিজস্ব শ্রম বাবদ মজুরি।

৩। নীট মুনাফার মধ্যে উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহনের পুরস্কার নিহিত থাকে।

৪। মোট মুনাফার অন্তর্গত উপাদানগুলো হলো –
ক. উদ্যোক্তার মালিকানাধীন অন্যান্য উপাদানের মূল্য খ. পরিচালনা সংক্রান্ত আয় গ. ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার পুরস্কার ঘ. উদ্ভাবন সংক্রান্ত পুরস্কার ঙ. একচেটিয়া ক্ষমতার প্রাপ্তি চ. দ্রব্য পৃথকীকরণ ছ. আকস্মিক প্রাপ্তি।

অনুশীলনী ১৪.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। মুনাফা বলতে কি বুঝানো হয়?
ক. আর্থিক মূলধন ব্যবহারজনিত প্রাপ্তি
খ. মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ
গ. উদ্যোক্তার পারিশ্রমিক
ঘ. বিনিয়োগ মূল্য

২। মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো –
ক. নীট মুনাফার অন্তর্গত উপাদান হলো মোট মুনাফা
খ. মোট মুনাফা পায় ঋণদাতা ও নীট মুনাফা পায় ঋণ গ্রহীতা
গ. মোট মুনাফার সাথে ব্যক্ত ব্যয় এবং নীট মুনাফার সাথে অব্যক্ত ব্যয় জড়িত
ঘ. মোট মুনাফা টাকার অংকে এবং নীট মুনাফা শতাংশ হিসাবে প্রকাশ পায়

৩। মুনাফাকে অবশিষ্ট আয় বলা হয়, কারণ –
ক. উদ্যোক্তার সঞ্চয় হলো মুনাফা
খ. মুনাফা হলো স্বাভাবিকের চেয়ে বাড়তি আয়
গ. উদ্যোক্তার নিজের নয়, এমন উপাদানগুলোর চুক্তিভিত্তিক অর্থ প্রদানের পর থেকে যাওয়া আয় হলো মুনাফা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক. মুনাফার সংজ্ঞা প্রদান করুন।
খ. মোট মুনাফার উপাদানগুলো উল্লেখ করুন।
গ. মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার মধ্যে একটি পার্থক্য নির্দেশ করুন।

পাঠ ২ : ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার সাথে মুনাফার সম্পর্ক কিরূপ, তা বলতে পারবেন।
- মুনাফাকে ঝুঁকি বহনের পুরস্কার কেন বলা হয়, তা বলতে পারবেন।
- মুনাফা অর্জনকে যোগ্যতার পুরস্কার বলা যায়, এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন।
- ঝুঁকির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারবেন।

১৪.২.১ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার সাথে মুনাফার সম্পর্ক

ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার সাথে মুনাফার নিকট সম্পর্ক (Close relation) আছে। মুনাফা হলো ঝুঁকি বহনের পুরস্কার। অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকিকে সম্বল করে একজন উদ্যোগ গ্রহণ করে। উদ্যোক্তার লক্ষ্য থাকে কিছু প্রাপ্তির। আর তা হলো মুনাফা। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা যথেষ্ট জটিল ও যন্ত্রভিত্তিক। সেখানে উৎপাদন ঝুঁকিপূর্ণ। একজন উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ঘিরে রাখে। যেমন,

১। উদ্যোক্তাকে সব সময় দুশ্চিন্তায় থাকতে হয় কোন অগ্নিকান্ড বা দুর্ঘটনা ঘটে যায় কিনা ;
২। ভবিষ্যতে বাজার কি রকম যাবে ;
৩। দেশে কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখা যাবে কিনা ;
৪। রুচি ও ফ্যাশানের দ্রুত পরিবর্তন ঘটবে কিনা ;
৫। উৎপাদন ক্ষেত্রে যে যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, সেগুলো সঠিকভাবে চলবে কিনা ;
৬। কাঁচা মালের দাম কিরূপ হবে ;
৭। শ্রমিকরা বেশি মজুরি দাবী করবে কিনা ;
৮। পরিবহন খরচ বেড়ে যাবে কিনা ;

এসব নানা ভাবনা ও অনিশ্চয়তা তাকে ঘিরে রাখে। কারণ ব্যবসায় লোকসান হলে সমস্ত বোঝা তার উপরই বর্তাবে। অপর কেউ সেই লোকসান বহন করবে না। কাজেই একজন উদ্যোক্তা যখন অধিক ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে। সেই ঝুঁকির বিনিময়ে সে অধিক মুনাফা প্রত্যাশা করে। কাজেই মুনাফাকে ঝুঁকি বহনের পুরস্কার হিসাবে গণ্য করা যায়। যে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাকে সামনে রেখে তাকে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে ব্যবসা বা উৎপাদন পরিচালনা করতে হচ্ছে, সেই উদ্যোগের পুরস্কার হিসাবে মুনাফা প্রাপ্তিকে সমাজের ভাল দৃষ্টিতে দেখতে হবে। ঝুঁকি যত বেশি হবে, মুনাফা তত বেশি হওয়া উচিত। মুনাফা যদি বেশি না হয়, তবে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ কেউ করতে চাইবে না।

আলোচনা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ঝুঁকি গ্রহণের দূরপ্রসারী লক্ষ্য হলো মুনাফা অর্জন। আর সেই মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে একজন উদ্যোক্তা নিজের কল্যাণ যেমন অর্জন করে, তেমনি সমাজ ও দেশের কল্যাণও অর্জন করে। সাহস ও যোগ্যতার সাথে ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে উদ্যোক্তা উৎপাদন ও বিনিয়োগ কাজ পরিচালনা করে। তাই অর্থনীতিতে মুনাফা অর্জনকে যোগ্যতার পুরস্কার হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

১৪.২.২ উৎপাদকের মুনাফা হলো অবীমাযোগ্য অর্থনৈতিক ঝুঁকি বহনের পুরস্কার

ঝুঁকি দু'ধরনের – **১.** প্রাকৃতিক ঝুঁকি ও **২.** অর্থনৈতিক ঝুঁকি।

প্রাকৃতিক ঝুঁকি বলতে অগ্নিকান্ড বা আকস্মিক দুর্ঘটনার মত ঝুঁকিকে বুঝানো হয়। এ ধরনের ঝুঁকির বিনিময়ে বীমা করা যায়। বীমা কোম্পানি সেই ঝুঁকি বহন করে। সেই ঝুঁকি বহনের বিনিময়ে বীমা কোম্পানি মুনাফা পায়। কাজেই প্রাকৃতিক ঝুঁকির প্রেক্ষিতে উৎপাদক মুনাফা পায়

না। কিন্তু অর্থনৈতিক ঝুঁকি বীমা যোগ্য নয়। উদ্যোক্তা এ ঝুঁকি বহন করে, বীমা কোম্পানি এ ঝুঁকি বহন করতে পারে না। যেমন উৎপাদনকারী যে দ্রব্য বাজারজাত করল, তার চাহিদা হঠাৎ কমে যেতে পারে। উৎপাদন ব্যয়ের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থাকতে পারে। এর ফলে যোগানের ক্ষেত্রেও অনিশ্চয়তা থাকে। চাহিদা ও যোগানের অনিশ্চয়তাকে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বলে। উদ্যোক্তা এই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাকে ঝুঁকি হিসাবে মনে করে। আর সেই অবীমাযোগ্য ঝুঁকি বহনের পুরস্কার হলো মুনাফা।

সারসংক্ষেপ :

ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার সাথে মুনাফার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। মুনাফা হলো ঝুঁকি বহনের পুরস্কার।
ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাকে সামনে রেখে তাকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে ব্যবসা বা উৎপাদন পরিচালনা করতে হয়। অর্থনীতিতে মুনাফা অর্জনকে যোগ্যতার পুরস্কার হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
ঝুঁকি দু'ধরনের – ১. প্রাকৃতিক ঝুঁকি ও ২. অর্থনৈতিক ঝুঁকি। প্রাকৃতিক ঝুঁকির বিনিময়ে বীমা করা যায়। কিন্তু অর্থনৈতিক ঝুঁকি বীমাযোগ্য নয়। সেই অবীমাযোগ্য ঝুঁকি বহনের পুরস্কার হলো মুনাফা।

অনুশীলনী ১৪.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। ঝুঁকি ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ?
   ক. ঝুঁকি ও মুনাফার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক আছে।
   খ. ঝুঁকি কম হলে মুনাফা বেশি হয়।
   গ. ঝুঁকি ও মুনাফার মধ্যে কোনই সম্পর্ক নেই।

২। নিম্নে ফার্মের প্রাকৃতিক ঝুঁকি ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি নির্দেশ করুন –
   ক. জাহাজ ডুবি
   খ. শ্রমিক আন্দোলন
   গ. যন্ত্র বিকল
   ঘ. অগ্নিকান্ড
   ঙ. বাজার থেকে অবিক্রিত দ্রব্য ফেরত আসা
   চ. রুচি ও চাহিদার পরিবর্তনের ফলে চাহিদার হ্রাস

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক. ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার সাথে মুনাফার সম্পর্ক কিরূপ তা উল্লেখ করুন।
খ. ঝুঁকির কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করুন।
গ. অবীমাযোগ্য ঝুঁকি কেন মুনাফার সাথে সম্পর্কিত?

পাঠ ৩ : স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মুনাফা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- স্বাভাবিক মুনাফা কি, তা বলতে পারবেন।
- অস্বাভাবিক মুনাফা কেন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, তা বলতে পারবেন।
- অস্বাভাবিক মুনাফা স্বল্পকালে থাকলেও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকালে অস্বাভাবিক মুনাফা না থেকে কেবল স্বাভাবিক মুনাফা কেন থাকে, তা বলতে পারবেন।

১৪.৩.১ স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মুনাফা

স্বাভাবিক মুনাফা সংক্রান্ত ধারণা সাধারণতঃ দীর্ঘকাল প্রসঙ্গে বিবেচনা করা হয়। দীর্ঘকালে বিশুদ্ধ মুনাফা শূন্য হবে, কিন্তু ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা থাকবে। তা না হলে ফার্ম দীর্ঘকালে উৎপাদনক্ষেত্রে টিকে থাকতে পারবে না। মার্শাল অভিমত রাখেন যে, উদ্যোক্তাদেরকে ব্যবসা ক্ষেত্রে আকৃষ্ট করতে হলে ধনাত্মক মুনাফার হার থাকতে হবে। তাঁর মতে শিল্পক্ষেত্রে উদ্যোক্তার যোগান দাম হলো মুনাফা। একজন উদ্যোক্তা উৎপাদন শুরু করার আগে যে ন্যূনতম মুনাফা প্রত্যাশা করে এবং তার প্রেক্ষিতে মূলধন নিয়োগ করে, সেই ন্যূনতম প্রত্যাশিত মুনাফাকে স্বাভাবিক মুনাফা বলে। সেই ন্যূনতম মুনাফা অর্জিত না হলে দীর্ঘকালে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার কোন যুক্তি নেই বলে ফার্ম ধারণা করে। সুতরাং স্বাভাবিক মুনাফা বলতে সেই নিম্নতম মুনাফা বুঝানো হয়, যে মুনাফা না পেলে মালিক উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। একজন উদ্যোক্তা দাম নির্ধারণের সময় সেই ন্যূনতম মুনাফার কথা বিবেচনার মধ্যে রাখে। তাই উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মিসেস রবিনসন বলেন যে, স্বাভাবিক মুনাফা বলতে সেই মুনাফাকে বুঝানো হয়, যা অর্জিত হলে ১. কোন ফার্মের উৎপাদন কমানো বা বাড়ানোর প্রবণতা থাকবে না ; ২. শিল্পক্ষেত্রে কোন নতুন ফার্ম প্রবেশ করবে না এবং ৩. কোন পুরাতন ফার্ম শিল্পক্ষেত্র ত্যাগ করবে না।

অস্বাভাবিক মুনাফা হলো স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত। অস্বাভাবিক মুনাফাকে ধনাত্মক অর্থনৈতিক মুনাফাও বলা হয়। শিল্পক্ষেত্রে কোন কোন ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করলে নতুন নতুন ফার্ম মুনাফা অর্জনের আশায় শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। প্রতিযোগিতার কারণে তখন অস্বাভাবিক মুনাফা আর থাকবে না, অর্জিত হবে স্বাভাবিক মুনাফা। কাজেই শূন্য অর্থনৈতিক মুনাফার পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক মুনাফার পরিস্থিতি বলা হয়।

১৪.৩.২ পূর্ণ ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রেক্ষিতে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মুনাফা বিবেচনা

পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে তথা ফার্মের প্রবেশাধিকার থাকলে দীর্ঘকালে বিশুদ্ধ মুনাফা থাকে না। কিন্তু ঝুঁকি বহন, অনিশ্চয়তা, উদ্ভাবন, দ্রব্য পৃথকীকরণ (যা অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দেখা যায়) এসব কাজের মাধ্যমে উদ্যোক্তার পক্ষে অর্থনৈতিক মুনাফা বা বিশুদ্ধ মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। উৎপাদন কাজ পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তার যে পারিশ্রমিক পাওয়ার কথা এবং উদ্যোক্তা নিজে যেসব উপাদান যোগান দেয় তার দাম বিশুদ্ধ মুনাফার মধ্যে ধরা হয় না। কিন্তু সেই নিজস্ব ন্যূনতম প্রাপ্তি স্বাভাবিক মুনাফার মাধ্যমে উদ্যোক্তার কাছে আসতে হবে, এটাই প্রত্যাশিত।

বাস্তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতা দেখা যায় না। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার হতে হলে অসংখ্য ফার্ম বা বিক্রেতা থাকতে হবে, বাজারে অবাধ প্রবেশাধিকার, সমজাতীয় দ্রব্য, বাজার সম্পর্কিত পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। বাজার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান বলতে এটাই বুঝানো হয় যে, ভবিষ্যতে বাজারের অবস্থা কি ধরনের দাঁড়াতে পারে, এ সম্পর্কে সবাই সচেতন। এমতাবস্থায় ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা বলে কিছু থাকে না। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন উৎপাদক যদি দাম অপেক্ষা বেশি আয়

করে, তবে অন্যান্য উৎপাদকরা সেই শিল্পে প্রবেশ করবে। উৎপাদকের সংখ্যা বেড়ে গেলে মোট যোগান বাড়বে। তখন দাম কমবে এবং অতিরিক্ত আয় বা অস্বাভাবিক মুনাফা থাকবে না। কাজেই পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে বিশুদ্ধ মুনাফা থাকতে পারে না। তবে স্বল্পকালে অস্বাভাবিক মুনাফা থাকতে পারে। এই অস্বাভাবিক মুনাফা হলো স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত। এই অস্বাভাবিক মুনাফা লক্ষ্য করে নতুন নতুন ফার্ম উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে সেই অস্বাভাবিক মুনাফা আর থাকবে না। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রত্যেক উদ্যোক্তা সম দক্ষতা সম্পন্ন। তাই কারো পক্ষে বাড়তি মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় কেবল টিকে থাকার মুনাফা অর্থাৎ স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয়।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে বাজারে ঝুঁকি থাকে, শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশে বাধা থাকে, নতুন কিছুর উদ্ভাবন ঘটে এবং দ্রব্যের পৃথকীকরণও লক্ষ্য করা যায়। এ ধরনের বাজারে স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ মুনাফা থাকতে পারে। কাজেই ধনাত্মক মুনাফা অপূর্ণ প্রতিযোগিতার (বিশেষতঃ একচেটিয়া কারবারের) ফসল। পূর্ণ প্রতিযোগিতা একটি কাল্পনিক বা আদর্শগত ব্যবস্থা, যেখানে দীর্ঘকালে উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ এমনভাবে পরিচালিত হয় যেখানে অস্বাভাবিক মুনাফা থাকবে না, থাকবে কেবল স্বাভাবিক মুনাফা।

সারসংক্ষেপ :

স্বাভাবিক মুনাফা সংক্রান্ত ধারণাটি সাধারণতঃ দীর্ঘকাল প্রসঙ্গে বিবেচিত। উদ্যোক্তাদের ব্যবসা ক্ষেত্রে দীর্ঘকালে উৎপাদন চালিয়ে যেতে হলে যে ন্যূনতম প্রত্যাশিত মুনাফা থাকতে হবে, তাকে স্বাভাবিক মুনাফা বলে। স্বাভাবিক মুনাফা বলতে সেই মুনাফাকে বুঝানো হয়, যা অর্জিত হলে কোন ফার্মের উৎপাদন কমানো বা বাড়ানোর প্রবণতা থাকবে না ; শিল্পক্ষেত্রে কোন নতুন ফার্ম প্রবেশ করবে না এবং কোন পুরাতন ফার্ম শিল্পক্ষেত্র ত্যাগ করবে না। স্বাভাবিক মুনাফার চেয়ে অতিরিক্ত মুনাফাকে অস্বাভাবিক মুনাফা বলা হয়। শিল্পক্ষেত্রে তখন নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে পারে।

অনুশীলনী ১৪.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। স্বাভাবিক মুনাফা বলতে কি বুঝানো হয়?
- ক. দীর্ঘকালে ফার্মের টিকে থাকার জন্য ন্যূনতম মুনাফা।
- খ. স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রত্যাশিত মুনাফা।
- গ. আয় ও ব্যয়ের ধনাত্মক ব্যবধান।

২। স্বাভাবিক মুনাফা প্রধানত পূর্ণ প্রতিযোগিতার সাথে জড়িত, কারণ –
- ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকায় দীর্ঘকালে অস্বাভাবিক মুনাফা থাকতে পারে না।
- খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিক পরিস্থিতি থাকে।
- গ. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় সরকার কোন রকম হস্তক্ষেপ করে না।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক. স্বাভাবিক মুনাফা ও অস্বাভাবিক মুনাফার সংজ্ঞা প্রদান করুন।
খ. স্বাভাবিক মুনাফা কেন উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়?
গ. স্বাভাবিক মুনাফা কেন সাধারণতঃ পূর্ণ প্রতিযোগিতার সাথে সম্পৃক্ত?

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

ইউনিট ১৫

ভূমিকা

আমরা যেসব দ্রব্য ও সেবাকর্ম ভোগ করি তার অনেকগুলি আমাদের দেশে উৎপাদিত হয়না। যেমন আপেল, গুঁড়ো দুধ, গাড়ী ইত্যাদি। কিছু দ্রব্য ও সেবাকর্ম আমাদের দেশে উৎপাদিত হয়। কিন্তু এসব উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ বিদেশ থেকে আনা হয়। যেমন ধান উৎপাদনে ব্যবহৃত সেচযন্ত্র, সুতা উৎপাদনে ব্যবহৃত তুলা, বিমান ভ্রমনের জন্য বিমান ইত্যাদি। আবার আমাদের দেশে যে সকল পণ্য উৎপাদিত হয় তার সব আমরা ব্যবহার করি না - আমরা বিদেশীদের কাছে বিক্রয় করি। যেমন তৈরী পোশাক, চিংড়ী ইত্যাদি। এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের দ্রব্য ও সেবাকর্মের এরূপ লেনদেনকে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য বলে। কোন কোন দেশের জন্য আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হলেও একদেশ থেকে অন্যদেশে পণ্য সামগ্রী অবাধে চলাচল করতে পারে না - কিছু বিধি নিষেধ থাকে। আমরা এ অধ্যায়ে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব, অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের পার্থক্য, আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি এবং অবাধ ও সংরক্ষিত বাণিজ্যের স্বপক্ষে/বিপক্ষে যুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করব।

পাঠ-১ : আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।

১৫.১.১ আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য

আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য কাকে বলে ?

পৃথিবীতে কোন দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একটি দেশে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসে। আবার একটি দেশ থেকে বিভিন্ন পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যায়। পৃথিবীর দুটি সার্বভৌম দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সেবাকর্মের লেনদেনকে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য বলে। একটি দেশ যে সকল পণ্য তুলনামূলকভাবে কম খরচে উৎপাদন করতে পারে সে সকল পণ্যের উৎপাদনে বিশেষায়ন করে এবং এ সকল পণ্যের উদ্বৃত্ত অংশ অপরাপর দেশের উদ্বৃত্ত পণ্যের সঙ্গে বিনিময় করে। একটি দেশ যে সকল দ্রব্য ও সেবাকর্ম অন্যান্য দেশের নিকট বিক্রয় করে তাকে রপ্তানি বলে।

একটি দেশ অন্যান্য দেশের নিকট থেকে যে সকল দ্রব্য ও সেবাকর্ম ক্রয় করে তাকে আমদানী বলে। একটি দেশ যে সকল দ্রব্য ও সেবাকর্ম আমদানী করে সেগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা

যায়। কতগুলো আমদানী আছে যা একটি দেশ উৎপাদন করতে পারে কিন্তু অন্যান্য দেশ তা তুলনামূলকভাবে কম খরচে উৎপাদন করতে পারে। আর কতগুলো আমদানী আছে যা এই দেশে উৎপাদিত হয় না। এ ধরনের আমদানীকে অপ্রতিযোগিতামূলক আমদানী বলে।

১৫.১.২ আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব

বর্তমানকালে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব সকল দেশে সমান নয়। নিচের সারণী থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া যায়। সারণী থেকে দেখা যায় যে বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ইত্যাদি ছোট দেশসমূহে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য জাতীয় অর্থনীতিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ। বেলজিয়ামে রপ্তানি জাতীয় উৎপাদনের মোট ৬৯%। বড়দেশ সমূহের জাতীয় অর্থনীতিতে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার অনেক বড় যেখানে বিচিত্রমুখী পণ্যের বিপুল চাহিদা রয়েছে, অর্থনীতি অনেক বৈচিত্র্যময়। যেখানে বহুধরনের পণ্য উৎপাদিত হয়। এসব দেশের অর্থনীতি একাই অনেক দেশের অর্থনীতির সমান।

ভারতের অর্থনীতির রপ্তানী নির্ভরতা কম। ভারত জিডিপি-এর শতকরা মাত্র ১০ ভাগ রপ্তানী করে। ভারতের অর্থনীতি অনুন্নত হলেও বড় ও বৈচিত্র্যময়। বাংলাদেশের অর্থনীতি জিডিপি-এর মাত্র ১০ ভাগ রপ্তানী করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে বাংলাদেশ ১৯৯৪ সালে জিডিপি'র ২০.৪ ভাগ আমদানী করেছে। এসব আমদানীর অধিকাংশ মূলধনী দ্রব্য এবং মাধ্যমিক পণ্য যা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয়। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বাংলাদেশের জন্য আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেসকল অর্থনীতি আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য বড় ভূমিকা পালন করে সেসব অর্থনীতিকে মুক্ত অর্থনীতি বলে।

সারণী ১৫.১ নির্বাচিত দেশের রপ্তানী, ১৯৯৪

দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা হার

দেশ	রপ্তানী
বেলজিয়াম	৬৯
নেদারল্যান্ড	৫১
কানাডা	৩০
যুক্তরাজ্য	২৫
ফ্রান্স	২৩
ইটালী	২৩
জার্মানী	২২
যুক্তরাষ্ট্র	১০
জাপান	৯
বাংলাদেশ	১২ (২০.৪)[ক]
ভারত	১২

উৎস- বিশ্বব্যাংক,

ব্যাখ্যা ক. বন্ধনীভুক্ত সংখ্যা আমদানী/জিডিপি অনুপাত (১৯৯৪-৯৫)

সারসংক্ষেপ :

ক. দুটি সার্বভৌম দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সেবাকর্মের লেনদেনকে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য বলে।

খ. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বের তারতম্য রয়েছে। বাংলাদেশের

জন্য আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলনী ১৫.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. একটি দেশ কোনরূপ আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য না করলে তাকে বলা হয়
   ক. পরনির্ভরতা
   খ. স্বয়ং সম্পূর্ণ
   গ. বদ্ধ অর্থনীতি
   ঘ. খ ও গ উভয়ই

২. আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যে পণ্যের লেনদেন হয়
   ক. দুটি সার্বভৌম দেশের মধ্যে
   খ. দেশের এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের
   গ. বড় দেশগুলোর এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের
   ঘ. ক ও গ উভয়ই

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক. আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য বলতে কি বুঝায় ?

খ. আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য সকল দেশের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়- ব্যাখ্যা কর।

পাঠ – ২ : অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য কাকে বলে বলতে পারবেন।
- অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের পার্থক্য বলতে পারবেন।

১৫.২.১ : অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য

অভ্যন্তরীন বাণিজ্য

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

একটি দেশের দুটি অঞ্চলের মধ্যে দ্রব্য ও সেবাকর্মের লেনদেনকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। যেমন, বাংলাদেশের সিলেট বিভাগ থেকে চা চাপাই নবাবগঞ্জ জেলায় যায়। আবার চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকে আম সিলেট অঞ্চলে যায়। দুটি স্বাধীন দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সেবাকর্মের লেনদেনকে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য বলে। যেমন- বাংলাদেশ থেকে ভারতে জামদানী শাড়ী রপ্তানী এবং ভারত থেকে বাংলাদেশে সুতা আমদানী। একটি দেশের দুটি অঞ্চলের মধ্যে পণ্যের লেনদেনের কারণ এবং দুটি দেশের মধ্যে পণ্যের লেনদেনের কারণ মূলত: একই। দুটি দেশের মধ্যে যে কারণে বাণিজ্য হয় সে কারণগুলো একই দেশের দুটি অঞ্চলের ক্ষেত্রে বাণিজ্যের জন্যও প্রযোজ্য। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যদি অভ্যন্তরীণ লেনদেন সম্পর্কে পাঠ করে বাণিজ্য সম্পর্কে জানা যায় তাহলে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে পৃথকভাবে পাঠ করার প্রয়োজন কি? অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের মধ্যে মৌলিক মিল থাকা সত্ত্বেও কিছু পার্থক্য আছে যেজন্য এ সম্পর্কে আলাদাভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে।
এ পার্থক্যগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল।

১৫.২.২ ঃ অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য

১. বিভিন্ন মূদ্রা

একটি দেশের অভ্যন্তরে সকল প্রকার বাণিজ্য একই মূদ্রায় সম্পন্ন হয়। যেমন- বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল প্রকার লেনদেন টাকায় সম্পন্ন হয়। কিন্তু দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যে দুটি মূদ্রা জড়িত থাকে। বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তিত হতে পারে এবং বর্তমানকালে তা পরিবর্তিত হয়। যেমন- ১৯৭১-৭২ সালে টাকা ও ডলারের বিনিময় হার ছিল ১ আমেরিকান ডলার=৭.৩০ টাকা; কিন্তু ১৯৯৭-৯৮ সালের মাঝামাঝি অবস্থায় তা দাঁড়ায় ১ ডলার=৪৬.৫০ টাকায়। বিনিময় হারের পরিবর্তনের ফলে নানারূপ জটিলতা ও নীতি নির্ধারণে সমস্যা দেখা দেয়।

২. রাজনৈতিক উপাদান

কোন দেশের সরকার তার নাগরিকদের কল্যাণের জন্য চিন্তা করে। কিন্তু তার গৃহীত নীতির দ্বারা বিদেশী নাগরিকগণ কিভাবে প্রভাবিত হবে সে সম্পর্কে চিন্তা থাকে না। একটি দেশ তার সুবিধার জন্য বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ করতে পারে বা অন্যকোন রূপ বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। এর ফলে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য চলাচল বাধাগ্রস্থ হয় যা একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে ঘটে না।

৩. উপাদানের সচলতা

কোন দেশের অভ্যন্তরে শ্রম প্রয়োজনমত একস্থান থেকে অন্যস্থানে কর্মস্থান পরিবর্তন করতে পারে এবং চাকুরী নিতে পারে। কিন্তু এক দেশ থেকে অন্য দেশে অভিবাসনের পথে নানারূপ বাধানিষেধ আরোপ করা হয়; বিদেশী নাগরিকদের চাকুরী গ্রহণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা হয়।

দেশের অভ্যন্তরে মূলধনের সচলতার তুলনায় আন্ত:দেশীয় সচলতা কম। মূলধনি দ্রব্য একদেশ থেকে অন্যদেশে পরিবহন করা ব্যয় সাপেক্ষ। বৈদেশিক বিনেয়োগের উপর নানারূপ বিধিনিষেধ থাকতে পারে। তাছাড়া বিদেশে বিনিয়োগ কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ যেমন-বিদেশের সরকার কর্তৃক স্বত্বনিরসনের ঝুঁকি এবং বিনিময় হার পরিবর্তনের ঝুঁকি।

সার সংক্ষেপ :

ক. একটি দেশের দুটি অঞ্চলের মধ্যে পণ্যের বিনিময়কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে পণ্যের বিনিময়কে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য বলে।

খ. অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের মূল কারণ একই হলেও দু'য়ের মধ্যে কিছু লক্ষ্যণীয় পার্থক্য রয়েছে। আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্নমুদ্রা জড়িত, রাজনৈতিক উপাদানের প্রভাব বেশি এবং উৎপাদনের উপাদানের সচলতা কম।

অনুশীলনী ১৫.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. একই দেশের নাগরিকদের মধ্যে দ্রব্য ও সেবাকর্মের বিনিময়কে
   ক. আন্ত:দেশীয় বাণিজ্য বলে
   খ. বৈদেশিক বাণিজ্য বলে
   গ. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে
   ঘ. ব্যবসা বাণিজ্য বলে

২. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মূল ভিত্তি
   ক. বৈচিত্র্যময় উৎপাদন
   খ. উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
   গ. বিশেষায়ন
   ঘ. ক ও গ উভয়ই

৩. মূলধনের সচলতা দেশের অভ্যন্তরে যেরূপ
   ক. দুটি দেশের মধ্যেও সেরূপ
   খ. দুটি দেশের মধ্যে এর তুলনায় কম
   গ. দুটি দেশের মধ্যে তার তুলনায় বেশী
   ঘ. উপরের একটিও নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের পার্থক্য নির্দেশ কর।
খ. আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো কি ?

পাঠ-৩ : তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পরম সুবিধা তত্ত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন
- তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন
- বাণিজ্য থেকে লাভ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

১৫.৩.১ : পরম সুবিধা তত্ত্ব

পরম সুবিধা তত্ত্ব

দুটি দেশের মধ্যে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য হয় কারণ দুটি দেশই বাণিজ্য থেকে লাভ করে। বাণিজ্য থেকে লাভ দেখানোর জন্য ডেভিড রিকার্ডো তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব প্রদান করেন। তবে এই তত্ত্ব আলোচনার পূর্বে এ্যাডাম স্মীথ প্রদত্ত পরম সুবিধা তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন আছে। যদি দুটো দেশের মধ্যে একটি দেশে একটি পণ্য এক একক উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ উপকরণ লাগে তা অন্য দেশটির তুলনায় কম হয় তাহলে প্রথমোক্ত দেশটির ঐ পণ্যে পরম সুবিধা আছে বলা হয়।

আমরা দুটি দেশ বাংলাদেশ ও আমেরিকা, দুটি পণ্য - তৈরী পোশাক ও কম্পিউটার এবং একটি উপকরণ - শ্রম বিবেচনা করি। এই দুটি পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ নিচের সারণীতে দেখানো হয়েছে।

সারণী ১৫.১ : **পরম সুবিধা**

প্রতি একক উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ	বাংলাদেশ	আমেরিকা
তৈরী পোশাক	২	৪
কম্পিউটার	১০	৮

সারণী থেকে দেখা যায় যে, এক একক তৈরী পোশাক উৎপাদনে বাংলাদেশে আমেরিকার তুলনায় শ্রম কম লাগে (২<৪)। অনুরূপভাবে, এক একক কম্পিউটার উৎপাদনে বাংলাদেশের তুলনায় আমেরিকায় শ্রম কম লাগে (৮<১০)। সুতরাং বাংলাদেশের তৈরী পোশাক উৎপাদনে পরম সুবিধা এবং আমেরিকার কম্পিউটার উৎপাদনে পরম সুবিধা আছে। যদি এ অবস্থায় বাংলাদেশ তৈরী পোষাক উৎপাদনে এবং আমেরিকা কম্পিউটার উৎপাদনে বিশেষায়ন করে এবং উৎপাদিত পণ্য বিনিময় করে তাহলে উভয় দেশই লাভবান হবে। মনে করি, দু'দেশের মধ্যে ১ একক কম্পিউটার এর সঙ্গে ৩ একক তৈরী পোশাক বিনিময় হয়। বাংলাদেশ ৬ একক শ্রম ব্যবহার করে ৩ একক তৈরী পোষাক উৎপাদন করে এবং এর বিনিময়ে ১টি কম্পিউটার পায় যা দেশে উৎপাদন করলে ১০ একক শ্রম লাগত। বাণিজ্যের ফলে বাংলাদেশের ৪ একক শ্রম বাঁচে যা সে আরও পোষাক উৎপাদনে ব্যবহার করতে পারে।

অপরদিকে আমেরিকা ৮ একক শ্রম ব্যবহার করে ১টি কম্পিউটার উৎপাদন করে তার বিনিময়ে ৩ একক তৈরী পোষাক লাভ করে যা দেশে উৎপাদন করলে ১২ একক শ্রম লাগত। এভাবে আমেরিকারও লাভ হয়। সুতরাং বাণিজ্যরত দুটি দেশের কোন পণ্য উৎপাদনে পরম সুবিধা থাকলে বাণিজ্য উভয় দেশের জন্য লাভজনক হয়। আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের অনেকটাই পরম সুবিধার ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে দুটি দেশের মধ্যে একটি দেশ যদি অন্য দেশের তুলনায় সকল পণ্য উৎপাদনে বেশি দক্ষ হয় তাহলে দেশ দুটির মধ্যে লাভজনক বাণিজ্য হবে কিনা? সাধারণভাবে মনে হতে পারে, যে কোন পণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের শ্রমিকের তুলনায় আমেরিকার শ্রমিকের

উৎপাদনশীলতা এত বেশি যে বাংলাদেশের পক্ষে আমেরিকায় কোন পণ্য রপ্তানী করা সম্ভব নয়। কিন্তু তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব বলে যে, এরূপ অবস্থায়ও লাভজনক বাণিজ্য সম্ভব। যদিও আমেরিকার তুলনায় বাংলাদেশ প্রতিটি পণ্য উৎপাদনে পরম অসুবিধাজনক অবস্থায় আছে, বলা হয় যে এসবের মধ্যে যে পণ্যটি উৎপাদনে বাংলাদেশ সবচেয়ে কম অদক্ষ সেটিতে বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা আছে। আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের জন্য পরম সুবিধা অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়, যা প্রয়োজন তা হচ্ছে তুলনামূলক সুবিধা।

১৫.৩.২ : তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব

সুবিধা তত্ত্ব অনুসারে যদি প্রতিটি দেশ যে দ্রব্য তুলনামূলকভাবে কম খরচে উৎপাদন করতে পারে (বা যাতে তুলনামূলকভাবে কম অদক্ষ) সে দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষায়ন এবং তা রপ্তানী করে তাহলে প্রতিটি দেশ উপকৃত হবে। অনুরূপভাবে যদি প্রতিটি দেশ যে দ্রব্য তুলনামূলকভাবে বেশী খরচে উৎপাদন করতে পারে (বা যাতে তুলনামূলকভাবে বেশি অদক্ষ) সে দ্রব্য আমদানী করে তাহলে প্রতিটি দেশ উপকৃত হবে।

১৫.৩.৩ : তুলনামূলক সুবিধার ব্যাখ্যা

সারণী ১৫.২-এ প্রদত্ত উপাত্ত দ্বারা তত্ত্বটি সহজে ব্যাখ্যা করা যায়।

সারণী-২ : **তুলনামূলক সুবিধা**

প্রতি একক উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ	বাংলাদেশ	আমেরিকা
তৈরী পোশাক	২	১
কম্পিউটার	১০	২

সারণী থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও কম্পিউটার উভয় দ্রব্য উৎপাদনে পরম অসুবিধায় আছে, কারণ ২>১ এবং ১০>২। কিন্তু বাংলাদেশের অসুবিধা তৈরি পোষাক উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে কম, কারণ ২/১<১০/২ বা ২<৫। সুতরাং বলা যায় বাংলাদেশের তৈরী পোশাক উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা এবং কম্পিউটার উৎপাদনে আপেক্ষিক অসুবিধা আছে।

অপরদিকে আমেরিকা তৈরি পোষাক ও কম্পিউটার উভয় পণ্য উৎপাদনে পরম সুবিধায় আছে, কারণ ১<২ এবং ২<১০। কিন্তু আমেরিকার সুবিধা কম্পিউটার উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে বেশি, কারণ ১০/২>২/১। অর্থাৎ আমেরিকার সুবিধা তৈরি পোশাক উৎপাদনে দ্বিগুণ কিন্তু কম্পিউটার উৎপাদনে পাঁচগুণ। সুতরাং বলা যায়, আমেরিকার কম্পিউটার উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা এবং তৈরি পোষাক উৎপাদনে আপেক্ষিক অসুবিধা আছে।

পরম সুবিধা তত্ত্ব অনুসারে, এক্ষেত্রে উভয় দেশের জন্য পারস্পরিকভাবে লাভজনক বাণিজ্য সম্ভব নয়। কিন্তু তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব অনুসারে বাণিজ্য সম্ভব। এ অবস্থায় যদি বাংলাদেশ তৈরি পোষাক উৎপাদনে বিশেষায়ন করে এবং তা তৈরি পোষাকের বিনিময়ে রপ্তানি করে তাহলে উভয় দেশই লাভবান হবে।

বাণিজ্য থেকে লাভ নির্ধারণের জন্য মনে করি বাংলাদেশ তৈরি পোষাক এবং আমেরিকা কম্পিউটার উৎপাদনে বিশেষায়ন করে। মনে করি বাংলাদেশ তৈরি পোষাক উৎপাদন ৫ একক বৃদ্ধি করে এবং আমেরিকা তৈরি পোষাকের উৎপাদন ৪ একক হ্রাস করে। তাহলে তৈরি পোষাকের বিশ্ব উৎপাদন ১ একক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে কম্পিউটারের উৎপাদন হ্রাস পায় এবং আমেরিকায় কম্পিউটারের উৎপাদনে পরিবর্তন করতে হয়। বাংলাদেশে ৫ একক তৈরি পোষাক উৎপাদনের জন্য ৫×২=১০ একক শ্রম লাগে এবং এজন্য কম্পিউটার উৎপাদন ১০/১০=১ একক হ্রাস করতে হয়। অপরদিকে আমেরিকায় তৈরি

পোষাকের উৎপাদন ৪ একক হ্রাসের ফলে ৪×২=৮ একক শ্রম বাঁচে এবং এর দ্বারা ৮/৪=২ একক কম্পিউটার উৎপাদন করা যায়। সুতরাং শ্রম পুন:বরাদ্দ করার ফলে কম্পিউটারের বিশ্ব উৎপাদন ১ একক বাড়ে। এভাবে উৎপাদনে নিম্নলিখিত পরিবর্তন ঘটে :

সারনী-২ : **তুলনামূলক সুবিধা**

	বাংলাদেশ	আমেরিকা	মোট
তৈরী পোশাক	+৫	-৪	+১
কম্পিউটার	-১	+২	+১

মোট কথা, মোট শ্রমের পরিমাণ স্থির রেখে, উভয় দেশ শ্রম পুন: বরাদ্দ করে তৈরি পোষাকের উৎপাদন ১ একক এবং কম্পিউটারের উৎপাদন ১ একক বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

১৫.৩.৪ : বাণিজ্য থেকে লাভ

বাণিজ্যের পূর্বে বাংলাদেশে ১ একক তৈরি পোষাক উৎপাদন করতে ২ একক শ্রম লাগে, যেখানে ১ একক কম্পিউটার উৎপাদন করতে ১০ একক শ্রম লাগে। সুতরাং কম্পিউটার তৈরি পোষাকের চেয়ে ব্যয়সাধ্য হবে - ১ একক কম্পিউটারের খরচ ১০/২=৫ একক তৈরি পোষাকের খরচের সমান। অনুরূপভাবে আমেরিকায় ১ একক কম্পিউটারের খরচ ২/১=২ একক তৈরি পোষাকের খরচের সমান হবে। এখন মনে করি, উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য হবে। যদি বাংলাদেশ ৫ একক তৈরি পোষাকের কম খরচে ১টি কম্পিউটার আমদানী করতে পারে তাহলে তা তার জন্য লাভজনক হবে। অনুরূপভাবে যদি আমেরিকা ১টি কম্পিউটার রপ্তানী করে বিনিময়ে ২ এককের বেশি তৈরি পোষাক আমদানী করতে পারে তা তার জন্য লাভজনক হবে। আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যে তৈরি পোষাকের সঙ্গে কম্পিউটারের বিনিময় হার ২ থেকে ৫ এককের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

মনে করি আর্ন্তজাতিক বাজারে ১ একক কম্পিউটারের বিনিময়ে ৩ একক তৈরি পোষাক পাওয়া যায়। এ অবস্থায় বাংলাদেশের জন্য তৈরি পোষাক রপ্তানী করে কম্পিউটার আমদানী করা লাভজনক হবে। বাংলাদেশ ৩ একক তৈরি পোষাক রপ্তানী করে ১টি কম্পিউটার পায়। কিন্তু দেশের মধ্যে ১টি কম্পিউটারের জন্য তাকে ৫ একক তৈরি পোষাক ত্যাগ করতে হয়। সুতরাং আমদানীর ফলে তার ২ একক তৈরি পোষাক বাঁচে এবং এই ২ একক তৈরি পোষাক সে নিজে ভোগ করতে পারে বা এর কিছুটা রপ্তানী করে আরও কম্পিউটার আমদানী করতে পারে। উভয়ক্ষেত্রে তার মোট ভোগ বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে দেখানো যায় যে, ১ একক কম্পিউটার=৩ একক তৈরি পোষাক – এই বিনিময় হারে বাণিজ্যের ফলে আমেরিকাও লাভবান হয়।

সার সংক্ষেপ :

১. কোন দেশের কোন পণ্য উৎপাদনের খরচ অন্য দেশের তুলনায় কম হলে ঐ পণ্যে দেশটির পরম সুবিধা আছে। পরম সুবিধার ভিত্তিতে দুটি দেশের মধ্যে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য হতে পারে।

২. দুটি দেশের দুটি পণ্যের উৎপাদন খরচের অনুপাতে যতক্ষণ পর্যন্ত তারতম্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত দেশ দুটির মধ্যে পারস্পরিক সুবিধাজনক বিশেষায়ন ও বাণিজ্য সম্ভব। তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব অনুসারে বিশেষায়নের ফলে দেশগুলো তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ থেকে বেশি পরিমাণ আয় অর্জন করতে সক্ষম হয়।

অনুশীলনী ১৫.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. নিচে দুটি দেশের দুটি পণ্যের একক প্রতি প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ দেওয়া আছে। এ থেকে বলা যায় ‘ক’ দেশের ঃ

ক. বস্ত্র উৎপাদনে পরম সুবিধা আছে।
খ. ইস্পাত উৎপাদনে পরম সুবিধা আছে।
গ. বস্ত্র উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা আছে।
ঘ. ইস্পাত উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা আছে।
ঙ. কোন পণ্যেই তুলনামূলক সুবিধা নেই।

২. বাণিজ্য শুরু হলে খ দেশ

ক. বস্ত্র আমদানী করবে,
খ. বস্ত্র রপ্তানী করবে
গ. উভয় পণ্য আমদানী করবে
ঘ. উভয় পণ্য রপ্তানী করবে
ঙ. আমদানী ও রপ্তানী কোনটিই করবে না।

৩. মনে করুন বাংলাদেশের তুলনায় আমেরিকার তুলা ও চিংড়ী উৎপাদনে পরম সুবিধা আছে। আবার বাংলাদেশের চিংড়ী উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা আছে। এ থেকে বলা যায় যে ঃ

ক. বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে কোন বাণিজ্য হবে না
খ. যে কোন প্রকার বাণিজ্যে আমেরিকা লাভবান হবে
গ. বাংলাদেশের তুলা এবং আমেরিকার চিংড়ী রপ্তানী করা উচিত
ঘ. বাংলাদেশের চিংড়ী ও আমেরিকার তুলা রপ্তানী করা উচিত
ঙ. ভারতের আবাসীগণ বাণিজ্য থেকে কখনও লাভবান হবে না।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে পারস্পরিকভাবে লাভজনক বিশেষায়ন ও বাণিজ্য হতে পারে না- ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ - ৪ : লেনদেনের ভারসাম্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- লেনদেনের ভারসাম্য সম্পর্কে বলতে পারবেন
- লেনদেনের ভারসাম্যের বিভিন্ন খাত সম্পর্কে বলতে পারবেন
- বাণিজ্যের ভারসাম্য সম্পর্কে বলতে পারবেন

১৫.৪.১ : লেনদেনের ভারসাম্য

কোন দেশের লেনদেনের ভারসাম্য বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণতঃ এক বছরে, ঐ দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের সকল প্রকার অর্থনৈতিক লেনদেনের রীতিবদ্ধ বিবরণীকে বুঝায়। এখানে অধিবাসী বলতে শুধু ব্যক্তি বুঝায় না, সরকার এবং ফার্মও বুঝায় যদিও এই ফার্ম কোন বিদেশী সংস্থার শাখা হয়।

একটি দেশের লেনদেনের ভারসাম্য হিসাবে বিদেশীদের নিকট থেকে ঐ দেশের পরিশোধ ও প্রাপ্তি উভয়ই লিপিবদ্ধ করা হয়। বিদেশীদেরকে পরিশোধ করতে হয় এরূপ যে কোন লেনদেনের ভারসাম্য হিসাবে খরচ হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয় এবং এটিতে একটি ঋনাত্মক(–) চিহ্ন দেয়া হয়। বিদেশীদের নিকট থেকে প্রাপ্তির উদ্ভব হয় এরূপ যেকোন লেনদেন জমা হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয় এবং এটিতে একটি ধনাত্মক (+) চিহ্ন দেয়া হয়।

১৫.৪.২ : লেনদেনের ভারসাম্যের বিভিন্ন খাত

লেনদেনের ভারসাম্য হিসাবকে কয়েকটি প্রধান খাতে ভাগ করা হয়। সারণী ১৫.৪-এ একটি লেনদেনের ভারসাম্য হিসাবের সরলীকৃতরূপ দেখানো হয়েছে। লেনদেনের ভারসাম্য হিসাবকে চারটি প্রধান খাতে ভাগ করা হয়েছে। যথা: চলতি হিসাব, মূলধন হিসাব, পরিসংখ্যানগত ত্রুটি এবং বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিবর্তন।

চলতি হিসাবে ঐসব লেনদেন অর্ন্তভুক্ত থাকে যেগুলো চলতি আয় সৃষ্টি বা চলতি আয় খরচের সঙ্গে চলতি হিসাব সংযুক্ত। চলতি হিসাবকে তিনভাগে ভাগ করা হয় - দ্রব্য বাণিজ্য, সেবাকর্মে বাণিজ্য এবং নীট অপরিশোধিত হস্তান্তর। আর্ন্তজাতিক সীমান্ত অতিক্রম করার সময় যে সকল বস্তু দেখা যায় এবং স্পর্শ করা যায়, দ্রব্য বাণিজ্যের মধ্যে তা অর্ন্তভুক্ত করা হয়। দ্রব্যের রপ্তানী ধনাত্মক দফা হিসাবে এবং দ্রব্যের আমদানী ঋণাত্মক দফা হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। রপ্তানী সাধারণত: এফওবি ভিত্তিতে হিসাব করা হয় অর্থাৎ পরিবহন, ইন্স্যুরেন্স খরচ ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত করা হয় না। তবে আমদানী সিআইএফ ভিত্তিতে হিসাব করা হয় অর্থাৎ দামের মধ্যে পরিবহন, ইন্স্যুরেন্স খরচ ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত করা হয়। দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর স্থিতিকে দৃশ্যমান বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বা দ্রব্যসামগ্রীর বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বা সংক্ষেপে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলে।

সেবাকর্মে বাণিজ্যের মধ্যে অ-উপাদান সেবাকর্ম যেমন-জাহাজভাড়া, ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স সেবা, পর্যটকদের ব্যয় ইত্যাদি এবং উপাদান সেবাকর্ম যেমন-সুদ, মুনাফা এবং লভ্যাংশ যা উৎপাদনের উপাদান ব্যবহারের জন্য দেয়া হয় (বা পাওয়া যায়) অর্ন্তভুক্ত থাকে। যেহেতু সেবাকর্মে বাণিজ্য দেখা যায় না এবং স্পর্শ করা যায় না সেবাকর্মের আমাদনী ও রপ্তানীর স্থিতিকে অদৃশ্যমান বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলা হয়।

এক তরফা হস্তান্তর বা অপরিশোধিত হস্তান্তর বলতে একটি দেশের অধিবাসীদের ঐ সব প্রাপ্তিকে বুঝায় যা তারা "বিনামূল্যে" পায় এবং এর প্রতিদান স্বরূপ ভবিষ্যতে কোন কিছু প্রদান করতে হয় না। যেমন- বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের অর্থ প্রেরণ, বৈদেশিক সরকারের কাছ থেকে

বিশুদ্ধ সাহায্য ইত্যাদি। বিদেশ থেকে প্রাপ্তি ও বিদেশে প্রদানের পার্থক্য নীট অপরিশোধিত হস্তান্তর হিসেবে দেখানো হয়।

দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান বাণিজ্য ও একতরফা হস্তান্তরের স্থিতির নীট মূলকে একত্রে চলতি হিসাবের ভারসাম্য বলা হয়।

সারণী ১৫.৪ : লেনদেনের ভারসাম্য হিসাব

দেনা (-)		পাওনা (+)
	চলতি হিসাব	
দ্রব্য আমদানী সেবাকর্ম আমদানী নীট অপরিশোধিত হস্তান্তর		দ্রব্য রপ্তানী সেবাকর্ম রপ্তানী
	মূলধনি হিসাব	
বিদেশে দেশের পরিসম্পদের নীট বৃদ্ধি		দেশে বিদেশের পরিসম্পদের নীট বৃদ্ধি
	পরিসংখ্যানগত ত্রুটি	
	বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিবর্তন	

মূলধন হিসাব

একটি দেশের নাগরিক বা সরকার কোন বিদেশী নাগরিক বা সরকারকে কোন ঋণ দান করলে বা কোন সম্পদ ক্রয় করলে (ঋণাত্মক ভুক্তি) বা তাদের কাছ থেকে কোন ঋণ গ্রহণ করলে তা মূলধন হিসাবে অলিপিবদ্ধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকার বিদেশের কাছ থেকে ১ ডলার ঋণ নিলে সরকার তাদের কাছে একটি পরিসম্পদ বিক্রয় করে - ভবিষ্যতে সুদসহ ১ ডলার পরিশোধের প্রতিজ্ঞা করতে হবে। এরূপ লেনদেন মূলধন হিসাবে ঋণাত্মক ভুক্তি হিসাবে দেখা দেয় কারণ ঋণের অর্থ বাংলাদেশের পণ্য প্রাপ্তি বা মূলধনের অন্ত:প্রবাহ। মূলধন হিসাবের লেনদেন নানারূপ হতে পারে, যেমন-ব্যক্তিগত বা সরকারী লেনদেন, প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা পত্রকোষ বিনিয়োগ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূলধন বা স্বল্পমেয়াদী মূলধন। মূলধন হিসাবের সকল আদান-প্রদানের নীট মূল্যকে মূলধন হিসাবের ভারসাম্য বলা হয় এবং এই ভারসাম্য ধনাত্মক হলে নীট মূলধন অন্তঃপ্রবাহ ঘটে এবং ঋণাত্মক হলে নীট মূলধন বহিঃপ্রবাহ ঘটে।

পরিসংখ্যানগত ভুলত্রুটি

পরিসংখ্যানগত ভুলত্রুটি

লেনদেনের ভারসাম্য হিসাবে যে লক্ষ লক্ষ পৃথক লেনদেন অর্ন্তভুক্ত করা হয় সে সবের পরিপূর্ণ ও নির্ভুল হিসাব পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। লেনদেনের হিসাব লিপিবদ্ধ করায় নানারূপ ভুলত্রুটি হয়, তথ্য পেতে অনেক সময় দেরী হয়, চোরাকারবার হয় বা অর্থ প্রদানের পরিমাণ কম করে দেখানো ইত্যাদি কারণে লেনদেনের হিসাবের দেনা ও পাওনার দিকে একেবারে সমান হয় না। এই সমতা আনার জন্য যে সমন্বয় প্রয়োজন সেটিকে পরিসংখ্যানগত ভুলত্রুটি হিসেবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিবর্তন

পরিশেষে যে দেশের লেনদেনের ভারসাম্য হিসাব বিবেচনা করা হয় সেদেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিবর্তন হতে পারে। মুদ্রার মজুদ তিন প্রকার হতে পারে - আমেরিকান ডলার, সোনা এবং আর্ন্তজাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে ঋনকৃত এসডিআরস। মনে রাখা দরকার যে, মুদ্রার মজুদ দেশের অভ্যন্তরে রাখা প্রয়োজনীয় নয়। বস্তুতঃপক্ষে অধিকাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের মজুদের কিছু অংশ বিদেশী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাবে জমা রাখে। লেনদেনের হিসাবের অন্যান্য সকল দফার নীট মূল্যে প্রতিফলন ঘটে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিবর্তনে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিবর্তন এবং অন্যান্য অর্ন্তভুক্ত দফার নীট মূল্যের মধ্যে যে তারতম্য তাই

পরিসংখ্যানগত ভুলত্রুটি হিসাবে সনাক্ত করা হয়। লেনদেনের ভারসাম্যের হিসাব এমনভাবে করা হয় যে, এই চারটি দফার যোগফল শূন্য হয়।

১৫.৪.৩ : বাণিজ্যের ভারসাম্য

দ্রব্যের আমদানীকৃত রপ্তানীর (+) নীট মূল্যকে বাণিজ্যের ভারসাম্য বলা হয়। আমরা জানি যে লেনদেনের ভারসাম্য একটি দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের দ্রব্য, সেবাকর্ম, একপাক্ষিক হস্তান্তর, পরিসম্পদের লেনদেনের বিবরণ দেয়। সুতরাং বাণিজ্যের ভারসাম্য একটি দেশের আর্ন্তজাতিক লেনদেনের আংশিক চিত্র দেয়। তবুও বাণিজ্যের ভারসাম্যের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়- বিশেষত : দেশের সংবাদ মাধ্যমে এটির উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রচার মাধ্যমে গুরুত্ব পাওয়ার একটি কারণ অবশ্য দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্ত উপাত্ত তুলনামূলকভাবে সহজে পাওয়া যায়। সেবাকর্ম বা পরিসম্পদের লেনদেনের উপাত্ত কিছুটা দেরীতে পাওয়া যায়।

বাণিজ্যের ভারসাম্যের অবস্থার ব্যাখ্যা কৌশলপূর্ণ হতে পারে। বাণিজ্যের ভারসাম্যের উদ্বৃত্তকে ভাল এবং ঘাটতিকে খারাপ বিবেচনা করা হয়। উদ্বৃত্তের অর্থ হচ্ছে বিদেশে আমাদের দেশের দ্রব্যের চাহিদা ভাল এবং আমাদের দেশের অধিবাসীরা দেশীয় পণ্য বেশী ক্রয় করছে। সুতরাং দেশীয় অর্থনীতি ভাল অবস্থায় আছে। অপর দিকে ঘাটতির অর্থ আমাদের দ্রব্য বিশ্ববাজারে যথেষ্ট প্রতিযোগিতামূলক নয় এবং আমাদের জীবনযাপনের মান রক্ষা করার জন্য কিছু পরিবর্তন অবশ্য দরকার। এই বিশ্লেষণকে সঠিক বলা যায় যদি বিশ্ববাজারে আমাদের দ্রব্যের চাহিদার বৃদ্ধি বা হ্রাসের ফলে বাণিজ্যের ভারসাম্যে এই উদ্বৃত্ত বা ঘটতি হয়। কিন্তু অন্যান্য কারণেও বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস খাতে মুনাফার সুযোগ নেয়ার জন্য বিদেশী বিনিয়োগ আসতে পারে। এজন্য প্রচুর মূল্যবান যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হবে এবং ফলে বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি হবে। কিন্তু এ ধরনের ঘাটতিতে উদ্বিগ্ন হলে ভুল করা হবে। কারণ, এই অতিরিক্ত বিনিয়োগ দেশের উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

সারসংক্ষেপ :

১. লেনদেনের ভারসাম্য একটি দেশের আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য এবং আর্থিক লেনদেনের বার্ষিক হিসাব বিবরণী। রপ্তানীকে পাওনা এবং আমদানীকে দেনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

২. লেনদেনের ভারসাম্যের প্রধান অংশগুলো হচ্ছে :
ক. চলতি হিসাব খ. মূলধন হিসাব
গ. পরিসংখ্যানগত হিসাব ঘ. বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিবর্তন
লেনদেনের ভারসাম্য হিসাবের নিয়ম অনুসারে এই চারটি দফার যোগফল শূন্য হবে।

৩. বাণিজ্যের ভারসাম্যের অবস্থা বিশ্লেষণের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। বাণিজ্যের ভারসাম্যের ঘাটতি খারাপ চোখে দেখা হয়। তবে দেশে বিনিয়োগ চাহিদা বৃদ্ধির ফলে আমদানী চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং ফলে ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

অনুশীলনী ১৫.৪

নৈর্ব্যাক্তিক প্রশ্ন :

১. অনুকূল বাণিজ্যের ভারসাম্য বলতে বুঝায়-

ক. দ্রব্য সামগ্রীর আমদানী ও চলতি হিসাবের অন্যান্য দেনার তুলনায় দ্রব্য সামগ্রীর রপ্তানী ও চলতি হিসাবের অন্যান্য পাওনার পরিমাণ বেশি।
খ. দ্রব্য সামগ্রীর আমদানীর চেয়ে দ্রব্য সামগ্রীর রপ্তানীর পরিমাণ বেশি
গ. লেনদেনের ভারসাম্যের মোট দেনার চেয়ে পাওনার পরিমাণ বেশি
ঘ. মোট আমদানীর মূল্যের চেয়ে মোট রপ্তানীর মূল্য বেশি।

২. চলতি হিসাবের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হয়-
ক. বাংলাদেশের বিদেশে স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ
খ. বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের উপর সুদ
গ. বিদেশীদের বাংলাদেশের শেয়ার ক্রয়
ঘ. বাংলাদেশে বিদেশী মালিকানাধীন মোট পরিসম্পদ।

৩. মূলধন হিসাবের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হয়-
ক. দ্রব্য সামগ্রী আমদানী
খ. দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানী
গ. বিদেশকে দেয়া সরকারের দান
ঘ. বাংলাদেশে বৈদেশিক পরিসম্পদের পরিবর্তন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. লেনদেনের ভারসাম্যের প্রধান অংশগুলো কি কি?
২. বাণিজ্যের ভারসাম্যের ঘাটতি সবসময় উদ্বেগজনক নয় কেন ?

পাঠ-৫ : অবাধ বাণিজ্যের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- অবাধ বাণিজ্য কি তা বলতে পারবেন
- অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তিসমূহ বলতে পারবেন
- অবাধ বাণিজ্যের বিপক্ষে যুক্তিসমূহ বলতে পারবেন

১৫.৫.১ অবাধ বাণিজ্য

যদি আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানী ও রপ্তানীর উপর কোনরূপ বাধা নিষেধ আরোপ না করা হয় তাহলে এরূপ বাণিজ্যকে অবাধ বাণিজ্য বলে। অবাধ বাণিজ্যে পণ্য অবাধে এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমনাগমন করে। প্রত্যেক দেশ অবাধে পণ্য আমদানী করে তার চাহিদা মেটাতে পারে এবং প্রত্যেক দেশের রপ্তানী অবাধে অন্যদেশে প্রবেশ করতে পারে।

১৫.৫.২ <u>অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তিসমূহ</u> : অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলো দেখানো হয়ে থাকে ঃ-

ক. আর্ন্তজাতিক বিশেষায়ন ঃ প্রত্যেক দেশের সম্পদ ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য থাকে। সুতরাং প্রত্যেক দেশ বিভিন্ন পণ্য বিভিন্ন খরচে উৎপাদন করতে পারে। একটি দেশ অন্য দেশের তুলনায় কম খরচে যে সব পণ্য উৎপাদন করতে পারে সেসব পণ্য উৎপাদন করা উচিত এবং এসব পণ্য বিনিময় করে যেসব পণ্যের উৎপাদন খরচ বেশি সেসব পণ্য আমাদনী করা উচিত। এভাবে বিশেষায়নের ফলে প্রত্যেক দেশ তার সীমিত সম্পদ থেকে বেশি পরিমাণে আয় লাভ করতে সক্ষম হয়।

খ. অবাধ বাণিজ্য ও দক্ষতা ঃ বাণিজ্যে বাধানিষেধ আরোপ করলে তা দক্ষতার ক্ষতি সৃষ্টি করে। আমদানীর উপর শুল্ক আরোপ করলে ভোক্তাদেরকে বেশি দাম দিয়ে পণ্যটি ভোগ করতে হয়। আবার পণ্যটি উৎপাদনে এই দেশের তুলনামূলক অসুবিধা থাকায় এটি উৎপাদনে বিদেশের তুলনায় বেশি পরিমাণ উপকরণ ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার হয়। অবাধ বাণিজ্য এসব ক্ষতি দূর করে এবং জাতীয় কল্যাণ বৃদ্ধি করে।

গ. অবাধ বাণিজ্য ও উৎপাদন খরচ ঃ সংরক্ষণের ফলে শিল্পে প্রতিযোগিতা হ্রাস পায় এবং মুনাফা বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ নেয়ার জন্য দেশীয় বাজার ছোট হওয়া সত্ত্বেও অনেক ফার্ম পণ্যটি উৎপাদন করে। ফলে অর্থনীতি বর্ধিত উৎপাদনজনিত ব্যয়-সংকোচ এর সুবিধা লাভে বঞ্চিত হয়। অবাধ বাণিজ্যে প্রতিযোগিতার ফলে অদক্ষ ফার্ম শিল্প ত্যাগ করে এবং স্বল্প সংখ্যক দক্ষ ফার্ম উৎপাদনে নিয়োজিত থাকে। উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত প্রতিদানের কারণে স্বল্প সংখ্যক ফার্ম অনেক পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করায় উৎপাদন খরচ কম পড়ে।

ঘ. রাজনৈতিক যুক্তি ঃ কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে শুল্ক ও রপ্তানী ভুর্তকী জাতীয় কল্যাণ বৃদ্ধি করে। কিন্তু সংরক্ষণ ও ভর্তুকী যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত বিশেষ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর তৎপরতার জন্য সরকার সেসবক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহার করতে পারে না। বরং বিশেষ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী যেসব ক্ষেত্রে সংরক্ষণ বা ভর্তুকী দাবী করে সেসব ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করতে হয়। ফলে অর্থনীতির কল্যাণ হ্রাস পায়। এজন্য সাধারণভাবে অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করা উচিত যাতে কোন বিশেষ গোষ্ঠী চাপ দিয়ে সরকারের কাছে অনাকাংক্ষিত সুবিধা আদায় করতে না পারে।

১৫.৫.৩ <u>অবাধ বাণিজ্যের বিপক্ষে যুক্তিসমূহ</u> ঃ অবাধ বাণিজ্যের বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহ দেখানো হয়ে থাকে ঃ-

ক. বাণিজ্য শর্ত যুক্তি ঃ অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ না করে কাম্য শুল্ক ও রপ্তানী কর আরোপ করে একটি দেশ তার বাণিজ্য শর্তের উন্নতি করতে সক্ষম হয়। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এযুক্তিটি

গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ ছোট দেশসমূহ তাদের আমদানী ও রপ্তানীর দাম প্রভাবিত করতে পারে না এবং ফলে শুল্ক বা অন্যান্য নীতির মাধ্যমে তাদের বাণিজ্য শর্তের উন্নতি করতে পারে না। বড় দেশগুলো তাদের আমদানী ও রপ্তানরি দাম প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু তারা শুল্ক আরোপ করলে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে অন্য দেশও এরূপ ব্যবস্থা নিতে পারে।

খ. দেশীয় বাজার ব্যর্থতার যুক্তি ঃ যদি কোন দেশীয় বাজার যথাযথভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্য নীতি ত্যাগ করা অর্থনীতির জন্য সঠিক কল্যাণকর হতে পারে। যেমন- মনে করি, দেশের শ্রম বাজার যথাযথভাবে কাজ করে না (বেকারত্ব থাকতে পারে) এরূপ অবস্থায় সরকার শ্রম বাজারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যে সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করতে পারে। তবে বাজার ব্যর্থতা সমস্যা নিরসনের জন্য বাণিজ্য নীতি ব্যবহার না করে বিশেষ বাজারের জন্য নির্দিষ্ট নীতি ব্যবহার করা শ্রেয়। যেমন-শ্রম বাজারে নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য আর্থিক বা রাজস্ব নীতি নেয়া যায়।

গ. অনুন্নত দেশসমূহের ক্ষেত্রে যুক্তি ঃ অবাধ বাণিজ্য অনুন্নত দেশের শিল্পায়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। কারণ, এসব দেশের নতুন শিল্প উন্নত দেশের প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। এজন্য শিশু শিল্পকে সংরক্ষণ করা উচিত। অনেকের মতে বর্তমান আর্ন্তজাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অন্যায্য এবং উন্নত বিশ্বের সম্পদের কারণে অনুন্নত বিশ্বে দারিদ্র বিদ্যমান। এসব উন্নয়নের কুফল থেকে রক্ষা করার জন্য অনুন্নত দেশসমূহের অবাধ বাণিজ্য নীতি ত্যাগ করা প্রয়োজন।

সার সংক্ষেপ :

১. যদি বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্যের অবাধ প্রবাহে সরকার কোনরূপ বাধানিষেধ আরোপ না করে তাহলে এরূপ অবস্থাকে অবাধ বাণিজ্য বলে।
২. অবাধ বাণিজ্য বিশেষায়নের সুযোগ দেয়, দক্ষতা ক্ষতি এড়ায়, উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত প্রতিদানের সুফল সৃষ্টি করে এবং স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর দাবী এড়ায়।
৩. অবাধ বাণিজ্যের বাণিজ্য শর্তের উন্নতি অর্জন, দেশীয় কোন বাজার ব্যর্থতার প্রতিকার এবং অনুন্নত দেশসমূহের শিল্পায়ন -এর পথে বাধা স্বরূপ।

অনুশীলনী ১৫.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. অবাধ বাণিজ্য বলতে বুঝায়-
   ক. মূলধনের অবাধ প্রবাহ   খ. শ্রমের অবাধ প্রবাহ
   গ. পণ্যের অবাধ প্রবাহ   ঘ. পণ্য ও শ্রমের অবাধ প্রবাহ

২. অবাধ বাণিজ্যের পথে অন্তরায় নয়-
   ক. তৈরী পোশাক শিল্পে শিশুশ্রম ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ, আমদানীকারকদের নিষেধাজ্ঞা
   খ. তৈরী পোশাকের উপর শুল্ক আরোপ
   গ. তৈরী পোশাকের উৎপাদন পরিবেশের উন্নতির জন্য আমদানীকারকদের দাবী
   ঘ. আমদানীকারক দেশে আয়করের হার বৃদ্ধি।

৩. নিচের কোনটি অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তি নয় -
   ক. বিশেষায়নের সুযোগ   খ. দক্ষতা ক্ষতি এড়ানো
   গ. ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত প্রতিদানের সুযোগ   ঘ. শিশু শিল্প সংরক্ষণ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে কি কি যুক্তি দেখানো হয় ?
২. অবাধ বাণিজ্যের বিপক্ষে কি কি যুক্তি দেখানো হয় ?

পাঠ - ৬ : সংরক্ষিত বাণিজ্যের সপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সংরক্ষণ বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তিসমূহ বলতে পারবেন।
- সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তিসমূহ বলতে পারবেন।

১৫.৬.১ : সংরক্ষণ

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে আমদানী ও রপ্তানীর নিয়ন্ত্রণকে সংরক্ষণ বলে। সংরক্ষণের মাধ্যমে সাধারণতঃ বিশেষ বিশেষ পণ্যের আমদানী বিভিন্ন মাত্রায় নিরুৎসাহিত করা হয় এবং বিশেষ বিশেষ পণ্যের রপ্তানী বিভিন্ন মাত্রায় উৎসাহিত করা হয়। শুল্ক এবং নানারূপ অশুল্ক বাধা যেমন – কোটা, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির মাধ্যমে আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং রপ্তানী কর বা ভর্তুকীর মাধ্যমে রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

১৫.৬.২ <u>সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তি</u> ঃ সংরক্ষণের সপক্ষে সাধারণত: নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহ দেখানো হয়ে থাকে ঃ-

ক. শিশু শিল্পের সংরক্ষণ যুক্তি ঃ কোন দেশ একটি শিল্প অন্য দেশের তুলনায় দেরীতে শুরু করতে পারে। অবাধ বাণিজ্য অবস্থায় এই শিল্পটি বিদেশের সুপ্রতিষ্ঠিত এবং কম খরচে উৎপাদনক্ষম শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম হবে না। এ অবস্থায় শিশু শিল্পটাকে ততদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ দেয়া উচিত যতদিন পর্যন্ত না এটি প্রতিযোগিতামূলক হয়।

খ. আমদানী মূল্য হ্রাস ঃ আমাদনীর উপর শুল্ক আরোপ করলে এটির দাম বেড়ে যায় এবং ফলে আমাদানী চাহিদা কমে যায়। কোন বড় দেশ আমদানীর উপর শুল্ক আরোপ করলে এর চাহিদা এত কমে যেতে পারে যে আর্ন্তজাতিক বাজারে পণ্যটির দাম হ্রাস পেতে পারে। সুতরাং শুল্ক আরোপ করে বড় দেশ কম দামে আমদানী করতে ও কল্যাণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

গ. প্রতিরক্ষাঃ কোন কোন শিল্প দেশের প্রতিরক্ষার জন্য অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়। এসব পণ্য বিদেশ থেকে কম খরচে পাওয়া যায় কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে এসব পণ্যের যোগান পাওয়া দুরূহ হতে পারে। এরূপ অবস্থায় প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত শিল্পকে সংরক্ষণ দিতে হয়। তবে এসব ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার সঙ্গে ক্ষীণতম যোগাযোগ আছে এরূপ শিল্পও সংরক্ষণ চাইতে পারে।

ঘ. বিশেষ বিশেষ শিল্পের সংরক্ষণ ঃ অবাধ বাণিজ্য সমগ্র দেশের জন্য লাভজনক হলেও এর ফলে বিশেষ বিশেষ শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যে সকল শিল্প সুলভ বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতায় হুমকির সম্মুখীন হয় সেসব শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ী ও শ্রমিকগণ শিল্পের সংরক্ষণ দাবী করে। সংরক্ষণের ফলে এসব শিল্প টিকে থাকতে সক্ষম হয়।
মনে রাখা দরকার যে সংরক্ষণের ফলে দ্রব্যের দাম বাড়ে। ফলে ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং উৎপাদন দক্ষতার ক্ষতি হয়। এ অবস্থায় বিপন্ন শিল্পকে রক্ষার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। শিল্পটাকে প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য কারিগরী সাহায্যের এবং আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা যায়। শিল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে যেসব শ্রমিক চাকুরী হারায় তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা যায়। যেমন- পুন; ট্রেনিং ব্যবস্থা, বেকারত্ব ভাতা ইত্যাদি বা নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা নেয়া যায়।

ঙ. রাজস্ব উদ্দেশ্য ঃ আমদানী শুল্ক সরকারের রাজস্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তবে বর্তমানে উন্নত দেশে সরকারী আয়ের অতি সামান্য অংশ বাণিজ্যের উপর আরোপিত কর থেকে আসে। অবশ্য অনুন্নত দেশে যেমন-বাংলাদেশ, বাণিজ্যের উপর কর এখনও সরকারী আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

চ. অর্থনৈতিক মন্দার মোকাবেলা ঃ অর্থনৈতিক মন্দার সময় দেশীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। আমাদনী শুল্ক আরোপের ফলে পন্যের দাম বৃদ্ধি পায়। ফলে বিদেশী পণ্যের চাহিদা হ্রাস এবং দেশীয় পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দেশীয় আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। তবে যদি এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ তাদের আমদানীর উপর অনুরূপ শুল্ক আরোপ করে তাহলে মন্দাবস্থা আরো দীর্ঘায়িত এবং প্রকট হতে পারে।

ছ. লেনদেনের ভারসাম্য ঘাটতি দূরীকরণ ঃ রপ্তানীর তুলনায় আমদানী বেশি হওয়ার ফলে একটি দেশে লেনদেনের ভারসাম্য ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এরূপ অবস্থায় সরকার আমদানী হ্রাস করে ঘাটতি দূর করতে পারে। তবে দেখা গেছে যে লেনদেনের ভারসাম্য ঘাটতি দূর করার জন্য অন্যান্য নীতি যেমন-আর্থিক নীতি, রাজস্ব নীতি বা মুদ্রার অবমূল্যায়ন অধিক কার্যকর।

জ. সস্তা বিদেশী শ্রমের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ঃ উন্নত দেশসমূহে বলা হয় যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহে শ্রম এত সস্তা যে তাদের উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে উন্নত দেশে উৎপাদিত পণ্য প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না। আবার উন্নয়নশীল দেশসমূহে বলা হয় যে, উন্নত বিশ্বের দেশগুলো প্রযুক্তিগতভাবে এত উন্নত যে তাদের তৈরী পণ্যের সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের পন্য প্রতিযোগিতায় টিকবে না। প্রকৃতপক্ষে উভয় যুক্তিই তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্বের ভিত্তি ছাড়াই করা হয়। তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্বের সাহায্যে দেখানো যায় যে দুটি অসমভাবে উন্নত দেশও পরস্পরের সঙ্গে বাণিজ্য থেকে লাভ পেতে পারে।

১৫.৬.৩ <u>সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তিসমূহ</u> ঃ সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তিসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল ঃ-

ক. বিশেষায়নের অন্তরায় ঃ সংরক্ষণের বিপক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হল এটি তুলনামূলক সুবিধার ভিত্তিতে আর্ন্তজাতিক বিশেষায়নের পথে বাধা স্বরূপ। যে সকল শিল্পে তুলনামূলক সুবিধা আছে শ্রম এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক উপকরণ সেসব শিল্পে নিয়োজিত না হয়ে সংরক্ষিত শিল্পে নিয়োজিত হয়। ফলে সম্পদের কাম্য সদ্ব্যবহার হয় না এবং বিশ্ব আর যা হওয়া উচিত তার চেয়ে কম হয়।

খ. অর্থনৈতিক দক্ষতা ক্ষতি ঃ সংরক্ষণের ফলে পন্যের দাম বৃদ্ধি পায়। বেশি দামে দ্রব্য ক্রয় করতে হয় বলে ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অপরদিকে বিদেশে যে পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করে পণ্যটি উৎপাদিত হত দেশের মধ্যে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করে পণ্যটি উৎপাদন করতে হয় বলে প্রকৃত সম্পদের অপচয় হয়।

গ. দুর্বল শিল্পের অস্তিত্ব ঃ শিশু শিল্প প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত এটি সংরক্ষণের প্রয়োজন স্বীকার করা হয়। কিন্তু সংরক্ষণের সুবিধার ফলে এসব শিল্প দক্ষতা বৃদ্ধির প্রেরণা বোধ করে না। ফলে শিশু শিল্পে চিরকাল শিশু থেকে যায়, কখনও পুর্ণবর্ধিত হয় না।

ঘ. অন্যান্য অসুবিধা ঃ সংরক্ষণের জন্য বিশেষ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠির জন্ম হয়। তারা সরকারের কাছে লবিং করে বা অসাধু পদ্ধতিতে নিজেস্ব বিল্লের সংরক্ষণ নিশ্চিত করে। এর ফলে প্রকৃত সম্পদের অপচয় হয়।

সারসংক্ষেপ :

১. দেশের আমদানী ও রপ্তানীর উপর কোন শুল্ক বা অশুল্ক বাধা আরোপ করলে তাকে সংরক্ষণ বলে।
২. সংরক্ষণের সপক্ষে অনেক যুক্তি দেখানো হয়। এর মধ্যে শিশু শিল্পের সংরক্ষণ, বাণিজ্য শর্তের উন্নতি এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা যুক্তির উত্তম ভিত্তি আছে। অন্যান্য যুক্তিগুলো ভ্রান্তিমূলক।
৩. সংরক্ষণ বিশেষায়ণের অন্তরায়, অর্থনৈতিক দক্ষতার জন্য ক্ষতিকারক, দুর্বল শিল্পের পৃষ্ঠপোষক এবং স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠী উদ্ভবের সহায়ক হিসাবে কাজ করে।

অনুশীলনী ১৫.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. নিচের কোনটি সংরক্ষণের যুক্তি নয়-
   ক. শিশু শিল্প যুক্তি,
   খ. জাতীয় প্রতিরক্ষা যুক্তি,
   গ. সর্বাপেক্ষা সুবিধা প্রাপ্ত জাতি ধারা,
   ঘ. সস্তা বিদেশী শ্রম যুক্তি

২. নিচের কোনটি সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি-
   ক. আমদানী শুল্ক থেকে আয়ের পরিমাণ নগণ্য,
   খ. আমদানী কমিয়ে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো যায়,
   গ. শিশু শিল্প কখনও পুর্ণবর্ধিত হয় না,
   ঘ. আর্ন্তজাতিক মুদ্রা তহবিল সংরক্ষণ বিরোধী।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. সংরক্ষণের সপক্ষের উত্তম যুক্তিগুলো লিখ।
২. সংরক্ষণের বিপক্ষের যুক্তিগুলো লিখ।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক লেনদেন

ইউনিট
১৬

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি মুক্ত অর্থনীতির দেশ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তার বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জাতির জন্য নতুন সুযোগের সৃষ্টি করে। আবার বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক কিছু প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করে। এজন্য দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। আমরা এ ইউনিটে বাংলাদেশের বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তনের ধারা, বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়ন নীতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

পাঠ ১ : বাংলাদেশের বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তনের ধারা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের বাণিজ্যের পরিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে বলতে পারবেন।

১৬.১.১. বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হল :

ক. **বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি ঃ** বাংলাদেশের রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ বেশি। ফলে তার বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি দেখা যায়। তবে আমাদের আমদানির বেশির ভাগ হচ্ছে মূলধনী দ্রব্য, মাধ্যমিক পণ্য ও শিল্পের জন্য কাঁচামাল যা দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সহায়ক।

খ. **বাণিজ্য শর্তের উঠানামা ঃ** রপ্তানি মূল্য ও আমদানি মূল্যের অনুপাতকে বাণিজ্য শর্ত বলে। বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত স্থির নয়, প্রায় প্রতি বছরই উঠানামা করে। বাণিজ্য শর্তের উঠানামার ফলে রপ্তানির ক্রয় ক্ষমতা উঠানামা করে।

গ. **মুষ্ঠিমেয় রপ্তানি দ্রব্য ঃ** বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য মুষ্টিমেয় কয়েকটি দ্রব্যের মধ্যে কেন্দ্রভূত। তৈরি পোশাক, হোসিয়ারী দ্রব্য, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য ও চামড়া থেকে রপ্তানি আয়ের শতকরা ৯০ ভাগ আসে। গিনি কেন্দ্রীভবন অনুপাত থেকে দেখা যায় রপ্তানির এই কেন্দ্রীয় ভবন ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঘ. **গুটি কয়েক দেশে রপ্তানি ঃ** বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এর ভৌগলিক কেন্দ্রীভবন। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপীয় সংঘভুক্ত উন্নত দেশগুলোতে রপ্তানির সিংহ ভাগ যায়।

ঙ. **রপ্তানি বাণিজ্যের গঠন ঃ** বাংলাদেশের রপ্তানির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এতে প্রাথমিক পণ্যের অংশ কম এবং শিল্পজাত পণ্যের অংশ বেশি।

চ. **সার্কভূক্ত দেশ সমূহের সঙ্গে বাণিজ্য ঃ** সার্কভূক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ খুব কম। এসব দেশে থেকে আমদানির পরিমাণ বেশি। বিশেষতঃ বাংলাদেশ ভারত থেকে প্রচুর দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করে। ভারত থেকে চোরাচালান হয়ে যে সব পণ্য আসে তার পরিমাণও খুব বেশি।

ছ. **আমদানির গঠন ঃ** বাংলাদেশের আমদানির মধ্যে ভোগ্যপণ্যের পরিমাণ কম এবং মূলধনী পণ্য, মধ্যবর্তী পণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল-এর পরিমাণ বেশি। প্রকৃতপক্ষে দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য-তৈরি পোশাক ও নীট ওয়ার-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সুতা ও অন্যান্য দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ ক্রমশঃ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জ. **জনশক্তি রপ্তানি ঃ** বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আসে জনশক্তি রপ্তানি থেকে।

ঝ. **ব্যক্তিগত খাতের গুরুত্ব ঃ** বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রায় সবটাই ব্যক্তিগত খাতের উদ্যোগে পরিচালিত হয়।

ঞ. **রপ্তানি পণ্যের মূল্য সংযোজন ঃ** আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক ও নীট ওয়্যার-এর উৎপাদনের জন্য মূলধনী দ্রব্য ও কাঁচামালের অধিকাংশই আমদানি করা হয়। এজন্য রপ্তানি পণ্যের মূল্য সংযোজনের পরিমাণ কম। এই শিল্পের সঙ্গে অগ্রবর্তী ও পশ্চাদবর্তী সংযুক্ত শিল্পের উন্নতি করে এ সমস্যা হ্রাস করা যায়।

১৬.১.২. স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বাণিজ্যের পরিবর্তনের ধারা

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে সকল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা নিচে আলোচনা করা হল ঃ

ক. **বাণিজ্যের ভারসাম্যের ঘাটতি হ্রাস ঃ** সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির তুলনায় রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির হার বেশি। ফলে বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। জি,ডি,পি-এর শতকরা অংশ হিসেবে এই ঘাটতির পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে।

খ. **বাণিজ্য শর্তের নিম্নগতি ঃ** বাণিজ্যশর্তের প্রবণতায় সামান্য নিম্নগতি দেখা যায়। বাণিজ্য শর্তের এই প্রবণতার অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশের ১ একক রপ্তানি ক্রমান্বয়ে কম পরিমাণ আমদানি ক্রয় করতে সক্ষম।

গ. **রপ্তানি বাণিজ্যের পরিবর্তন ঃ** রপ্তানি বাণিজ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমতঃ ১৯৭০ এর দশক এবং ১৯৮০-এর দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত রপ্তানি বাণিজ্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু এ পণ্য দুটোর গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে রপ্তানি বাণিজ্যে ক্রমশঃ তৈরি পোশাক ও নীট ওয়্যার কেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে রপ্তানি বাণিজ্যে সরকারী খাতের, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের এবং পণ্য বিনিময় বাণিজ্যের যে গুরুত্ব ছিল বর্তমানকালে তা নেই। এর পরিবর্তে বর্তমানকালে ব্যক্তিগত খাতের এবং উত্তর আমেরিকার ও ইউরোপীয় সংঘভূক্ত দেশগুলোর ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃতীয়তঃ রপ্তানি বাণিজ্যে কৃষিজাত পণ্যের পরিবর্তে শিল্পজাত পণ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ. **আমদানি বাণিজ্যে পরিবর্তন ঃ** পূর্বে বিশেষতঃ ১৯৭০-এর দশকে আমদানি বাণিজ্যে খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। দেশে খাদ্য শস্যের উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্য শস্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। তবে কোন বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খাদ্য উৎপাদন কম হলে ঐ বছর সাময়িকভাবে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পূর্বে

খাদ্যসহ ভোগ্যপণ্য আমদানির বড় অংশ জুড়ে থাকত। কিন্তু বর্তমানে মূলধনী দ্রব্য ও উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য আমাদের আমদানি নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঙ. **জনশক্তি রপ্তানি ঃ** জনশক্তি রপ্তানি থেকে আয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে রেমিট্যান্স এর অর্থের বেশির ভাগ যুক্তরাজ্য থেকে আসত। এখন বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের বেশিরভাগ আয় আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে।

চ. **সার্কভুক্ত দেশসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধি ঃ** বর্তমানকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষত বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্যে সার্কভুক্ত দেশসমূহের বিশেষত ভারতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বিশেষতঃ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ভারসাম্যে বিরাট ঘাটতি রয়েছে। তবে এই ঘাটতির একটি বড় কারণ হচ্ছে ভারত থেকে শিল্প উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্য, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য উপকরণ আমদানি।

সারসংক্ষেপ :

১. বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে রপ্তানি পণ্য ও ভৌগোলিক কেন্দ্রীভবন, রপ্তানি পণ্যের নিম্ন মূল্য সংযোজন, বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি, বাণিজ্য শর্তের উঠানামা, রপ্তানির মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাধান্য এবং আমদানির মধ্যে উৎপাদন সম্পর্কিত পণ্যের গুরুত্ব।

২. বাংলাদেশের বৈদেশিক বণিজ্যে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন, বাণিজ্যের ভারসাম্যের ঘাটতি হ্রাস, রপ্তানি বাণিজ্য পাট ও পাটজাত দ্রব্যের গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে তার স্থলে তৈরি পোশাক ও নীট ওয়্যার-এর গুরুত্ব বৃদ্ধি, আমদানি বাণিজ্যে খাদ্যশস্যসহ ভোগ্যপণ্যের গুরুত্ব হ্রাস, সার্কভুক্ত দেশসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধি প্রভৃতি।

অনুশীলনী ১৬.১

নৈর্ব্যক্তিকে প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের বাণিজ্যের ভারসাম্য

ক. সমীকরণ　　খ. উদ্বৃত্ত
গ. ঘাটতি　　ঘ. কোন বছর উদ্বৃত্ত ও কোন বছর ঘাটতি।

২. বাণিজ্য শর্ত বলতে বুঝায়

ক. রপ্তানি ও আমদানির অনুপাত,
খ. রপ্তানি ও আমাদানির বাধাসমূহ
গ. রপ্তাানি মূল্য ও আমদানি মূল্যের অনুপাত
ঘ. উপরের কোনটি নয়।

৩. বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি

ক. পাট　　খ. পাটজাত দ্রব্য
গ. তৈরি পোশাক　　ঘ. হিমায়িত খাদ্য।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি?
২. সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বাণিজ্যে কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়?

পাঠ ২ : বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের রপ্তানি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের আমদানি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

১৬.২.১. বাংলাদেশের রপ্তানি

বাংলাদেশের রপ্তানি মুষ্টিমেয় কয়েকটি পণ্যের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। এই পণ্যগুলো দুভাগে ভাগ করা যায় যেমন, প্রাথমিক পণ্য ও শিল্পজাত পণ্য। নিচে কয়েকটি প্রধান রপ্তানি পণ্যের বর্ণনা দেওয়া হল।

১২.২.১.১. প্রাথমিক পণ্যসমূহ

বাংলাদেশ ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রাথমিক পণ্যসমূহ রপ্তানি করে মোট ৪৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে যা মোট রপ্তানি আয়ের ১২.৩ ভাগ ছিল। প্রাথমিক পণ্যসমূহের মধ্যে কাঁচা পাট, চা ও হিমায়িত খাদ্য প্রধান। উক্ত বছরে এই তিনটি পণ্য থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিচে এই তিনটি রপ্তানি পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল ঃ

ক. কাঁচা পাট – পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকারী ফসল। ১৯৭০-এর দশকে পাট বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে প্রধান পাট রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত। তবে বর্তমানে পাটের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংকুচিত হয়ে পড়েছে এবং সে সঙ্গে বাংলাদেশের পাট রপ্তানির পরিমাণও পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। দেশে পাটের তুলনায় ধানের চাষ অধিক আকর্ষণীয় হওয়ায় পাট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের বিকল্প পেট্রোলজাত কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার প্রসার লাভ করায় পাটের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। উপরন্তু কাঁচা পাট দেশের পাট শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত কাঁচাপাটের পরিমাণ হ্রাস পায়। যাহোক ১৯৯৫-৯৬ সালে কাঁচা পাট থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কাঁচা পাটের বাজারে অস্থিতিশীলতার জন্য কাঁচা পাট থেকে রপ্তানি আয় ব্যাপকভাবে উঠানামা করে।

খ. চা – চা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য। দেশে চায়ের উৎপাদনে উঠানামা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদার পরিবর্তনের জন্য চা রপ্তানিতে হ্রাস বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে চা রপ্তানি থেকে আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

গ. হিমায়িত খাদ্য – হিমায়িত খাদ্য বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে একটি অপ্রচলিত পণ্য। কিন্তু এই পণ্যটি থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে এই পণ্য থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৩১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১৬.২.১.২ শিল্পজাত পণ্যসমূহ

বাংলাদেশ স্বল্প সংখ্যক শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করে থাকে। এদের মধ্যে গুরুত্বের দিক দিয়ে পাটজাত দ্রব্য, চামড়া, তৈরি পোশাক ও নীট ওয়্যার উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৫-৯৬ সালে এই পণ্যসমূহ থেকে মোট ৩০৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় হয়। উল্লেখ্য যে, একই বছরে শিল্পজাত পণ্যসমূহ থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল মোট ৩৪০৬ মিলিয়ন ডলার যা মোট রপ্তানি আয়ের ৮৭.৭%। নিচে প্রধান প্রধান শিল্পজাত রপ্তানি পণ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

ক. পাটজাত দ্রব্য – ১৯৭০-এর দশক এবং ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাটজাত দ্রব্য বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ পাটজাত দ্রব্যের প্রধান রপ্তানিকারক দেশ। দেশে যোগান সংক্রান্ত অসুবিধা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের বিকল্প দ্রব্যের ব্যবহার, পরিবহন ও প্যাকেজিং শিল্পে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, ইত্যাদি কারণে চাহিদা হ্রাস – এই উভয় প্রকার প্রভাবে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ দীর্ঘকালে হ্রাস পেয়েছে। পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানিতেও বার্ষিক হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯৫-৯৬ সালে পাটজাত দ্রব্য থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৩২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

খ. চামড়া – চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বাংলাদেশে একটি প্রচলিত রপ্তানি পণ্য। তবে সাম্প্রতিককালে এই পণ্যটির রপ্তানিতে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায়। ১৯৯৫-৯৬ সালে এই পণ্যটি রপ্তানি করে বাংলাদেশ ২১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করতে সক্ষম হয়।

গ. তৈরি পোশাক – বর্তমানে তৈরি পোশাক বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য। ১৯৯৫-৯৬ সালে তৈরি পোশাক থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ১৯৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ঐ বছরে শিল্পজাত পণ্য রপ্তানির ৫৭.২% ভাগ এবং মোট রপ্তানির ৫০.২% ভাগ। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের কৃতিত্ব অভূতপূর্ব। ১৯৭০-এর দশকে প্রায় অজ্ঞাত একটি পণ্য থেকে বর্তমানে এটি একটি প্রধান রপ্তানি পণ্যে উন্নীত হয়েছে। এই পণ্যের একটি দুর্বলতা হচ্ছে এটির আমদানি নির্ভরতা। সুতা, বস্ত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অধিকাংশ উপকরণ আমদানি করা হয় এজন্য এ পণ্যের মূল্য সংযোজনের পরিমাণ কম।

ঘ. নীট ওয়্যার – নীট ওয়্যার রপ্তানি ১৯৮৯-৯০ সালের পূর্বে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ১৯৮৯-৯০ সালে এর রপ্তানির পরিমাণ ছিল মাত্র ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫-৯৬ সালে দাঁড়িয়েছে ৫৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (অর্থাৎ পাটজাত দ্রব্য ও চামড়া রপ্তানির মোট আয়ের চেয়ে বেশি)।

১৬.২.২. বাংলাদেশের আমদানি

অর্থনীতিতে বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা পূরণের জন্য আমদানি করা হয়। ব্যবহারের প্রকৃতি অনুসারে আমদানি পণ্যসমূহকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, ভোগ্যপণ্য, মধ্যবর্তী পণ্য ও শিল্পের জন্য কাঁচামাল, মূলধনি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূলধনি পণ্য এবং অন্যান্য পণ্য। নিচে এসব পণ্যের আমদানি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

ক. ভোগ্যপণ্য – বাংলাদেশ খাদ্যশস্য (চাল ও গম), চিনি, গুঁড়ো দুধ, ভোজ্য তৈল ইত্যাদি ভোগ্য পণ্য আমদানি করে। এসবের মধ্যে দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যশস্য ও গুঁড়ো দুধের আমদানির পরিমাণ পূর্বের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য কোন বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদন হ্রাস পেলে ঐ বছর খাদ্যশস্য আমদানি বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৫-৯৬ সালে ভোগ্যপণ্য আমদানি মোট আমদানির প্রায় ১৩% ছিল।

খ. মধ্যবর্তী পণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল – বাংলাদেশ নানাবিধ মধ্যবর্তী পণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি করে। যেমন, কাঁচাতুলা, কৃত্রিম তন্তু, সুতা, কাপড়, অপরিশোধিত ভোজ্য তৈল, পেট্রোল ও পেট্রোলজাত দ্রব্য, ওষুধ তৈরির কাঁচামাল, রাসায়নিক দ্রব্য, কয়লা ইত্যাদি। ১৯৯৫-৯৬ সালে এসব পণ্য আমদানির জন্য আমদানি ব্যয়ের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি ব্যয়িত হয়। এ জাতীয় পণ্যের বেশি আমদানি অর্থনীতিতে উৎপাদন কার্যাবলীর সন্তোষজনক অবস্থারই ইঙ্গিত দেয়।

গ. মূলধনি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূলধনি পণ্য – বাংলাদেশে মূলধনি যন্ত্রপাতি উৎপাদন খাতের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এজন্য দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাকর্ম, ইত্যাদি খাতের

উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনি যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য মূলধনি পণ্য আমদানি করতে হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে এ সকল পণ্য আমদানির জন্য মোট আমদানির প্রায় ১৬% ভাগ ব্যয়িত হয়।

ঘ. অন্যান্য পণ্য – কিছু পণ্য আছে যেগুলো সুস্পষ্টভাবে উপরের তিন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। ১৯৯৫-৯৬ সালে এরূপ পণ্য আমদানিতে ব্যয়িত হয় মোট আমদানি ব্যয়ের প্রায় ১৬% ভাগ।

সারসংক্ষেপ :

১. বাংলাদেশের রপ্তানি মুষ্টিমেয় পণ্যে কেন্দ্রীভূত। প্রাথমিক পণ্য যেমন – কাঁচা পাট, হিমায়িত খাদ্য, চা এবং শিল্পজাত পণ্য যেমন, পাটজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক ও নীট ওয়্যার ও চামড়া প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য।

২. বাংলাদেশের আমদানিকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যেমন – ভোগ্য পণ্য, মধ্যবর্তী পণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল, মূলধনি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূলধনি দ্রব্য এবং অন্যান্য পণ্য।

অনুশীলনী ১৬.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে কোন পণ্যটি রপ্তানি করে না?
   ক. পাট
   খ. মোটর গাড়ী
   গ. হিমায়িত খাদ্য
   ঘ. চামড়া।

২. পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি হ্রাসের কারণ
   ক. দেশে আবাদী ভূমির অভাব
   খ. পাট উৎপাদন পরিবেশ নষ্ট করে এই প্রচারণা
   গ. পাটের প্রতিযোগী কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহারের প্রসার
   ঘ. দেশে তৈরি পোশাকের উৎপাদন বৃদ্ধি।

৩. বাংলাদেশের প্রধান আমদানি
   ক. খাদ্যশস্য
   খ. মোটর গাড়ী
   গ. সেচযন্ত্র
   ঘ. শিল্পের কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্য।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের নাম উল্লেখ করুন।
২. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি কি কি?

পাঠ ৩ : বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের বৈশিষ্ট্য : মূলধনী খাত, রিজার্ভ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।

১৬.৩.১. বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্যের বৈশিষ্ট্য ঃ

বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হল ঃ

ক. চলতি হিসাবে ঘাটতি – বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্যের চলতি হিসাবে ঘাটতি রয়েছে। তবে এই ঘাটতির পরিমাণ বাণিজ্যের ভারসাম্যের ঘাটতির চেয়ে কম। কারণ, বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থ বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস যা বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস করে। সাম্প্রতিকালে রপ্তানির গড় প্রবৃদ্ধির হার আমদানির গড় প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি হওয়ায় এবং রেমিট্যান্সের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

খ. মূলধনি হিসাবে উদ্বৃত্ত – বাংলাদেশ মূলধন আমদানিকারক দেশ। লেনদেনের ভারসাম্যের চলতি হিসাবে যে ঘাটতি হয় তা মূলধন আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়। মূলধন আমদানির পক্ষে যুক্তি হল দেশের সম্পদ সদ্ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ মূলধন দরকার দেশজ মূলধনের পরিমাণ তার তুলনায় কম। এই ঘাটতি মূলধন আমদানি করে পূরণ করা হয় এবং এই মূলধন ব্যবহার করে ভবিষ্যতে যে উৎপাদন হবে তা থেকে ঋণ পরিশোধ করা হবে। সাম্প্রতিককালে মূলধনি উদ্বৃত্তের পরিমাণে নিম্নগতি লক্ষ্য করা যায়।

গ. অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রাধান্য – মূলধনি হিসাবে উদ্বৃত্তের প্রায় সবটাই বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্য। বাংলাদেশ বিদেশের সরকার এবং আর্ন্তজাতিক ঋণদানকারী সংস্থাসমূহের নিকট থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য লাভ করে। বাংলাদেশ কিছু অনুদানও পায় এবং কিছু ক্ষেত্রে ঋণকে অনুদানে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির দিকে রূপান্তর শুরু করায় বিশ্বে অর্থনৈতিক সাহায্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশে অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রবাহ হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ সরকার প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য নানারূপ পদক্ষেপ নিচ্ছেন। তবে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ এখনও খুবই কম।

ঘ. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ -আমদানির জন্য যে সময় অর্থ প্রদান করতে হয় রপ্তানি আয় ঠিক সে সময় নাও হতে পারে। আমদানির জন্য অর্থ প্রদানের ও রপ্তানি আয়ের প্রবাহ সমলয় করার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রাখা হয়। চলতি আয়ের ঘাটতি যদি মূলধনি হিসাবের উদ্বৃত্ত দ্বারা পূরণ করা না যায় তাহলে রিজার্ভ ব্যবহার করে তা পূরণ করা হয়। এক্ষেত্রে রিজার্ভ হ্রাস পায়। অপরদিকে, মূলধনি হিসাবের উদ্বৃত্ত চলতি আয়ের ঘাটতির চেয়ে বেশি হলে রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিক কারণে, বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উঠানামা দেখা যায়। বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কম রাখে। তবে কোন কোন বছর এই রিজার্ভের স্তর এত কমে যায় যে তা সংকটাবস্থা সৃষ্টি করে। তখন অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হয়।

সার সংক্ষেপ :

১. বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চলতি হিসাবে ঘাটতি এবং মূলধনি হিসাবে উদ্ধৃত্ত। মূলধনি হিসাবে বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রাধান্য রয়েছে; বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা পত্রকোষ বিনিয়োগের পরিমাণ খুবই কম।

২. বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের স্তর উঠানামা করে। তবে এ স্তর হঠাৎ দ্রুতভাবে নামতে থাকলে সংকটজনক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।

অনুশীলনী ১৬.৩

১. বাংলাদেশের চলতি হিসাব
   - ক. সমীকৃত
   - খ. উদ্বৃত্ত
   - গ. ঘাটতি
   - ঘ. কখনও উদ্বৃত্ত এবং কখনও ঘাটতি।

২. বাংলাদেশের মূলধনি হিসাব
   - ক. সমীকৃত
   - খ. উদ্বৃত্ত
   - গ. ঘাটতি
   - ঘ. কোন বছর উদ্বৃত্ত এবং কোন বছর ঘাটতি

৩. বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ
   - ক. সব সময় সন্তোষজনক
   - খ. উঁচু স্তরে থাকে
   - গ. বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল
   - ঘ. উঠানামা করে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি?

পাঠ ৪ ঃ বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়ন নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়ন নীতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যে বাণিজ্য ও শিল্পনীতি অনুসরণ করতে থাকে তাকে বলা যায় আমদানি বিকল্প নীতি। এর বৈশিষ্ট্য ছিল আমদানির উপর শুল্ক ও অশুল্ক বাধা আরোপ, বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ এবং মুদ্রার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ। এসব নীতির ফলে রপ্তানি তব্য পণ্য উৎপাদনের তুলনায় আমদানিতব্য পণ্যের উৎপাদন বেশি লাভজনক হত এবং ফলে রপ্তানিতব্য পণ্যের উৎপাদন নিরুৎসাহিত হত। ১৯৮০-এর দশকের প্রথম ভাগ থেকে বাংলাদেশ কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে থাকে এবং এর আওতায় বাণিজ্য উদারীকরণ নীতি অনুসরণ করতে থাকে। এই নতুন বাণিজ্য ও শিল্প নীতিকে বলা যায় রপ্তানী চালিত প্রবৃদ্ধি কৌশল। এই নীতির অধীনে রপ্তানি উন্নয়নের জন্য যে সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

১.১. শুল্ক হ্রাস – আমদানী পণ্যের উপর শুল্ক হার হ্রাস করা হয়েছে। এর ফলে দেশের মধ্যে আমদানিকৃত পণ্যের ও কাঁচামালের দাম হ্রাস পেয়েছে।

২.২. অশুল্ক বাধা অপসারণ – আমদানি পণ্যের উপর বিভিন্ন প্রকার অ-শুল্ক বাধা অপসারণ করা হয়েছে। এখন মাত্র গুটি কয়েক পণ্যের ক্ষেত্রে এই বাধা আছে। এর ফলে বিদেশ থেকে পণ্য ও শিল্পের জন্য কাঁচামাল আমদানি সহজ হয়েছে।

উপরিউক্ত পদক্ষেপের ফলে আমদানি পণ্যের দেশজ উৎপাদনে যে পক্ষপাত ছিল তা বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া রপ্তানিকে উৎসাহিত করার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

৩. রপ্তানি প্রণোদনাসমূহ ঃ

ক. শুল্ক ও কর অবহার – রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো রেয়াতী হারে শুল্ক প্রদান করে যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি করতে পারে। এছাড়া তাদের রপ্তানি আয়ের উপর আয়কর রেয়াত দেয়া হয়।

খ. শুল্ক প্রত্যার্পণ ব্যবস্থা – এই ব্যবস্থার আওতায় শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানিকারগণকে রপ্তানিতব্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য আমদানিকৃত উপকরণের উপর প্রদত্ত শুল্ক প্রত্যর্পণ করা হয়। তাছাড়া সম্পূর্ণ তৈরি দ্রব্য রপ্তানির পর এর উপর প্রদত্ত আবগারী শুল্কও প্রত্যার্পণ করা হয়।

গ. বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা – এই ব্যবস্থার আওতায় ১০০% রপ্তানি শিল্প ইউনিটসমূহ কোন শুল্ক প্রদান না করে তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানি করতে পারে। আমদানিকৃত উপকরণ প্রথমে বন্ডেড ওয়্যার হাউজে মজুদ করা হয় এবং পরবর্তীকালে সরকারী কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ উপকরণ খালাস করা হয়।

ঘ. রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা – উপরে খ. ও গ. এ বর্ণিত সুবিধা দুটোর ফলে রপ্তানিকারকগণ অবাধ বাণিজ্য অবস্থা ভোগ করেন। এছাড়াও রপ্তানিকে উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় দুটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা স্থাপন করেছে। খুলনা ও সিরাজগঞ্জে আরো দুটি সরকারী এবং চট্টগ্রাম একটি ব্যক্তিগত এলাকা স্থাপনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এসব এলাকায় দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাগণ শুল্ক প্রদান না করে এবং বাধাহীনভাবে রপ্তানিমুখী কারখানা স্থাপন করতে পারেন। তারা ১০ বছরের জন্য

আয়কর মওকুফ পান এবং এর পরে রপ্তানি আয়ের উপর ৩০-১০০% হারে আয়কর রেয়াত পান।

৬. রপ্তানি ঋণ নিশ্চয়তা স্কীম – এই স্কীম সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের রপ্তানি ঋণ নিশ্চয়তা অনুবিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হয়। এটির উদ্দেশ্য হচ্ছে রপ্তানিকারকগণকে তাদের পণ্য চালান পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা এবং ব্যাংকগুলোকে রপ্তানি কাজে অর্থায়নের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা।

৪. বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থাপনা ঃ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ন্যূনতম পর্যায়ে আনা হয়েছে। টাকাকে চলতি হিসাবের সকল প্রকার লেনদেনের জন্য পরিবর্তনযোগ্য করা হয়েছে। এছাড়াও রপ্তানি উৎসাহিতকরণের জন্য নমনীয় বিনিময় হার নীতি অনুসরণ করা হয় যার উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার প্রতিযোগিতামূলক রাখা।

সারসংক্ষেপ :

১. বাংলাদেশের অনুসৃত উন্নয়ন কৌশল আমদানি বিকল্প নীতি থেকে রপ্তানি চালিত প্রবৃদ্ধি নীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

২. এই নতুন কৌশলে আমদানির উপর শুল্ক হ্রাস এবং অশুল্ক বাধাসমূহ অপসারণ করা হয়েছে এবং এর ফলে আমদানিতব্য পণ্যের দেশীয় উৎপাদনে যে পক্ষপাত ছিল তা হ্রাস পেয়েছে।

৩. রপ্তানি উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে কতকগুলো বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, যেমন – শুল্ক ও কর অবহার, শুল্ক প্রত্যার্পণ ব্যবস্থা, বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা স্থাপন ও রপ্তানি ঋণ নিশ্চয়তা স্কীম। এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার প্রতিযোগিতামূলক রাখা হয়।

অনুশীলনী ১৬.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশে অনুসৃত বর্তমান বাণিজ্য ও শিল্পনীতি মূলত,
   ক. আমদানি উৎসাহিতকরণ নীতি
   খ. আমদানি বিকল্পন নীতি
   গ. পরমুখাপেক্ষিতা বৃদ্ধি নীতি
   ঘ. রপ্তানি চালিত প্রবৃদ্ধি নীতি।

২. রপ্তানি প্রণোদনা নয় কোনটি?
   ক. বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা
   খ. রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা
   গ. সীমান্ত প্রহরা জোরদারকরণ
   ঘ. শুল্ক প্রত্যার্পণ ব্যবস্থা।

৩. বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার
   ক. প্রতিযোগিতামূলক
   খ. স্থির
   গ. সস্তা
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশে রপ্তানি উৎসাহিতকরণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কি কি?

মানবণ্টন ও নমুনা প্রশ্ন

নমুনা প্রশ্ন

অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল

প্রথম পত্র

(অর্থনীতি)

কোর্স কোড ঃ HSC-1823

সময়-৩ ঘন্টা পূর্ণমান-১০০

[দ্রষ্টব্যঃ- ডান পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ থেকে যে-কোন পাঁচটি এবং খ বিভাগ থেকে যে-কোন আটটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক বিভাগ

নম্বর

১। ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতি বলতে কি বোঝায়? ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য করুন। ৪+৮=১২

২। উপযোগ কাকে বলে? ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যতিক্রমসহ আলোচনা করুন। ৪+৮=১২

৩। 'চাহিদা বিধি' কি? একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচী থেকে চাহিদা রেখা অংকন করুন। ৪+৮=১২

৪। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলতে কি বুঝেন? যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কত প্রকার ও কি কি? যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারকসমূহ বর্ণনা করুন। ৩+৩+৪=১০

৫। শ্রমের দক্ষতা বলতে কি বুঝেন? শ্রমের দক্ষতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? বর্ণনা করুন। ৪+৮=১২

৬। মূলধন গঠন কাকে বলে? মূলধন গঠন কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর কর? আলোচনা করুন। ৪+৮=১২

৭। ব্যতিক্রমসহ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি বর্ণনা করুন। ৪+৮=১২

৮। অর্থনীতিতে বাজার বলতে কি বোঝায়? পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া বাজারের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ৪+৮=১২

৯। সুদ প্রদানের কারণসমূহ কি কি? মোট সুদ ও নীট সুদের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করুন। ৪+৮=১২

১০। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন। ১২

খ বিভাগ

১১। (ক) মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো কি কি? ৫

(খ) ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন। ৫

(গ) সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? ৫

(ঘ) ভোক্তার উদ্বৃত্ত কাকে বলে? ৫

(ঙ) মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ৫

(চ) শ্রমের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন। ৫

(ছ) চাহিদার নির্ধারকগুলো কি কি? ৫

(জ) প্রকৃত মজুরী কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? ৫

(ঝ) বাণিজ্যিক ভারসাম্য বলতে কি বোঝায়? ৫

(ঞ) সমানুপাতিক উৎপাদন বিধিটি বর্ণনা করুন। ৫

(ট) মোট ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় বলতে কি বোঝেন? ৫

(ঠ) একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? ৫

(ড) নিম খাজনা কি? ৫

(ঢ) মহিলারা পুরুষের তুলনায় কম মজুরী পায় কেন? ৫

(ণ) অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ৫

(ত) বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? ৫

নমুনা প্রশ্ন

অর্থনীতি ১ম পত্র

কোর্স কোড ঃ HSC-1803

সময়-৩ ঘন্টা পূর্ণমান-১০০

[দ্রষ্টব্যঃ- ডান পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ থেকে যে-কোন পাঁচটি এবং খ বিভাগ থেকে যে-কোন আটটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক বিভাগ

নম্বর

১। একটি দেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাবলী আলোচনা করুন। ১২

২। সম্পদ কাকে বলে? সম্পদের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন। ৪+৮=১২

৩। ব্যতিক্রমসহ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা করুন। ১২

৪। অর্থনীতিতে চাহিদা বলতে কি বুঝায়? রেখা চিত্রের সাহায্যে চাহিদা বিধিটি ব্যাখ্যা করুন। ৪+৮=১২

৫। অর্থনীতিতে ভূমি কাকে বলে? ভূমির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন। ৪+৮=১২

৬। নিরপেক্ষ রেখা বলতে কি বুঝেন? নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন। ৪+৮=১২

৭। চাহিদা ও যোগানের পরিমাণে সমতার ভিত্তিতে কিভাবে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা করুন। ১২

৮। অর্থনীতিতে বাজার বলতে কি বোঝায়? পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন। ১২

৯। আর্থিক মজুরী ও প্রকৃত মজুরীর সংজ্ঞা লিখুন। প্রকৃত মজুরী কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, বর্ণনা করুন। ১২

১০। লেন-দেন ভারসাম্য বলতে কি বুঝেন? লেন-দেনের ভারসাম্য ও বাণিজ্যিক ভারসাম্যের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করুন। ১২

খ বিভাগ

১১। (ক) ভোক্তার উদ্বৃত্ত কি? ৫

(খ) মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ৫

(গ) ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন। ৫

(ঘ) যোগান বিধি বর্ণনা করুন। ৫

(ঙ) চাহিদার নির্ধারকসমূহ কি কি? ৫

(চ) শ্রমের বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি? বর্ণনা কর। ৫

(ছ) মূলধন গঠন কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? ৫

(জ) উদ্যোক্তার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো কি কি? ৫

(ঝ) "উৎপাদন মানে উপযোগ সৃষ্টি" - ব্যাখ্যা করুন। ৫

(ঞ) খাজনা উৎপত্তির কারণগুলো কি কি? ৫

(ট) নিম খাজনা কাকে বলে? ৫

(ঠ) শ্রমিক সংঘের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি কাজের না লিখুন? ৫

(ড) মোট সুদের উপাদানগুলো কি কি? ৫

(ঢ) "মুনাফা ঝুঁকি বহনের পুরস্কার"- ব্যাখ্যা করুন। ৫

(ণ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ কি? ৫

(ত) বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান পাঁচটি বৈশিষ্ট্যে নাম লিখুন। ৫

মানবণ্টন ও নমুনা প্রশ্ন

অর্থনীতি

Rationale

অর্থনীতি মানুষের জীবন ধারণের মৌলিক বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত। এ বিষয় অধ্যয়ন করে মানুষ তার সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। ভোগ, উৎপাদন কিংবা বিনিময় এসব ক্ষেত্রেই যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। এসব দিক বিবেচনায় এইচএসসি স্তরের ছাত্রদের অর্থনীতির তাত্ত্বিক জ্ঞানদান, শিক্ষার্থীরা যাতে ব্যবহারিক জীবনে অর্থনীতির জ্ঞান ও কৌশল প্রয়োগ করতে শেখে, আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ হয় সেজন্য অর্থনীতি কোর্সটি পাঠ্য করা হয়েছে।

সিলেবাস

অর্থনীতি –১ম পত্র

ইউনিট - ১ **অর্থনীতি পরিচিতি**

পাঠ-১ ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতি

পাঠ-২ মৌলিক অর্থনীতি সমস্যা : কি উৎপাদিত হবে? কিভাবে উৎপাদিত হবে? কার জন্য উৎপাদিত হবে?

পাঠ-৩ অসীম অভাব ও দুষ্প্রাপ্য সম্পদ

পাঠ-৪ দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন

পাঠ-৫ সুযোগ ব্যয় ও উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

ইউনিট - ২ **অর্থনৈতিক ব্যবস্থা**

পাঠ-১ অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে বিকল্প ব্যবস্থাসমূহ : ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র ও ইসলামী অর্থনীতি

পাঠ-২ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ইউনিট - ৩ **গাণিতিক অর্থনীতির মৌলিক ধারণা**

পাঠ-১ চলক ও ধ্রুবক

পাঠ-২ অপেক্ষক

পাঠ-৩ লেখচিত্র অংকন

পাঠ-৪ ঢাল ও ছেদাংশ

পাঠ-৫ বিভিন্ন রেখার সমীকরণ : চাহিদা ও যোগান রেখা

ইউনিট - ৪ **ভোক্তার আচরণ : উপযোগ**

পাঠ-১ উপযোগ : মোট, গড় ও প্রান্তিক উপযোগ

পাঠ-২ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি

পাঠ-৩ ভোক্তার উদ্বৃত্ত

পাঠ-৪ ভোক্তার ভারসাম্য

পাঠ-৫ নিরপেক্ষ রেখা বিশ্লেষণ

পাঠ-৬ নিরপেক্ষ রেখা বিশ্লেষণ ও ভোক্তার ভারসাম্য

ইউনিট - ৫ **চাহিদা**

পাঠ-১ চাহিদা

পাঠ-২ চাহিদার নির্ধারকসমূহ
পাঠ-৩ চাহিদার সংকোচন প্রসারণ
পাঠ-৪ চাহিদার প্রকারভেদ
পাঠ-৫ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

ইউনিট - ৬ যোগান
পাঠ-১ যোগান
পাঠ-২ যোগানের পরিবর্তন ও যোগান রেখার স্থানান্তর
পাঠ-৩ যোগানের স্থিতিস্থাপকতা
পাঠ-৪ যোগান ও সময়

ইউনিট - ৭ দাম নির্ধারণ
পাঠ-১ চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ
পাঠ-২ ভারসাম্য দাম ও পরিমাণের পরিবর্তন
পাঠ-৩ দাম নির্ধারণের গাণিতিক বিশ্লেষণ
পাঠ-৭ সরস্বতী

ইউনিট - ৮ উৎপাদন ও উৎপাদনের উপকরণ
পাঠ-১ উৎপাদন : উপকরণ ও শ্রেণীবিভাগ
পাঠ-২ ভূমির বৈশিষ্ট্য
পাঠ-৩ শ্রম : শ্রমের দক্ষতা ও গতিশীলতা
পাঠ-৪ পুঁজি বা মূলধন : সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা
পাঠ-৫ সংগঠন – একক, অংশীদারী ও যৌথমূলধনী মালিকানা
পাঠ-৬ উৎপাদনে অপেক্ষক
পাঠ-৭ একটি পরিবর্তনীয় উপকরণ : ক্রমহ্রাসমান, ক্রমবর্ধমান ও সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি

ইউনিট - ৯ উৎপাদন ব্যয়
পাঠ-১ উৎপাদন ব্যয় –স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন
পাঠ-২ মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়
পাঠ-৩ অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ ব্যয় সংকোচ

ইউনিট - ১০ বাজার
পাঠ-১ বাজারের সংজ্ঞা ও প্রকরণ
পাঠ-২ বিক্রয়লব্ধ আয় বা রেভেনিউ
পাঠ-৩ মুনাফা সর্বোচ্চকরণের শর্তাবলী
পাঠ-৪ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার
পাঠ-৫ একচেটিয়া বাজার
পাঠ-৬ একচেটিয়া বাজারে ফার্মের ভারসাম্য

ইউনিট - ১১ খাজনা
পাঠ-১ খাজনার সংজ্ঞা, খাজনা কেন দেওয়া হয়?
পাঠ-২ মোট খাজনা ও নীট খাজনা

পাঠ-৩ অনুপার্জিত আয়
পাঠ-৪ নিম খাজনা
পাঠ-৫ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব
পাঠ-৬ খাজনা ও দাম
পাঠ-৭ খাজনা ও জনসংখ্যার সম্পর্ক

ইউনিট - ১২ মজুরি

পাঠ-১ সংজ্ঞা – আর্থিক ও প্রকৃত মজুরি
পাঠ-২ প্রকৃত মজুরি কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল
পাঠ-৩ মজুরির পার্থক্য (একই ও বিভিন্ন পেশায়)
পাঠ-৪ বাংলাদেশের স্বল্প মজুরি হারের কারণ
পাঠ-৫ শ্রমিক সংঘ-এর সংজ্ঞা ও কার্যাবলী
পাঠ-৬ বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠন – বর্তমান অবস্থা

ইউনিট - ১৩ সুদ

পাঠ-১ সুদের সংজ্ঞা – মোট ও নীট সুদ
পাঠ-২ সুদ কেন দেওয়া হয়?
পাঠ-৩ সুদের হারের তারতম্যের কারণ
পাঠ-৪ সুদ কি কখনো শূন্য হতে পারে?

ইউনিট - ১৪ মুনাফা

পাঠ-১ মুনাফার সংজ্ঞা – মোট ও নীট মুনাফা
পাঠ-২ ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৩ স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মুনাফা

ইউনিট - ১৫ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

পাঠ-১ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব
পাঠ-২ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
পাঠ-৩ তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব
পাঠ-৪ লেনদেনের ভারসাম্য
পাঠ-৫ অবাধ বাণিজ্যের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি
পাঠ-৬ সংরক্ষিত বাণিজ্যের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি

ইউনিট - ১৬ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক লেনদেন

পাঠ-১ বাংলাদেশের বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তনে ধারা
পাঠ-২ বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানি
পাঠ-৩ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের বৈশিষ্ট্য : মুলধনী খাত, রিজার্ভ
পাঠ-৪ বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়ন নীতি

নমুনা প্রশ্ন

অর্থনীতি ১ম পত্র

কোর্স কোড ঃ HSC-1803

সময়-৩ ঘন্টা পূর্ণমান-১০০

[দ্রষ্টব্যঃ- ডান পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ থেকে যে-কোন পাঁচটি এবং খ বিভাগ থেকে যে-কোন আটটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক বিভাগ

নম্বর

১। একটি দেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাবলী আলোচনা করুন। ১২

২। সম্পদ কাকে বলে? সম্পদের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন। ৪+৮=১২

৩। ব্যতিক্রমসহ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা করুন। ১২

৪। অর্থনীতিতে চাহিদা বলতে কি বুঝায়? রেখা চিত্রের সাহায্যে চাহিদা বিধিটি ব্যাখ্যা করুন। ৪+৮=১২

৫। অর্থনীতিতে ভূমি কাকে বলে? ভূমির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন। ৪+৮=১২

৬। নিরপেক্ষ রেখা বলতে কি বুঝেন? নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন। ৪+৮=১২

৭। চাহিদা ও যোগানের পরিমাণে সমতার ভিত্তিতে কিভাবে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা করুন। ১২

৮। অর্থনীতিতে বাজার বলতে কি বোঝায়? পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন। ১২

৯। আর্থিক মজুরী ও প্রকৃত মজুরীর সংজ্ঞা লিখুন। প্রকৃত মজুরী কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, বর্ণনা করুন।১২

১০। লেন-দেন ভারসাম্য বলতে কি বুঝেন? লেন-দেনের ভারসাম্য ও বাণিজ্যিক ভারসাম্যের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করুন। ১২

খ বিভাগ

১১। (ক) ভোক্তার উদ্বৃত্ত কি? ৫

(খ) মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ৫

(গ) ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন। ৫

(ঘ) যোগান বিধি বর্ণনা করুন। ৫

(ঙ) চাহিদার নির্ধারকসমূহ কি কি? ৫

(চ) শ্রমের বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি? বর্ণনা কর। ৫

(ছ) মূলধন গঠন কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? ৫

(জ) উদ্যোক্তার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো কি কি? ৫

(ঝ) "উৎপাদন মানে উপযোগ সৃষ্টি" - ব্যাখ্যা করুন। ৫

(ঞ) খাজনা উৎপত্তির কারণগুলো কি কি? ৫

(ট) নিম খাজনা কাকে বলে? ৫

(ঠ) শ্রমিক সংঘের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি কাজের না লিখুন? ৫

(ড) মোট সুদের উপাদানগুলো কি কি? ৫

(ঢ) "মুনাফা ঝুঁকি বহনের পুরস্কার"- ব্যাখ্যা করুন। ৫

(ণ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ কি? ৫

(ত) বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান পাঁচটি বৈশিষ্ট্যে নাম লিখুন। ৫